চরণরেখা তব

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০০০৯

চরণরেখা তব

চরণরেখা তব

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮২

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ২০·০০

মা

ছায়া দেবী চৌধুরাণী-কে

রোগশয্যায়

এই লেখিকার বই

ইতিহাসের সন্ধানে

ভূমিকা

ইতিহাসের সন্ধানে একবার ইউরোপে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিচয় সেবার পাই। তখান মনে হয়েছিল, কোন একবার পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কর্মক্ষেত্র দেখে না-এলে এ-কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইউরোপের অধ্যায় যেন আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব, পূর্ব এশিয়ায় তার পূর্ণ প্রকাশ। তাই জাপান যাওয়ার সুযোগ আসামাত্র রওনা হয়ে পড়লাম, ব্যাগে ভরে নিলাম টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির আমন্ত্রণ পত্র।

পঁয়ত্রিশ বছর পর ঘটনাস্থলে গেলে খুব বেশী কিছু দেখতে শুনতে পাওয়া যাবে আশা করা যায় না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, সেসব দিনের প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন এখনো; কাগজপত্রে, ফটোগ্রাফেও ধরা আছে সেসব দিনের ইতিহাস। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় হল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল—এই দুটি বছর। ঘটনাচক্রে এই দুটি বছরের ইতিহাস অনেকখানি রচিত হয়েছে দেশ থেকে দূরে বিদেশের মাটিতে। আর এই ইতিহাস রচনা করেছেন প্রবাসী ভারতীয়েরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে।

সুভাষচন্দ্রকে বলা হয় ভারতপথিক। বিশ্বপথিক বললেও ক্ষতি ছিল না। কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্য যেভাবে তিনি পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন, তেমন আর কোন নেতাকে করতে হয়নি। তাই ছিন্নমালার ভ্রষ্ট পুঁতির মত একটি-একটি করে কুড়িয়ে নিলে তবেই ঘটনাগুলি নতুন করে একসূত্রে গাঁথা যায়। কাজটা সহজ নয়। সুভাষচন্দ্রের বিদেশী সহযোগীদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া এই দুরূহ কাজে হাত দেওয়া যেত না। এই সূত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করি তিন বৃদ্ধ জাপানী জেনারেলকে—জেনারেল ফুজিয়ারা, জেনারেল কাটাকুরা ও জেনারেল আরিসুয়ে।

আজকের জাপানে নেতাজীর নাম বেশ সহজভাবে আলোচিত হচ্ছে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর নিজেদের সামরিক নেতৃত্বের উপর বীতশ্রদ্ধ জাপানীরা নেতাজী সম্পর্কেও এক ধরনের নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। এখন কিন্তু টোকিও বা কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ঐতিহাসিকেরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করছেন সেসব দিনের কথা। আর জাপানের মিডিয়াতে, রেডিও-টেলিভিশনে নেতাজীর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা নতুনভাবে ফিরে এসেছে।

জাপানের পর হংকং, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, ব্যাংকক, তাইপে যেখানেই গিয়েছি, আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকের দেখা পেয়েছি আর দেখেছি নেতাজীর স্মৃতি বিজড়িত ঘরবাড়ী, পথঘাট এমন কি মাঠ-ময়দান, যেমন সিঙ্গাপুরের ফারার পার্ক ও পাদাং। এই অঞ্চলে নেতাজীর অগণিত অনুরাগী ও প্রাক্তন সহকর্মীদের মধ্যে কুয়ালালামপুরের মিঃ গুরুপক্ষম, আমেরিথ সিং, জানকী থেভার্স, সিঙ্গাপুরের জন্ জেকব ও ব্যাংককের ঈশ্বর সিং নিরুলার নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে।

জোর করে চেপে না ধরলে আমার অন্তত লেখার কাজ হয়ে ওঠে না। দেশ

পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষের তাগিদ না থাকলে এ-কাহিনী কোনদিন লেখা হত কি না সন্দেহ। এই ভ্রমণে যাত্রাসঙ্গী ছিলেন আমার স্বামী। তাঁর ও আমার পিতৃদেবের নীরব সমর্থন তো আছেই। তবে সবচাইতে উৎসাহী পাঠক ও কড়া সমালোচক হল আমার দুই পুত্র ও কন্যা। আর 'দেশ' পত্রিকার অগণিত পাঠক যাঁরা লেখা প্রকাশ হবার সময়ে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন, তাঁদের নেতাজী সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আমাকে উৎসাহ দান করেছে। তাঁদের সকলের কাছে এবং নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সকল কর্মীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'বসুন্ধরা'
৯০ শরৎ বসু রোড
কলকাতা ৭০০০২৬
নভেম্বর, ১৯৮২

কৃষ্ণা বসু

॥ ১ ॥

আমরা জাপান চলেছি শুনে কেউ খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। কারণ এতদিনে আমাদের এক ধরনের বাতিকের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত হয়ে গেছেন। একবার হঠাৎ মোটরগাড়িতে চড়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা চলে গিয়ে ধানবাদ হয়ে হাজির হয়েছিলাম গোমো স্টেশনে। আর কিছু নয়, এ-পথে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন অনেককাল আগে। সেই ঐতিহাসিক ঘটনারই, যাকে বলে একটা রি-এনঅ্যাক্টমেণ্ট বা পুনরাভিনয় হল। আর একবার তল্পিতল্পা বেঁধে ইতিহাসের সন্ধানে হাজির হয়েছিলাম ইউরোপে—ভিয়েনা, বার্লিন, প্রাগ্, লণ্ডন—শহর থেকে শহরে। বলা তো যায় না—মিলিলে মিলিতে পারে পরশ রতন। তিরিশের আর চল্লিশের দশকে সুভাষচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল এই সব দেশে-দেশান্তরে। অনেক দুর্লভ অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে সেবার সঞ্চয় হয়েছিল।

এমনি করে হাজির হয়েছি আন্দামানে—ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন ভূখণ্ড। আন্দামানের বিমান বন্দর ও সেলুলার জেল দেখা হলে পর দীর্ঘ তটভূমিতে খুঁজে ফিরেছি এক বিশেষ ভঙ্গীতে বেঁকে থাকা নারকেল গাছ। ছবিতে যে দেখেছি সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন অমনি এক গাছের নীচে, চেয়ে রয়েছেন ভারতবর্ষের দিকে। 'লুকিং টুওয়ার্ডস ইণ্ডিয়া'—নাম সে ছবির। একইভাবে জিপে চড়ে দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে ভারত-বর্মা সীমান্তে মোরে-টামু গিয়েছি। ইমফলের টেগনুপোল পাসের কাছে বড় বড় পাহাড়-পর্বত গিরিকন্দর ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের নীরব সাক্ষী। একেবারে নীরব বলা চলে কি? কিছু কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর হয়ত বা পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে এক জনপ্রিয় হিন্দি গান আছে ঃ—

উস বীর কি কহানী মহাকাল সে পুছো
ক্যায়সা থা ও কুরবানী ও বঙ্গাল সে পুছো
ক্যায়সা থা ও বলিদানী ইমফলসে পুছো
আসামকে পেড়ো কি ডাল ডাল সে পুছো···

যদি সেই বীরের কথা জানতে চাও তো মহাকালকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর আত্মোৎসর্গের কথা জানতে চাও তো জিজ্ঞাসা করো বাংলাকে, আর কেমন ছিল সেই আত্মত্যাগ জিজ্ঞাসা করো ইমফলকে আর আসামের প্রতিটি বৃক্ষশাখাকে। কোন এক ইংরেজ কবিও বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীর পদচিহ্ন সহজে মোছে না। এমন কি কারাগারের কঠিন শীতল মেঝেতে ছাপ রেখে যায় তার। তাই কবি বলছেন—

May none those marks efface,
For they appeal from tyranny to God.

জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ফরমোজা যেখানেই গেলাম বারবার উপলব্ধি করলাম একথার সততা, সহজেই যেন অনুসরণ করতে পারলাম সেই পথ যে পথে একদিন ভারতবর্ষের মুক্তি-যুদ্ধ অগ্রসর হয়েছিল দেশের পূর্ব প্রান্তের দিকে। এক বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ ও কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সে-পথের রেখা আজও মুছে যায় নি। আজও রয়েছেন সে সব দিনের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী। কাগজপত্র, ফটোগ্রাফ সে-সব দিনের নানা রকম ডকুমেণ্ট ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

প্লেন যখন টোকিওর নারিটা এয়ারপোর্টের ওপর এসে পড়ল, তখন মনে বেশ চাপা উত্তেজনা। সে শুধু নতুন দেশে আসার জন্য নয়। আমি তো জানি নীচে বিমান বন্দরে অপেক্ষা করে আছেন এমন সব মানুষজন যাঁরা ছিলেন নেতাজীর কমরেড-ইন-আর্মস, যুদ্ধের সাথী। এঁদের মধ্যে দু-একজন আগের-পরিচিত। কিন্তু অনেককেই এবার প্রথম দেখব। যাঁদের কথা এতদিন শুধু আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বিভিন্ন বইতে পড়েছি অথবা নাম দেখেছি দলিলপত্রে, তাঁদের দেখা পাব। লাইব্রেরীতে বসে মাইক্রোফিলমে

নাম দেখা এক কথা আর সেই সব মানুষকে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখা সম্পূর্ণ আর এক অভিজ্ঞতা।

গরম, ধোঁয়া-ওঠা, সুগন্ধ নাপকিন চিমটেয় করে তুলে দিয়ে গেল এয়ার-হোস্টেস। সবাই মুখ হাত মুছবে। মৃদু টুং টাং বাজনা বাজছে, প্লেন ল্যাণ্ড করবার সময় যাত্রীদের মন ভোলাবার জন্য যেমন বাজে। আমি ভাবছি নীচে কারা কারা এসেছেন। নিশ্চয় এসেছেন জেনারেল টাডাশি কাটাকুরা, উনি টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির বর্তমান সভাপতি। যুদ্ধের সময় ছিলেন বার্মা এরিয়া কমানডার। অতএব সে সময় নেতাজীর সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ। আর কে থাকবেন? নিশ্চয় থাকবেন জেনারেল সেইজো আরিস্যুয়ে। টোকিও বিমানবন্দরে ওঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে নেতাজী একবার বলেছিলেন—'দিস টাইম ইন টোকিও, নেকসট টাইম ইন ডেলহি'—এবারের সম্ভাষণ টোকিওতে হল, পরের বার কিন্তু হবে দিল্লীতে। দিল্লীতে সম্ভাষণের সুযোগ অবশ্য আর ওঁর হয়নি।

জেনারেল ইসোদা কি আসবেন? খবর পেয়েছি শরীর খুব অসুস্থ। নেতাজীর যাঁরা সহকর্মী তাঁদের বয়স তো নেহাত কম হল না। ইসোদা ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকার ও জাপানী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রাখার যে সংস্থা হিকারি-কিকান তারই ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আর একজন যিনি নিশ্চয় আসতেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে কিন্তু আজ আর আসবেন না তিনি টেরুও হাচিয়া। স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম বিদেশী রাষ্ট্রদূত। মাত্র অল্পদিন আগে তিনি আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। তবুও কি ভাগ্য ইসোদা ও হাচিয়া এই দুজনের সঙ্গেই কলকাতায় ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ হয়েছিল। জেনারেল কাটাকুরা, জেনারেল আরিস্যুয়ের সঙ্গে এবারই হবে প্রথম সাক্ষাৎ।

তবে সব মুখ ছাপিয়ে যে মুখ বার বার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে, তা হল জেনারেল ফুজিয়ারার অতি পরিচিত হাসিমুখ। চিবুকের ওপর কাটা কোন যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন। এ রকম অকৃত্রিম ভারতবন্ধু আর একমাত্র দেখেছিলাম জার্মানির আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ। বেশ অনুমান করতে

পারছিলাম নীচে বিমানবন্দরে জেনারেল ফুজিয়ারা অস্থির হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। নিজে চঞ্চল হয়ে অন্যদেরও সুস্থির থাকতে দিচ্ছেন না নিশ্চয়।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। প্লেনের মধ্যে জাপানী ভাষায় কী যেন ঘোষণা করে 'আরিগাতো গদাইমাশতা' বলে দিল। যাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল, এমন সময় স্পষ্ট ইংরেজিতে আবার ঘোষণা ভেসে এল—সরি, আমরা অনিবার্য কারণে টোকিওর নারিটা এয়ারপোর্টে নামতে পারছি না। আমরা তাই প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ওসাকা। জাপানীরা অল্প কথার মানুষ—কেন, কী হয়েছে এ সব তো কিছু বললে না। ফলে এরোপ্লেনে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বললে, নারিটা এয়ারপোর্টে বিক্ষোভ জানাচ্ছে জাপানী ছাত্ররা, ছাত্র-পুলিসে সংঘর্ষ হয়েছে। আশ্চর্য নয়। আমারও মনে হল হংকং-এ থাকতে খবর কাগজে পড়েছি নারিটা এয়ারপোর্টে গোলমাল চলছে। প্রথমত, শহর থেকে এত দূরে বিমানবন্দর টোকিওবাসীরা মোটে পছন্দ করেনি, এর চাইতে হানেডা বিমানবন্দর ছিল ভাল। তারপর নারিটাতে বিরাট বিমানবন্দর তৈরি করতে গিয়ে যাদের জমি জায়গা নিয়ে নেওয়া হয়েছে জোর করে, তারা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ করছিল। কয়েক দিন আগে বেশ কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়েছিল, আবার তাদের বিতারিত করতে লেগেছিল কয়েক হাজার পুলিস।

আপাতত বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের শান্ত করতে বিভিন্ন ধরনের ওয়াইন—হোয়াইট বোর্দো, রেড বার্গাণ্ডি, ড্রাই শেরি, উৎকৃষ্ট শ্যামপেন দিয়ে যেতে শুরু করল এয়ার-হোস্টেস। আমি খুব চিন্তিত বোধ করছিলাম বৃদ্ধ জেনারেলদের জন্য। রাত গভীর হয়েছে, শহর থেকে অনেক দূরে নারিটা। না জানি আমাদের নিতে এসে কি অসুবিধায় পড়েছেন ওঁরা। পরে জেনেছিলাম, সে রাতটা ওঁদের অনেকেরই এয়ারপোর্টেই কেটেছিল।

যাক, ওসাকাতে নামার জন্য তৈরী হবার নির্দেশ পেয়ে সীট-বেল্ট ইত্যাদি কোমরে বেঁধেছি, এমন সময় আরেক প্রস্থ 'আরিগাতো গদাইমাশতা' হয়ে গেল। 'সরি, ওসাকা এয়ারপোর্ট অলসো ক্লোজড। আমরা এখন পিছন ফিরে ফুকুওকা চলে যাচ্ছি।'

যাত্রীদের মধ্যে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। যদিও নানান ধরনের যাত্রীতে প্লেন বোঝাই তবুও একটা বড় দল—তাদের মধ্যে স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, ভারতীয় রয়েছেন—যাঁদের পরদিন সকালে একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল কংগ্রেস টোকিওতে শুরু হচ্ছে। কারো কারো পেপার পড়তে হবে সেদিনই। স্প্যানিশ ও ইটালিয়ানরা খুব প্রাণোচ্ছল। বেজায় হইচই শুরু করে দিয়েছে। এদিকে প্লেনের ওয়াইনের স্টক মনে হল শেষ। এবারে আসছে টমাটো জুস, অরেঞ্জ জুস এই সব। যে মেয়েটি টমাটো জুস নিয়ে এল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওসাকা এয়ারপোর্টে কী হয়েছে? সে সংক্ষেপে বললে, কারফিউ। আমাদের ভারতীয়দের তো কারফিউ বললে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মনে পড়ে। জাপানীদের কারফিউ কিসে হয় কে জানে!

ফুকুওকা যেতে বেশ কিছু দূর পিছিয়ে যেতে হল। যদিও যাত্রীরা বিব্রত ও বিরক্ত, আমার কিন্তু ফুকুওকা যাচ্ছি শুনে খুব রোমাঞ্চিত বোধ হল। কিছুকাল আগেই নেতাজীর যাত্রাসঙ্গী আবিদ হাসান সাহেবের কাছে শুনেছিলাম, উনি ও নেতাজী যখন সুমাত্রা থেকে জাপান আসছিলেন তখন ওঁদের প্রথম যাত্রা বিরতি ছিল ফুকুওকা। এখানেই জাপানী পদস্থ মিলিটারি অফিসাররা নেতাজীকে প্রায় রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সেই সভাতেই অনেকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করেছিলেন নেতাজীকে। এমনিতে তো আমাদের ফুকুওকা দেখার পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু বুঝলাম একবার ফুকুওকার মাটিতে পা-রাখা হয়ে যাবে, এটা ছিল আমার ডেসটিনি। আবিদ হাসান আরো বলেছিলেন, ওঁদেরও প্রথম দিন টোকিওতে নামা হয়নি। খারাপ আবহাওয়ার জন্য বিমান বন্দরের ওপর থেকে প্লেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সব রকম অভিজ্ঞতার স্বাদই পাওয়া যাচ্ছে, মনে মনে ভাবলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের বিমান ফুকুওকা বিমানবন্দর অ্যাপ্রোচ করছে বলে ঘোষণা হল। সকলেরই মনে কি-হয় কি-হয় ভাব। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তাই বিমান ফুকুওকার মাটি স্পর্শ করা মাত্র তুমুল করতালিধ্বনি করে উঠলেন যাত্রীরা। স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, বাংলাদেশী, ভারতীয় সকলেই

খুব হইচইবাজি। তবে শুনলাম রাতটা প্লেনের মধ্যে ঠায় বসে কাটাতে হবে। এদিকে ফলের রসেও টান পড়েছে। বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাচ্ছে। সকলেই জল খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে পায়ের ওপর কম্বল চাপিয়ে রাত কাটাবার জন্য তৈরী হয়ে বসেছি এমন সময় বদলে গেল মতটা। আদেশ হল যার যার পাসপোর্ট হাতে করে নেমে এসো, ইমিগ্রেশন এখানেই হয়ে যাবে। তারপর ফুকুওকার নিউ ওটানি হোটেলে নিয়ে যাবে রাত কাটাতে।

আমরা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট হঠাৎ ফুকুওকাতে নেমেছে। ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা। একজন জাপানী এয়ার-পোর্ট অফিসার এই শীতে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হিমসিম খাচ্ছেন। তিনি ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ইউরোপিয়ানরা এক লাইনে দাঁড়াও। এশিয়ানরা আলাদা আর এক লাইনে, আগে ইউরোপিয়ানদের চেকিং হবে। নির্দেশ শুনে আমরা সকলেই একটু থতমত খেয়ে গেলাম। বাংলাদেশের এক মহিলা বেশ তেজস্বিনী। তিনি কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ বললেন, 'মে আই আস্‌ক ইউ সামথিং?' অফিসারটি ভয়ানক নার্ভাস হয়ে অন্য পকেট থেকে আর একটা রুমাল বার করলেন। সেই মহিলা গলা তুলে বললেন, আমার ধারণা ছিল জাপান দেশটা এশিয়ার মধ্যেই— তা হলে আপনারা এভাবে ডিসক্রিমিনেশন করছেন কিসের জন্য?

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন জাপানী অফিসার এসে পড়েছেন। ইংরেজি-জানা একজন বুঝিয়ে বললেন, ও ইংরেজি জানে না, তাই কি বলতে কি বলেছে। আমরা বলতে চাই যারা 'এলিয়েন' অর্থাৎ বিদেশী তাঁরা এক লাইনে দাঁড়ান, পাসপোর্ট চেক হবে। আর যাঁরা জাপানী তাঁরা আলাদা লাইনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করুন। যাক, তবু ভাল আর একটু হলে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতে পারত।

আমি বাংলাতে ডঃ বসুকে বললাম, জাপানীদের সম্পর্কে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল, খুব সুশৃঙ্খল জাত। এরা সামান্য ব্যাপারে এত দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে কেন? না-হয় একটা বিমান আচমকা এসে নেমেছে তাতে

হয়েছে কী। হঠাৎ আমার অন্য পাশে দাঁড়ানো ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন,—কিন্তু আপনি একটা ভুল করছেন। আমি ওঁর মুখে বাংলা শুনে ভয়ানক চমকে গেলাম।

উনি একটু ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, বেশ কিছু দিন হল চট্টগ্রামে আছি, বাংলা ভালই জানি। আপনি একটা ভুল করছেন, যতক্ষণ সব কিছু নিয়মমাফিক চলে ততক্ষণ জাপানীরা সুশৃঙ্খল-ভাবে সব কিছু করতে পারে। কিন্তু একবার বেনিয়ম যদি হয়, লাইনচ্যুত হয়ে যায় কোন কিছু তা হলেই ওরা দিশেহারা, সব কিছু জলে-স্থলে। এর চাইতে আপনারা ইণ্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে অনেক ভালভাবে সব কিছু চালাতে পারেন। কারণ আপনাদের সব কিছুই বেতালে চলে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে ইম্প্রোভাইস করে চলতে হয় আপনাদের, তাই কোন পরিস্থিতিতেই আপনারা বেসামাল হয়ে পড়েন না।

এটাকে ঠিক কমপ্লিমেণ্ট বলা চলে কি না বুঝলাম না। অধ্যাপক গলব্রেথ কোথায় যেন এই ধরনের মন্তব্য করে এর নাম দিয়েছেন ফাংশনিং কেওস (functioning chaos) বা চলমান অব্যবস্থা। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সেই তেজস্বিনী বাংলাদেশের মহিলাও এর কোন প্রতিবাদ করতে পারছেন না।

ঘুমন্ত ফুকুওকা শহর দেখতে দেখতে নিউ ওটানি হোটেলে পৌঁছলাম। আর বিছানাতে শুতে না শুতেই সকাল হয়ে যাওয়াতে উঠে পড়লাম। এই ধরনের হোটেলের চেহারা-চরিত্র সব সময় সব দেশেই এক রকম হয়। জাপানে দু-একটা নূতন জিনিস চোখে পড়ল। কাল রাত্রে ঘরে ঢুকেই দেখেছিলাম বিছানার ওপর রাখা আছে কিমনো। সকালে উঠে বাথরুমে পেলাম দাঁত মাজবার টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট ছোট্ট টিউবে। বেড-টি দিতে কেউ এল না কিন্তু মাথার কাছে রাখা ছোট টেবিলে ছিল সুদৃশ্য চায়ের কাপ, বাটি বলাই ভাল, কারণ হাতল নেই। আর একটি সুন্দর টি-পট, তাতে রাখা আছে গ্রীন টি-ব্যাগ, গরম জল তো বাথরুমেই পাওয়া যাবে।

বিছানায় রাখা কিমনো দেখেই আবিদ হাসানের কথা মনে পড়েছিল।

নেতাজী ও আবিদ হাসান জাপানে পদার্পণের পর প্রথম রাত্রি যে ছোট জাপানী হোটেলে কাটিয়েছিলেন সেখানেও এমনি কিমনো রাখা ছিল। আর আবিদ হাসান ভুল করে মেয়েদের কিমনো পরে শহরে ঘুরতে বেরিয়ে সকলের হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন।

এরোপ্লেন কখন ছাড়বে ঠিক নেই। ফুকুওকা শহরের চেহারাটি একবার দেখে নিতে চাই। আর ফুকুওকাতে থাকেন আমাদের এক পরিচিত বন্ধু তাতসুও হায়াশিদা, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে তাতসুও হয়াশিদা ছিলেন ফরমোজাতে। ফরমোজার আর্মি হেড কোয়ার্টাসে এক জুনিয়ার অফিসার। সে সময়ে ঘটনাচক্রে এক বিশেষ ধরনের কাজের ভার ওঁর উপর এসে পড়ে। তাইপে থেকে টোকিও যাবেন আই. এন. এ.-র হবিবুর রহমান, ওঁর যাত্রাসঙ্গী হতে হবে ওঁকে। ওঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় দুটি বাক্স। একটি বড় বাক্সে ছিল যাকে বলা হয় নেতাজীর ট্রেজার বা ধনরত্ন অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকারের ভাণ্ডারে ভারতীয়দের দান অজস্র স্বর্ণ অলঙ্কার, হীরে-জহরৎ। অপর একটি ছোট কাঠের বাক্স ওঁর হাতে তুলে দিয়ে ওঁকে বলা হয় এটি হল নেতাজী চন্দ্র বোসের ভস্মাধার। হবিবের তখনো ব্যাণ্ডেজ রয়েছে, হাত ঝুলছে স্লিং থেকে।

গলায় উত্তরীয় বেঁধে তার থেকে ভস্মাধারটি ঝুলিয়ে নিয়ে হবিবুর রহমানের সঙ্গে হায়াশিদা রওনা হন এরোপ্লেনে। ওঁরা এসে নামেন এই ফুকুওকা শহরের গানোসু বিমানবন্দরে। এখানে পৌঁছে ওরা ওয়েস্টার্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে বাক্স দুটি এক রাতের জন্য জমা দেন। সে রাতটা ওঁরা কাটান ফুকুওকার আর্মি অফিসারদের ক্লাব কাইকোশাতে। পরদিন দুই বাক্স নিয়ে হায়াশিদা ট্রেনে টোকিওর পথে রওনা হয়ে যান।

সেই যে অল্প বয়সে নেতাজী সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন হায়াশিদা, আর ছাড়া পেলেন না জীবনে। এই এক ব্যাপার লক্ষ করে আসছি বহুবার। একবার যদি কোন-না-কোন রকমে নেতাজীর সংস্পর্শে এসে পড়ে কেউ, সে ভারতীয় বা বিদেশী যে-ই হোক না কেন আর তার ফেরা হয় না।

হায়াশিদা পরবর্তী জীবনে বই লিখেছেন নেতাজীর ওপর—Netaji Subhaschandra Bose: His Martyrdom and Struggle—জাপানী ও ইংরেজি দুই ভাষাতে বার হয়েছে সেই বই। এছাড়া নেতাজীর প্রামাণ্য জীবনী Beacon Across Asia বইয়ের একটি অধ্যায়েরও লেখক তিনি।

ফুকুওকা শহর অল্পবিস্তর দেখা হয়ে গেল কারণ দ্বিপ্রহর অবধি সেখানেই কাটল। কিন্তু হায়াশিদার সঙ্গে কিছুতে যোগাযোগ করা গেল না। টেলিফোন ডায়াল করা মাত্র টেপকরা কণ্ঠস্বর অপর দিকে জাপানী ভাষায় একই কথা বার বার বলে চলে। অনুমান করলাম বলছে, মিঃ হায়াশিদা বাড়ি নেই বা ঐ জাতীয় কিছু। পরে রহস্য বুঝেছিলাম। আমরা যখন ফুকুওকাতে হায়াশিদাকে খুঁজছি উনি তখন নারিটা বিমানবন্দরে অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ওয়েলকাম করার জন্য।

আমাদের স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, বাংলাদেশী, ভারতীয় সহযাত্রীরা খুবই আপসেট হয়ে আছেন। আজ সকালে টোকিওতে তাঁদের আন্তর্জাতিক মেডিকেল কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করলেন জাপানের যুবরাজ স্বয়ং আর ওঁরা কিনা পড়ে রইলেন ফুকুওকাতে।

পরে জেনেছিলাম আমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা পণ্ড হয়ে গেছে সেদিন। টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটি প্রথম বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন টোকিওর নিপ্পন ক্লাব বা জাপান ক্লাবে। আলোচনাচক্র ছাড়াও মস্ত বড় ব্যাংকোয়েটের আয়োজন হয়েছিল সেই সঙ্গে। ঐ সব হল জেনারেল ফুজিয়ারার প্ল্যানিং। জাপানে আমাদের বৈঠক শুরু হবে একটি ব্যাংকোয়েট দিয়ে ও জাপান ছেড়ে আসার আগে শেষ হবে আর একটি ব্যাংকোয়েট দিয়ে। অনেক দূর থেকে সকলে এসেছিলেন। বৃদ্ধ জাপানী জেনারেলরা, ইমফল যুদ্ধের সব অফিসাররা। কাকিৎসুবো থাকেন টোকিওর বাইরে, তিনিও এসেছিলেন। কাকিৎসুবো হলেন আজাদ হিন্দ সরকারে জাপানী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী। তা ছাড়া টোকিওতে নেতাজীর সঙ্গে উনি সব সময় থেকেছেন দোভাষী হিসাবে। পরে জাপানের পররাষ্ট্র

দপ্তরে উচ্চপদে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই আগের রাত্রে নারিটাতে ব্যর্থ জার্নি করে গেছেন একবার। খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন সকলেই।

কেনজি ইয়াশিরো সাহিত্যিক, সম্প্রতি একটি পপুলার বই লিখছেন নেতাজীকে নিয়ে। সব সময় কাঁধে ক্যামেরা আর পকেটে টেপরেকর্ডার নিয়ে ঘুরছেন। আমাকে ছবি দেখালেন জাপানি ক্লাবের সেই মিটিং-এর। নিমন্ত্রিতরা সকলে এসেছেন, ভারতীয় অতিথিদের দেখা নেই। অপেক্ষায় বসে আছেন সবাই, ঈষৎ ক্লান্ত চেহারা। ছবিগুলো ইয়াশিরোর ভাষায়—ওয়েতিং, ওয়েতিং, ওয়েতিং···।

॥ ২ ॥

যা হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। টোকিওতে আমাদের কাজকর্ম চব্বিশ ঘণ্টা দেরী করে শুরু হল। সেদিন ফুকুওকা থেকে নারিটা, নারিটা থেকে টোকিওর অন্য প্রান্তে রোপোংগিতে ইণ্টারন্যাশনেল হাউজ অব জাপানে পৌঁছতে রাত হল। জেনারেল ফুজিয়ারা, ইয়াশিরো, হায়াশিদা প্রভৃতি জাপানী বন্ধুরা আমাদের বিশ্রাম নিতে বলে দরজা থেকে 'গুড নাইট' করে চলে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখি চারিদিকে বিভিন্ন ফুলদানীতে শোভা পাচ্ছে ফুল। আগের রাত্রে যাঁরা নারিটা বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন তাঁদের আনা উপহার।

জাপানে আমাদের কাজকর্ম সব পরিকল্পনা করে রেখেছেন জেনারেল ফুজিয়ারা। যেন একটা যুদ্ধের অপারেশন প্ল্যান করেছেন, এমনি নিখুঁত সব কিছু। উনি আমাদের জেনারেল অফিসার কম্যানডিং, আমরা সাধারণ সিপাহী। এই নিয়ে হাস্য-পরিহাস কম হত না। ইয়োকোয়ামা হল কিওটো ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক, সে হেসে হেসে রোজ

বলত—আজ আমাদের ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে অর্ডারস হচ্ছে এই এই— ।

সকাল হতে না হতে ঘরের টেলিফোন বাজে ঝনঝন। ফুজিয়ারা অপেক্ষা করছেন, দিনের কাজ শুরু হবে। একটু দেরী হয়েছে কি হয়নি, আর টেলিফোন নয়, এবার দরজায় ঠকঠক। এক একদিন হাঁপিয়ে পড়লে আমি হতাশ হয়ে বলতাম আফটার অল আমি একজন সাধারণ মেয়ে, উনি কেন যে ভুলে যান আমি সত্যিই তো আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাই নই।

টোকিওতে আমাদের পর পর অনেকগুলো আলোচনা সভা বা ঘরোয়া বৈঠক হল নেতাজীর পূর্বতন সহযোগীদের সঙ্গে। বিচিত্র সব জায়গায় এইসব আসর বসেছে। কখনো হয়ত কোন বৌদ্ধ মন্দির বা শ্রাইনে, যেমন ইয়াসুখুনি শ্রাইন, কখনো বা কোন জাপানী রেস্তোরাঁয়, যেমন শহরের কেন্দ্রে জিওসাংকেই রেস্তোরাঁতে, হোকাইডো অঞ্চলের রান্নার জন্য বিখ্যাত এই রেস্তোরাঁ। কখনো বা জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের এশিয়া বিভাগে আমাদের নিজেদের দূতাবাসেও একদিন সব প্রবীণ জেনারেলদের ও আমাদের রাষ্ট্রদূত-এর উপস্থিতিতে আলাপ-আলোচনা হল।

প্রথম দু' দিন অবশ্য সারাদিন ধরে বিভিন্ন অভ্যাগতরা এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। কাজের চাপ তখন কিছু কম। অভ্যাগতদের ভীড় সামলাবার জন্য ফুজিয়ারা রইলেন আমাদের সঙ্গে প্রায় সব সময়।

প্রথমেই এলেন টেরুও হাচিয়ার স্ত্রী মিসেস হিরো হাচিয়া। আমি ওঁকে টেলিফোনে অনেকবার বারণ করলাম। অতি সম্প্রতি স্বামীকে হারিয়েছেন উনি। আমরাই যাব ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু উনি কিছুতেই শুনবেন না। কেবলি বলেন আজ যদি মিঃ হাচিয়া থাকতেন তিনি কি ছুটে যেতেন না ?

তা অবশ্যই আসতেন। তবে নেতাজীর কাছে মিঃ হাচিয়া যেদিন প্রথম এসেছিলেন দেখা করতে, নেতাজী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মতি জানিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা রেঙ্গুনে ১৯৪৫ সালের গোড়ায়। জাপান সরকার হাচিয়াকে আজাদ হিন্দ সরকারে ওঁদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে

পাঠিয়েছিলেন। নতুন দেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে এসে প্রথমেই রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পরিচয়পত্র বা ক্রেডেনশিয়াল পেশ করতে হয়। এদিকে যুদ্ধের মধ্যে টোকিও থেকে রেঙ্গুন অনেক কষ্টে হাচিয়া এসে পৌঁছেচেন তার দূতাবাসের কর্মীদের নিয়ে, আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র সঙ্গে নেই। নেতাজী বলে পাঠালেন আগে আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র আসুক, তারপর দেখা হবে। অতএব হাচিয়া প্রতীক্ষায় বসে রইলেন।

দূতাবাস কর্মী বলতে জনা পাঁচেক লোক ছিলেন হাচিয়ার সঙ্গে। তার মধ্যে আছেন মাসোয়াশি কাকিংসুবো দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আর আছেন ওতা। এই ওতার নাম আমাদের খুব পরিচিত। যুদ্ধের সময় ওতা ছিলেন কলকাতার জাপানী কনসাল—যে সময় শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। কনসাল জেনারেল ওকাজকি ও কনসাল ওতা এঁদের মাধ্যমেই নেতাজীর সংবাদ গোপনে পেতেন শরৎচন্দ্র বসু। নেতাজী তখন জার্মানীতে। আবার এঁদের মারফত গোপন বার্তা পাঠাতেন নেতাজীর কাছে।

ইসোডা, যিনি ছিলেন হিকারি কিকানের কর্তা তাঁর কাছে আর হাচিয়া ও কাকিংসুবোর কাছেও রেঙ্গুনের এই শেষ দিনগুলোর কথা একাধিকবার শুনেছি আমরা। কাকিংসুবো এবারও উপস্থিত ছিলেন আমাদের কোন কোন বৈঠকে। কাকিংসুবো বলেন—আরে, আমাদের অ্যাপয়েনটমেণ্ট তো হয়ে গেছে অনেকদিন। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে টোকিও থেকে রেঙ্গুন আসা তো সহজ কথা নয়। শেষ পর্যন্ত একটা ওষুধ বোঝাই কার্গো জাহাজে চেপে বসলেন ওঁরা। এই জাহাজ যাবে সাইগনের দিকে। ওষুধপত্র সব ইংরেজ-আমেরিকান যুদ্ধবন্দীদের জন্য যাচ্ছে। তাই ওঁরা কথা দিয়েছেন বোমা ফেলবে না বা টর্পেডো করবে না, জাহাজের ওপর বড় বড় করে নীল রং-এর ক্রস আঁকা ছিল। অবশ্য ওরা ওদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ফিরতি পথে টর্পেডো করে ডুবিয়ে দিয়েছিল জাহাজ, বেশ কিছু লোকের প্রাণহানি হয়েছিল।

নেতাজী যে কোন কোন বিষয়ে খুব শক্ত মানুষ, তা হাচিয়া বুঝে

গিয়েছিলেন প্রথম প্রত্যাখ্যানের পরই। তারপর আবার নেতাজীর রুদ্ররূপ দেখলেন রেঙ্গুন থেকে রিট্রিটের আগে। হাচিয়া ও ইসোডা নেতাজীকে বলতে গিয়েছিলেন ওঁর জন্য রিট্রিটের সব ব্যবস্থা করা হবে। উনি ভাল গাড়িতে নিরাপদ জায়গায় যেতে পারবেন। ক্রুদ্ধ নেতাজী বললেন তোমরা আমাকে ভেবেছ কি? সব সৈনিকদের নিরাপদ রিট্রিটের ব্যবস্থা আগে চাই। তা ছাড়া রানী ঝাঁসি বাহিনীর একটি মেয়েও যতক্ষণ থাকবে নেতাজী রেঙ্গুন ছেড়ে নড়বেন না।

হাচিয়া ও ইসোডা ছুটোছুটি করে সেই বিপর্যয়ের মধ্যেও নেতাজীর জন্য গাড়ি ও অন্যান্যদের জন্য ট্রাক লরির ব্যবস্থা করলেন। কাকিৎসুবোর আজ মাথার চুল সব পাকা, ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে কম দিন হল না। কেরিয়ারের গোড়ায় দিকে ১৯৩৬-৩৭এ ছিলেন কলকাতায় ভাইস কনসাল, শেষ জীবনে ইউ. এন. ও-তে জাপানের প্রতিনিধি, আর মাঝে ছিলেন পাকিস্তানে জাপানের রাষ্ট্রদূত। উনি হেসে হেসে বলছিলেন—কী বিপদ দেখো তো। নেতাজীকে ফেলে চলে যেতেও পারি না আবার বেঘোরে প্রাণ দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়তে উৎসুক নই একটুও।

এই রিট্রিটের সময় নেতাজীর অন্য চেহারা দেখে গেলেন হাচিয়া। সকলের তদারক করছেন, সকলের সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। একখানা ছোট গাড়িতে ইসোডা, হাচিয়া ও কাকিৎসুবো চলেছেন সঙ্গে। প্রথমেই পথে থেমে গেল ওঁদের গাড়ি। নেতাজী নিজের বড় লিংকন গাড়িতে তুলে তাঁদের উদ্ধার করলেন। অবশ্য এরপর ওঁর নিজের গাড়িও থসথসে কাদায় একেবারে বসে গেল। সকলে মিলে নেতাজীর গাড়ি ঠেলতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

মেয়ে সৈনিক দেখা অভ্যাস নেই জাপানী অফিসারদের। ঝাঁসির রানী-বাহিনীর মেয়েরা মাথার ওপর বন্দুক তুলে নদী পার হচ্ছে দেখলেন ওঁরা। সিটাং পর্যন্ত সকলে একসঙ্গে এলেন। কাকিৎসুবো তারপরও কিছু পথ নেতাজীর সঙ্গে হেঁটে এলেন। সিটাং-এ একটা বিশ্রী ট্রাজেডি হয়ে যায়। স্নুরুতা বলে এক জাপানী অফিসারকে ভুল করে মেরে ফেলে আজাদ হিন্দ

ফৌজের এক সৈনিক। সে তাকে শত্রুপক্ষের চর বলে ভুল করছিল। নেতাজী অসম্ভব বিচলিত হয়েছিলেন এই ঘটনায়। কাকিৎসুবো আমাদের কাছে গল্প করলেন, পরে ব্যাঙ্ককে পৌঁছে নেতাজী জানতে চাইলেন কত ক্ষতিপূরণ সুরুতার পরিবারকে দিলে ন্যায্য হবে। কাকিৎসুবো যে পরিমাণ বলেছিলেন তার ঠিক ডবল উনি দিয়েছিলেন সুরুতার পরিজনদের জন্য।

হাচিয়া যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাঁর রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা নিষ্ঠা সহকারে পালন করে গিয়েছেন। জাপানের পরাজয় যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল, আত্মসমর্পণ নিয়ে ব্যাঙ্ককে নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন হাচিয়া। নেতাজী কোথায় যেতে চান, কী তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। জাপানের আত্মসমর্পণের পরও হাচিয়া ও ইসোডা নেতাজীর সঙ্গে সায়গন পর্যন্ত এলেন। সায়গনে পৌঁছে নেতাজীর যাবার ব্যবস্থা করতে ফিল্ড মার্শাল তেরৌচির সদর দপ্তরে অনেক ছুটোছুটি করতে হল। সায়গন এয়ারপোর্টে ১৯৪৫ সালের আগস্টে হাচিয়া অন্যান্যদের সঙ্গে নেতাজী ও হবিবুর রহমানকে বিদায় জানান। পরবর্তী দৃশ্য দিল্লীর লালকেল্লা। হাচিয়া রয়েছেন বন্দী আই. এন. এ. অফিসারদের সঙ্গে। তাঁরা ওঁকে যথাসাধ্য দেখাশুনো করছেন। চারিদিকে জয়হিন্দ ধ্বনির মধ্যে ওঁর মনেই হয়নি বিদেশে আছেন।

মিসেস হাচিয়া চোখের জল মুছছিলেন আর বলছিলেন তাঁর স্বামী নেতাজীর কথা কত বলতেন, কত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। যুদ্ধের পর সেসব দিনের কথা চাপা পড়েছিল মনের মধ্যে অনেকদিন। পনেরো বছর আগে হাচিয়া যখন জাপান-আমেরিকা সোসাইটির সভাপতি হঠাৎ তাঁর টোকিও অফিসে উপস্থিত হন ডঃ বসু। সেই থেকে দীর্ঘ পনেরো বছর হাচিয়ার সঙ্গে কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ যোগ। প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতাজী সেমিনারে যোগ দিতে কলকাতা এসেছেন হাচিয়া, সঙ্গে এসেছেন মিসেস হিরো হাচিয়া।

আমরা ইন্টারন্যাশনেল হাউসের কফি রুমে বসে স্মৃতিচারণ করছিলাম। তিনদিকে স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়াল, তার বাইরে দেখা যাচ্ছে সুদৃশ্য জাপানী গার্ডেন, গাছপালা, পাথরের ছোট ছোট পাহাড়। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে

গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল আমি কোথায়। মিসেস হাচিয়ার সঙ্গে কলকাতায় বসেও অনেকদিন অনেক গল্প করেছি। হাচিয়া ফরেন অফিসের কাজে লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে বেশ কিছুদিন ধরে বসবাস করার ফলে মিসেস হাচিয়া ইংরেজী বলেন সুন্দর। ভাষাবিভ্রাট না থাকাতে ওঁর সঙ্গে গল্প করে আরাম পাওয়া যায়। মিসেস হাচিয়া আমেরিকার কলেজে কিছুদিন পড়াশুনোও করেছেন। এই বয়সেও সুন্দর নাচতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর পর জাপানী নাচের স্কুলে নাচ শেখাচ্ছেন।

এক সময়ে উনি আমাকে গলা নামিয়ে বললেন, একটা কথা বলব? অবশ্য এটা একটা জাপানী প্রথা, তোমরা কি ভাববে জানি না। জাপানে একজনের মৃত্যু হলে পর তার ব্যবহার করা কোন জিনিস তা সে চশমা, কলম, কিমনো—যা-ই হোক না কেন, তার খুব প্রিয় বন্ধু ও পরম আত্মীয়দের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। এই প্রথাকে আমরা বলি 'কাটামা'। আমার একান্ত ইচ্ছা আমার স্বর্গত স্বামীর সামান্য কিছু এই কাটামা প্রথা অনুযায়ী তোমাদের হাতে দিই, কোন আপত্তি হবে কি?

আপত্তি কিসের! এ তো পরম সৌভাগ্য। নিশ্চয় গ্রহণ করব আমরা। মিসেস হাচিয়া চোখ মুছতে মুছতে ধন্যবাদ দিলেন। আমরা দুজন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, ভাবছি এবার লাউঞ্জে গিয়ে বসব, মিসেস ফুজিয়ারা আসবেন এখনি। এমন সময় পাশের টেবিল থেকে এক সাহেব উঠে এসে বললেন—এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিসেস বোস? আমি তো বেশ অবাক। এ সাহেব আবার কে! এসেছি তো আগের রাত্রে। এখানে তো কাউকে চিনি না।

সাহেব বলে চললেন—আপনি তো এসেছেন নেতাজী সংক্রান্ত গবেষণার কাজে, তাই না? টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির সভাপতি কাটাকুরাকে তো ভালই চেনেন, আমার সঙ্গেও আলাপ আছে ওঁর। আর ফুজিয়ারা—চার্মিং পার্সন, চমৎকার মানুষ তাই না—?

আমি মনে মনে খুব আশ্চর্য হচ্ছি। এ যে অনেক খবর রাখে। মুখে বললাম, তা আপনি? সাহেব নিজের পরিচয় দিলেন। একজন আমেরিকান

ঐতিহাসিক, ওখানকার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। ইতিহাস সংক্রান্ত একটি প্রোজেক্টের কাজে টোকিওতে এসেছেন।

কথায় কথায় বললেন—না, এটা তাঁর প্রথম ভিজিট নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে আমি ছিলাম ম্যাকআর্থারের সঙ্গে আমেরিকান আর্মির একজন ইণ্টেলিজেন্স অফিসার, তখন জাপানই ছিল আমার কর্মস্থল।

মিসেস হাচিয়া ও আমি চেয়ার টেনে ওঁর টেবিলে কিছুক্ষণ বসলাম। মিসেস হাচিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। মিসেস হাচিয়ার পরিচয় শুনে উনি কৌতূহলী হলেন আরো। বললেন, সেই বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ওঁর চন্দ্র বোস এবং আই. এন. এ. সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে যায়। তার বিশেষ কারণও ছিল অবশ্য। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কর্নেল ফিগেসের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

যে কর্নেল ফিগেস ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্স-এর বড় কর্তা ছিলেন সে সময় টোকিওতে তার কথা বলছেন? তিনি তো সম্প্রতি ব্রিগেডিয়ার না কি যেন হয়েছেন বলে শুনেছি।

'হ্যাঁ, সেই ফিগেসের কথাই বলছি। মাউণ্টব্যাটেনের হেড কোয়ার্টারস থেকে ফিগেসকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাইহোকুতে নেতাজীর এয়ার ক্র্যাশ সম্পর্কে তদন্ত করে একটা পূর্ণ রিপোর্ট দিতে। ফিগেস আমাদের ম্যাক-আর্থারকে অনুরোধ করেন তদন্ত করে দিতে। কাজটা ব্রিটিশদেরই, আমাদের কোনই কনসার্ন নয়। কিন্তু ওঁদের লোকবল খুব কম ছিল সে সময়, তাই আমাদের কাজটা করে দিতে বলে। আমরা একশজনের মত ছিলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ি। সে সময়ে অনেককে ইণ্টেরোগেট করতে হয়েছিল। বিশেষ করে হবিবুর রহমানকে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম ওঁর দিকে। আর কিছু বলছেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের রিপোর্টে কি ছিল সেকথা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? একটু আশ্চর্য হয়ে উনি বললেন, 'কেন, উই ক্লোজড দ্যাট ম্যাটার অ্যাট দ্যাট টাইম। আমরা সিদ্ধান্তে আসি আপনাদের লিডার সেই ক্র্যাশে গুরুতর আহত হয়ে মারা যান।'

কলকাতা ছাড়বার কয়েকদিন আগে আমি ফিগেসের লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ দেখেছিলাম। ফিগেস অতি সম্প্রতি চিঠিখানা লিখেছেন এক নেতাজী গবেষককে। এই আমেরিকান যা বলছে তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে চিঠির বক্তব্য। সেই গবেষকের প্রশ্নের উত্তরে ফিগেস লিখছেন, আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর ম্যাটার ক্লোজড বলে দিই। প্রকৃতপক্ষে ফিগেস আরো বিশদভাবে এবং পরিষ্কার করেই আরো কথা লিখেছেন সেই চিঠিতে।

এই আমেরিকান ইতিহাসের প্রফেসর বসে বসে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে চললেন। ওঁর নিজের বর্তমান প্রোজেক্ট-এর কথাও বলেছিলেন। জাপানের আর্মির ওপর একটা গবেষণার কাজ করছেন ওঁরা। উনি বললেন —আপনারা আসার কিছুদিন আগে এই ইণ্টারন্যাশনেল হাউসেই এক আমেরিকান স্কলার দেখলাম সেই এয়ার ক্র্যাশের পর যাঁরা জীবিত আছেন —সেইসব সারভাইভরদের ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন। তাইহোকুতে হাসপাতালে যে দুজন ডাক্তার নেতাজীর চিকিৎসা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ডাঃ ইয়োশিমিকে যেদিন উনি ইণ্টারভিউ করছিলেন, সেদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন ? ও ব্যাপারটা তো কবেই ক্লোজড হয়ে গেছে। উনি বললেন, তবুও একবার নিজে কথা বলতে চাই, বই লিখব একটা।'

আমার তখনো জেট-ল্যাগ কাটেনি ভাল করে। এমনিতেই মাথা ঝিমঝিম করছে। ভাল লাগে না এসব আলোচনা। ওঁকে বললাম, পরে আবার কথা হবে আপনার সঙ্গে, আজ চলি। উনিও বললেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হলে সুখী হব, আমি এই ইণ্টারন্যাশনেল হাউসেই আছি।

এই একটি বিষয় আমাকে জাপান ভ্রমণের সময় বিব্রত করেছে এবং বিষণ্ণ করেছে বারবার। নেতাজীকে নিয়ে সামান্য যা কিছু লেখাপড়ার কাজ করেছি তার থেকে বিমান দুর্ঘটনা, মৃত্যু এইসব বরাবর দূরে রাখতে চেয়েছি আমি। তার কারণ আর কিছু নয়, একজন মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে অতিরিক্ত কৌতূহল, অবাঞ্ছিত বিতর্ক তার জীবনের মহৎ কীর্তিকে ছাপিয়ে উঠবে, এ কখনোই স্বাস্থ্যকর হতে পারে না মনে হয়েছে। তা ছাড়া

নেতাজীর জীবনের ইউরোপের অধ্যায় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বেশী আকৃষ্ট করে, সেটা নিজস্ব অভিরুচির কথা। কিন্তু জাপানে এসে বুঝলাম এই টপিকের হাত থেকে নিস্তার নেই। চাই বা না-চাই ঘুরে ফিরে এসে পড়বেই।

এদিকে লাউঞ্জে এসে দেখি মিসেস ফুজিয়ারা ঢুকছেন, হাতে মস্ত বাস্কেট, তাতে জাপানে সে সময় যতরকম ফল পাওয়া যায় সবই আছে। আর আছে জাপানী মিষ্টি। ওঁদের মিষ্টি একটু অদ্ভুত ধরনের, ময়দার খাবার। মিষ্টি রুটির মত স্বাদ। মিসেস ফুজিয়ারাকে বললাম, করেছ কি? এত কে খাবে? উনি তো মোটে ইংরেজি বোঝেন না। জবাবে থলে থেকে একটা মস্ত ছুরি বার করে 'খাও' করলেন—অর্থাৎ ফল কেটে খাও। মিসেস হাচিয়া বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর অল্পক্ষণ হাতের কাছে কোন দোভাষী ছিল না। ছুরি দিয়ে পার্সিমন নামে বড় পীচের মত একটা ফল কেটে এক-টুকরো খেতে হল। তারপর হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে গল্প করলাম খানিক। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল এত কষ্ট করে কথাবার্তা চালাচ্ছি কেন? সঙ্গে তো রয়েছে নেতাজীর চিত্রময় জীবনী। সেই বইখানা বার করে ওঁর হাতে দিতে খুব খুশি। অমনি বইয়ের উল্টো দিক থেকে পাতা উল্টে দেখতে শুরু করলেন।

এই একটা ব্যাপার আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু আশ্চর্য লাগে। যে কোন জাপানী পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি দেখামাত্র চট করে পিছন থেকে দেখতে শুরু করে দেয়। প্রথমে মনে হয়েছিল এঁরা বোধ হয় জাপান ও পূর্ব এশিয়ার ছবিগুলো দেখতে বেশী আগ্রহী। তাই প্রথমেই পিছনের পাতায় চলে যায়। অনেকে তো নিজেদের ছবি দেখে উত্তেজিত হয়ে 'এই যে আমি, এই যে আমি' বলে ওঠে। কাকিৎসুবো বলেছিলেন—দেখেছ তো আমি একদিন ইয়ং ছিলাম। পিছনের পাতা থেকে শুরু করার রহস্য অবশ্য অন্য। সব জাপানী বই-ই তো উল্টো দিক থেকে শুরু হয়, তাই ওঁদের এই অভ্যাস। লক্ষ্য করে দেখেছি শুধু দু'জন জাপানী বন্ধু বইটি প্রথম থেকে ঠিকমত খুলে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাংবাদিক বন্ধু ইয়োকোবরি,

অন্যজন ইতিহাসের প্রফেসর তোশিও ইয়োকোয়ামা। এঁদের দু'জনেরই রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অভিজ্ঞতা।

জাপানের সেই প্রথম দিনের অভ্যাগতদের মধ্যেই ছিলেন ইয়োইচি ইয়োকোবরি। কিওডো নিউজ সার্ভিসে কাজ করেন। কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক নেতাজী সেমিনারে তাঁকে অনেকে দেখে থাকবেন। সেইরকমই চটপটে, স্মার্ট তরুণ চেহারা দেখলাম। নেতাজীকে নিয়ে কাজ করা ওঁর একটা নেশা। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে নেতাজী সম্পর্কে যত খবর বেরিয়েছে সব উনি সংগ্রহ করেছেন। সেদিনও হাতে নিয়ে এসেছেন বেশ কিছু নতুন সংগ্রহ করা কাগজপত্র, কাটিং ইত্যাদি।

জেনারেল ফুজিয়ারা আছেন। আছেন কেনজি ইয়াশিরো, ইয়োকোবরি প্রভৃতি। খুব জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে। এমন সময় এসে পড়লেন কাজুও আজুমা। আজুমাকে তো বাঙালীই বলা চলে। শান্তিনিকেতনে কলকাতায় অনেকেই ওঁকে চেনেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকার বাংলা বলেন। আজুমা এসেই নীচে লাউঞ্জ থেকে ফোন করলেন পরিষ্কার বাংলায় —আজুমা বলছি, আমি এসে গেছি।

জাপানীদের বাংলা ভাষা চর্চার আগ্রহ দেখে খুব ভাল লাগল। অল্প-দিনের মধ্যে চমৎকার বাংলা জানা ক'জন জাপানীর দেখা পেলাম। তার মধ্যে আছেন আজুমা, জাপান রেডিওর হানেডা, আমাদের কলকাতার বন্ধু ফুজিতা। হানেডা তাঁর মুক্তোর মত হাতের লেখায় ঝরঝরে বাংলায় চিঠি দিলেন আমাদের। ফুজিতা ছিলেন কলকাতায় জাপানের অন্যতম কনসাল। বাংলা ভাষা আর রবীন্দ্রসংগীত দুই-ই শিখেছেন শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় আমাদের সঙ্গে বসে অনেক দিন শুনিয়েছেন ওঁর প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত—'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে।'

কিন্তু সব চাইতে চমকে দিয়েছিলেন একদিন আমাদের দোভাষী। জাপানে তো দোভাষী ছাড়া একপাও চলার উপায় নেই। এক-একদিন এক-একজন আমাদের সঙ্গে থাকতেন। জাপানী-ইংরেজি দোভাষী যেমন

থাকতেন, তেমনি থাকতেন কখনো কখনো জাপানী-বাংলা দোভাষী। আর দিনের প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দেবার সময় আমাকে অনেক সময় বলতেন—আজ এই এই আলোচনাসভা আছে, তারপর সভা শেষে আছে ভোজন। ওঁর এই 'ভোজন' শুনে আমার খুবই কৌতুক বোধ হত। আর বলতে কি ভোজন সব সময়ই বেশ গুরুতর রকমই থাকত।

এরই মধ্যে একদিন আমার নেতাজীর সঙ্গে জড়িত এক বৃদ্ধ জাপানী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার নেবার কথা। এমন সময় খবর এল হঠাৎ উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ওটা ক্যানসেল করতে হবে। খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলাম ওঁর কি হয়েছে? একেবারেই কথা বলতে পারবেন না? আমার জাপানী-বাংলা দোভাষী জবাবে গম্ভীরভাবে বললেন—'তাঁর মস্তকে অকস্মাৎ রক্তক্ষরণ হচ্ছে।' শুনে তো আমার রবীন্দ্রনাথের বাচস্পতির ভাষায় 'উথ্‌রংসিত' অথবা 'ভিরভ্রিংগট্ট' হয়ে যাবার অবস্থা!

অনেক রাত্রি অবধি আড্ডা দিয়ে সকলে বিদায় নিলেন। তখনি শুনলাম টোকিও ক্রাইমলেস শহর, সম্পূর্ণ অপরাধমুক্ত। গভীর রাত্রে অবাধে ঘুরে বেড়ানো চলে। গত দশ বছরের মধ্যে কোন ক্রাইম হয়নি, একবার এক পাগল শুধু কাকে যেন তাড়া করেছিল!

॥ ৩ ॥

জাপানে আমাদের কাজকর্ম জেনারেল ফুজিয়ারা তিন পর্বে ভাগ করে প্ল্যান করেছেন। এক, নেতাজীর টোকিও প্রবাসের সঙ্গে যুক্ত এমন কয়েকটি জায়গা অবশ্যই দেখতে হবে। দুই, জাপানের ইতিহাস ও শিল্পকলা সম্পর্কে সামান্য হলেও কিছু জ্ঞান আহরণ করতে হবে, নয়তো ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী হবে না। আর তিন, নেতাজীর যত পরিচিত অনুগামী সকলের সঙ্গে হয় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নয় আলোচনা বৈঠক।

প্রথমেই যাওয়া হল ইমপিরিয়াল হোটেল দেখতে। নেতাজী ১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম টোকিও বাসের দিনগুলি এই হোটেলে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু ইমপিরিয়াল হোটেলের সামনে গিয়ে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফুজিয়ারা অবশ্য আগেই বলে দিয়েছিলেন, সে-ইমপিরিয়াল হোটেল কিন্তু আর নেই। পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন, আধুনিক অট্টালিকা উঠে গেছে। নাম অবশ্য এখনো ইমপিরিয়াল হোটেলই আছে। 'জায়গাটা তোমাকে একবার দেখাতে আনলাম'—ফুজিয়ারা বললেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমপিরিয়াল হোটেল নিয়ে কথাবার্তা হল খানিক। আর আমি শূন্যস্থান পূরণ করার ভঙ্গীতে ইমপিরিয়াল হোটেলের দিনগুলির কথা মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছিলাম। ডাঃ বসু ফুজিয়ারাকে বলছিলেন, উনি যখন এসেছেন আগের বার তখনো পুরনো বাড়ি রয়েছে। একদিন সোজা হোটেলে ঢুকে রিসেপশনিস্টকে বলেছিলেন, আমি একবার দেখতে চাই যুদ্ধের সময় চন্দ্র বোস কোন ঘরে থাকতেন। কাউণ্টারের ছেলেটি বয়সে নবীন। চন্দ্র বোসের নাম শুনেছে কিন্তু কোন ঘরে ছিলেন জানে না। সে ডেকে নিয়ে এল কিমনো-পরা এক বৃদ্ধা পরিচারিকাকে। বৃদ্ধা চোখ সরু করে অনেকক্ষণ ডাঃ বসুর দিকে চেয়ে থেকে জাপানী ভাষায় কী যেন বলে উঠল। সে বলেছিল—this is a Bose alright. তারপর একগোছা চাবি নিয়ে সে চলল ঘর দেখাতে। তখন যদিও হোটেলে বেশ ট্যুরিস্টদের ভীড়, নেতাজীর ঘর ভাগ্যক্রমে খালিই ছিল। ঘর নয়, তিনটি ঘর নিয়ে স্যুইট—২০২, ২০৪ ও ২০৫ নম্বর ঘর। ঘর দেখাতে দেখাতে বুড়ী নানারকম গল্প বলেছিল তখনকার দিনের। কত লোক আসত যেত এখানে সে সময়। বুড়ীর অবশ্য সবচেয়ে পছন্দ হত যখন শাড়ি পরা ইণ্ডিয়ান মহিলারা আসতেন, তাঁরা অনেক সময় মাটিতে বসে নিজেরা আলাপ-আলোচনা করতেন। নেতাজীর শোবার ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। সেদিন কোন কর্মকোলাহল ছিল না, শুধু এককোণে ঘর গরম করার পাইপ থেকে চাপা হিসহিস আওয়াজ হচ্ছিল।

নীচে নেমে এসে দেখা গেল, আর এক বৃদ্ধাকে ততক্ষণে হাজির করেছেন

হোটেল কর্তৃপক্ষ। ইনি ছিলেন সে সময়ে হোটেলের টাইপিস্ট। মোটামুটি ইংরেজী জানেন। নেতাজীর কাগজপত্র প্রয়োজনমত সে সময় টাইপ করে দিয়েছেন। নেতাজীর দৃপ্ত চেহারা, কথা বলা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন উনি। নেতাজীর উদ্দেশে একটা কবিতা লিখেছিলেন সে সময়। পরদিন সেটা খুঁজে এনে ওঁকে দেন। আর সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাও জাপানী ভাষায় দু' চার কথায় লিখে দেয় তার সেই সময়ের স্মৃতি।

ইমপিরিয়াল হোটেলের দিনগুলোর কথা আরো কিছু বললেন তাতসুও ফুকাই। ফুকাই এখন জাপান চেম্বার অফ্ কমার্সের আন্তর্জাতিক ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত। মাথাভরতি পাকা চুল, হাসিখুশি চেহারা। ফুকাই ছিলেন ১৯৩৭-এ দিল্লিতে জাপানী এম্ব্যাসিতে। তখন থেকেই উনি নেতাজীকে চিনতেন। তাই নেতাজী টোকিও এসে পৌঁছনোর পর ফুকাই-এর ওপর ওঁর দৈনন্দিন দেখাশুনোর ভার পড়ল। উনিও ইমপিরিয়াল হোটেলেই আর একটি ঘর নিয়ে রইলেন। নেতাজীর সঙ্গে ওঁর একটা ব্যক্তিগত ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উনি যে কীরকম স্নেহশীল মানুষ ছিলেন তরুণ অফিসার ফুকাই তার পরিচয় পেয়েছিলেন।

ফুকাই-এর সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় ছিল না। কলকাতায় একবার আমাদের কাছে উনি চিঠি লিখেছিলেন জাপানী-ঘেঁষা ইংরেজীতে। তাতে নেতাজী ওঁকে কত ভালবাসতেন সেকথা লিখতে গিয়ে আরো লিখেছিলেন —হি লাভ্ড মাই ওয়াইফ টু (He loved my wife too) ওঁর ইংরেজী পড়ে কলকাতায় সবাই হেসেই অস্থির। এখন অবশ্য ওঁর কথাটার কিছু অর্থ বুঝতে পারা গেল। নেতাজী একদিন ওঁকে হেসে বলেছিলেন, তোমার মত স্মার্ট, ইয়াং অফিসার এখনো ব্যাচিলার রয়েছ কেন, এবার তুমি বিয়ে কর। যুদ্ধের গোলমালে বিয়ে করে উঠতে পারেননি ফুকাই তারপরও কিছুদিন। কিন্তু শেষবার যখন নেতাজী এলেন যুদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ। ফুকাই ভাবছিলেন আর ক'দিন বাঁচব কে জানে, মরবার আগে বিয়েটা করেই ফেলি। নেতাজী যেদিন পৌঁছলেন সেদিন ফুকাই মেয়ে দেখেছেন। নেতাজী সেকথা শুনে বললেন, তুমি এই মেয়েই বিয়ে করো, আমার মনে

হয় তুমি সুখী হবে। উনি থাকতে থাকতেই বিয়ে হয়ে গেল, ফুকাই-এর স্ত্রী নেতাজীর স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছিলেন।

ইমপিরিয়াল হোটেল থেকে আমরা চলে গেলাম জাপানের পার্লামেণ্ট বা ডায়েট। পার্লামেণ্ট ভবনের প্রশস্ত সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফুজিয়ারার সঙ্গে ছবি তুললাম আমরা। এই সিঁড়ির সামনে দাঁড়ানো নেতাজীর একটি সুপরিচিত ছবি আছে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অন্যান্য দেশের যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। এই ছবিটি অবশ্য দ্বিতীয়বার টোকিও আগমনের সময়। প্রথমবার নেতাজী এই বাড়িতে পদার্পণ করেন ১৬ই জুন, ১৯৪৩। ভিতরে বিশিষ্ট অতিথিদের গ্যালারিতে বসেছিলেন। সেদিনকার পার্লামেণ্ট অধিবেশনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রথম ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের অকুণ্ঠ সমর্থন। তারপরই উনিশে জুন নেতাজী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। তার দু'দিন পরেই জাপান রেডিও থেকে বক্তৃতা। তারপরই 'আমার দেশ ভারতবর্ষ' সম্পর্কে জনসভায় ভাষণ। এ সমস্ত প্রকাশ্য কর্মচঞ্চলতার শুরু ষোলই জুন পার্লামেণ্ট অধিবেশনের পর।

নেতাজী দ্বিতীয়বার এই জাপানী পার্লামেণ্টে এলেন '৪৩ সালের নভেম্বরে। এবার অবশ্য পার্লামেণ্ট অধিবেশন দেখতে নয়। এই বাড়ির অপর এক প্রশস্ত হল-এ বসেছিল বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন। এই সম্মেলনে নেতাজীর ভূমিকা সম্পর্কে অনেকের কাছে শুনেছি, লিখেছেনও কেউ কেউ। জেনারেল আরিস্যুয়ে ছিলেন শ্রোতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে। বার্মার প্রধানমন্ত্রী বা ম বর্ণনা করেছেন এই সম্মেলন। তবে কাকিৎসুবোর কাছে শোনা কাহিনীই আমার সব চাইতে জীবন্ত মনে হত। নেতাজী যে তিনবার টোকিওতে এসেছেন প্রত্যেকবারই ওঁর দোভাষীর কাজ এবং জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষাকারী বা লায়াজঁ অফিসারের কাজ করেছেন কাকিৎসুবো।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো শেষ করে কাকিৎসুবো যোগ দিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে। ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতায় কনসাল। না, তখন

ওঁর নেতাজীর সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি। হবেই বা কী করে। নেতাজী প্রথমে ছিলেন ইউরোপে, তারপর দেশে ফেরামাত্র গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তবে অন্যান্য অনেক ভারতীয় জাতীয় নেতাকে উনি দেখেছিলেন। কাজকর্মে প্রায়ই দিল্লী যেতে হত। দেখেছেন আবছুল গফফর খান, সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, এমন কি মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকত আলিকেও। ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার দেখে কাকিৎসুবো মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ করতেন। এদিকে তো মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসে মনোমালিন্য লেগেই আছে। অথচ একবার সিমলাতে ভুলাভাই দেশাই ও জিন্নাকে খুব বন্ধুভাবে গল্পসল্প করতে দেখে কাকিৎসুবো অবাক। ভাবলেন ভারতীয়দের রাজনৈতিক ঝগড়া তা হলে খুব গভীরে যায় না। ওঁর সঙ্গে ভুলাভাই দেশাই-এর দৈবক্রমে বেশ আলাপ হয়েছিল। একবার দিল্লীর ইমপিরিয়াল হোটেলে একই সময় ছিলেন দু'জন। ভুলাভাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা করলেন, কাকিৎসুবোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

ভুলাভাই-এর সঙ্গে এই আলাপের কথা পরবর্তীকালে যখন ভেবেছেন, তখন মনে মনে বেশ আশ্চর্য হয়েছেন কাকিৎসুবো। তখন তো উনি জানতেন না, প্রায় দশ বছর পরে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের সময় ভুলাভাই দেশাই-এর থাকবে একটি বিশেষ ভূমিকা। ইসোদা, হাচিয়া আরো সব জাপানী অফিসাররাও তো বন্দী হয়ে এলেন লালকেল্লায়। কাকিৎসুবোরও তো সেখানেই স্থান হবার কথা। কিন্তু ব্রিটিশ গর্ভনমেণ্ট ওঁকে খুঁজে পায়নি। আত্মসমর্পণের সময় উনি ছিলেন সায়গনে তেরৌচির হেডকোয়ার্টার্সে। পরে উনি শুনেছেন, লালকেল্লায় বিচারের সময় ওঁকে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, ধরতে পারা যায়নি।

একবার মহাত্মা গান্ধীকে একটুর জন্য দেখা হয়নি কাকিৎসুবোর। সেটা সেই ১৯৩৭ সালের দিল্লীর কথা। কংগ্রেসের একটা মিটিং দেখতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী তখন দিল্লীতে, শুনেছিলেন সেই সভাতে উনিও আসবেন। অন্য নেতারা সব এলেন, জওহরলাল নেহরুও। আগে আগে ব্যাণ্ড বাজিয়ের দল, পিছনে সব নেতারা শোভাযাত্রা করে এলেন। কিন্তু গান্ধীজী কই?

কাকিৎসুবো মুচকি হেসে বললেন, তখন আমরা গুজব শুনেছিলাম, যে শামিয়ানার নীচে সভার আয়োজন হয়েছিল সে শামিয়ানার কাপড় বুঝি খদ্দরের ছিল না, তাই উনি শেষ পর্যন্ত এলেন না !

যাহোক, জাপানের পার্লামেণ্ট ভবনের এক হলে ১৯৪৩ সালের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর যখন বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন চলছিল, নেতাজীর পাশেই ছিলেন কাকিৎসুবো। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সব রথী-মহারথীরা উপস্থিত আছেন সেখানে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তো রয়েছেনই। আর এসেছেন ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট জোসে লরেল, বার্মার প্রধানমন্ত্রী বা ম, থাইল্যাণ্ডের প্রিন্স ওয়ান ওয়াইথায়াকন, চীনের নানকিং সরকারের প্রেসিডেণ্ট ওয়াং চিং-ওয়াই, মানচুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চ্যাং কেই কেই। নেতাজী এসেছেন অবজার্ভার হয়ে, কারণ ভারতবর্ষ এই বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া কো-প্রসপারিটি পরিধির বাইরে পড়ে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে নেতাজীই যেন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লেন সম্মেলনের। অপর সব দেশের নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমর্থন করে বক্তৃতা করলেন। বা ম বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না এলে এশিয়ার অন্যান্য দেশের পরাধীনতা ঘুচবার কোন আশা নেই।

ধন্যবাদ দিতে উঠে নেতাজী যে বক্তৃতা করলেন তাতে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। কাকিৎসুবো বলেন, 'ভাল করে দোভাষীর কাজ করতে পারছিলাম না। এত অভিভূত হয়েছিলাম, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। উনি বললেন, যে যুক্ত ইস্তাহার আজ এই সম্মেলন থেকে প্রচারিত হল তা একদিন এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির চার্টার অফ ফ্রিডম বলে গণ্য হবে। এক নতুন এশিয়ার স্রষ্টা বলে জাপানের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

সম্মেলনের শেষে তোজো ঘোষণা করলেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তর করে দিচ্ছেন জাপানের গভর্নমেণ্ট। আন্দামান ও নিকোবর ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন ভূখণ্ডে পরিণত হল।

জাপানের এই ডায়েট বা পার্লামেণ্ট ভবনের অদ্ভুত স্থাপত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হল, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য

এক দেশের সংসদ ভবনের সঙ্গে ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে ভারতবর্ষের ভাগ্য কী করে যেন জড়িয়ে গেছে।

এরপর আমরা এলাম হিবিয়া পার্কে। এশিয়া সম্মেলনের সময়ে হিবিয়া পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নেতাজীও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন এই সমাবেশে। আজও জাপানে অনেকে আছেন যাঁরা তেমন করে হয়ত নেতাজীকে চিনতেন না, কিন্তু বলেন, ওহো চন্দ্র বোসকে দেখেছিলাম হিবিয়া পার্কের মিটিং-এ।

পার্কের সংলগ্ন হিবিয়া হল। হিবিয়া হলে নেতাজী আর একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন। সেটা হল পরের বছর '৪৪ সালের নভেম্বরে। হিবিয়া হলে লোক উপচে পড়ছিল। জাপানের তখন অবস্থা ভাল নয়। এক বছর পরে এসে নেতাজী দেখছেন বোমায় বিধ্বস্ত টোকিও শহর। নেতাজীর বিমান এসে যখন নামল, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, তখনো এয়াররেড হয়ে গেল একটা। নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় তাই আশা ও উৎসাহের বাণী শোনালেন। শত্রুপক্ষ চাইছে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে, ওদের মনোবল ভেঙে দিতে। কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না। নেতাজী আরও বললেন, ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধারা ও জাপানের সেনাদল তাঁদের ভাগ্য একসূত্রে গেঁথেছেন। এখন ডুবলে একসঙ্গে ডুববো, আর ভাসলে একসঙ্গেই ভাসবো। উনি বলেছিলেন, 'সুইম অর সিংক টুগেদার'। তবে ওঁর দৃঢ় আশা ডুবে নিশ্চয় যাব না। কারণ ন্যায় ও সত্যের জয় অবশ্যই হবে।

কাকিৎসুবো বলেন, বক্তৃতার শেষে সেকি তুমুল করতালিধ্বনি। উপস্থিত শ্রোতারা বুঝতেই পারেননি তখন দু' ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। সভাপতি ওকুমা হাকুও উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ জানালেন। নেতাজী সে সময় কাকিৎসুবোকে বলেছিলেন, সমাবেশ যত বড় হয় ততই তিনি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সেবার একটা অপেক্ষাকৃত ছোট অথচ বিদগ্ধ সমাবেশেও উনি বক্তৃতা করেছিলেন। টোকিও ইউনিভার্সিটি আয়োজন করেছিল তার। এই বক্তৃতার অনুবাদ করতে করতে নেতাজীর বাগ্মিতায় আশ্চর্য হয়ে যেতেন

কাকিৎসুবো। ইম্পিরিয়াল হোটেল, ডায়েট ও হিবিয়া পার্ক পর্ব শেষ হল। আমরা যেন বেশ অনুভব করতে পারছিলাম নেতাজী টোকিওতে এলেন, কাজ শুরু হল, খুব শীঘ্রই তার সহযোগীদের মন জয় করে নিতে পারলেন। জাপানে প্রবেশের সময় নিরাপত্তার কারণে তাঁর একটা ছদ্মনাম ছিল মাৎসুদা। ইম্পিরিয়াল হোটেলের সেই বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনেই প্রথম তিনি বিশ্বের সংবাদ জগতে আবার আত্মপ্রকাশ করলেন। এ সবই হল গোড়ার দিককার কথা।

কিন্তু সেদিন লাঞ্চের পর আমাদের এমন একটা বৈঠক ছিল যাতে করে আমরা যেন হঠাৎ একেবারে যুদ্ধের মধ্যপর্বে নিক্ষিপ্ত হলাম, নিশ্চিন্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আমাদের এই সভা হল ইচিগাওয়া কাইকোশা বা ছোটখাট একটা আর্মি ক্লাবে। এখানে ইম্ফল যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ত্রিশ জন জাপানী অফিসার আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ইম্ফল যুদ্ধে যে সব জাপানী অফিসার গিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই ঘরে ফেরা হয়নি। তাই সামান্য যে ক'জন জীবিত আছেন এবং এখন টোকিওর কাছাকাছি আছেন, তাঁরা সব আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন শুনে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনা বোধ হল। আজাদ হিন্দ ফৌজও ছয় হাজার সৈনিক হারিয়েছিল। যুদ্ধে যারা মারা যায়নি তারা রিট্রিটের সময় মারা গেল অনেকে। ইম্ফল যুদ্ধের রিট্রিট-এর মত বিপর্যয়কর রিট্রিট মিলিটারি ইতিহাসে বেশী নেই।

আমরা আজও ঠিকমত স্বীকার করি আর নাই করি, ভারত-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইম্ফল যুদ্ধের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এখানকার যুদ্ধক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে জাপানের ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদল। এই প্রথম একটা বড় রকম মিলিটারি অপারেশন তারা একসঙ্গে করল এবং প্রথমে জয়ের গৌরব ও পরে পরাজয়ের গ্লানি ভাগ করে নিল।

ইচিগাওয়া কাইকোশাতে পৌঁছবার পর আমরা যখন সভাকক্ষে ঢুকলাম, সব অফিসাররা দাঁড়িয়ে উঠে অনেকক্ষণ একটানা তুমুল করতালিধ্বনি করলেন। কিন্তু সভা শান্ত ও স্তব্ধ হওয়া মাত্র আমার মনে হল, ঘরের

আবহাওয়া থমথমে ও ভারী হয়ে আছে। পরে আমি বুঝেছিলাম আমার অনুমান ঠিক। এদের সকলের মনে পড়ছিল অনেক দুঃখের স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী-সাথীদের কথা। কলকাতায় ফিরে এলে পর ওঁদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে ওঁরা লিখেছিলেন, 'আমাদের মন সেদিন আবেগে পূর্ণ ছিল, আমরা অভিভূত বোধ করছিলাম। আমরা তো তোমাদের ভাষা জানি না, তাই আমাদের মনের ভাব তোমাদের হয়ত বোঝাতে পারিনি।' যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ হারান তাঁদের তো সব শেষ হয়ে যায় কিন্তু যাঁরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন তাঁদের অভিজ্ঞতা হয় মর্মান্তিক।

সেদিন ফুজিয়ারা আমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ভার নিয়েছিলেন। ফুজিয়ারার মাধ্যমে জানতে চাইলাম, যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহাদুর গ্রুপের সৌকত মালিক ময়রাং-এ ভারতের তেরঙা পতাকা উড়িয়ে দিলেন, তখন এদের মধ্যে কেউ ছিলেন কিনা। মাৎসুকি উঠে দাঁড়ালেন, আমি ছিলাম। উনি ঠিক ময়রাং-এ না হলেও খুব কাছেই ছিলেন। বললেন, ইম্ফল অপারেশনের সময় আমি চূড়াচাঁদপুর পর্যন্ত এসেছিলাম আর সেখানে কিছুদিন ছিলাম।

ইম্ফল উপত্যকার এক ধরনের ভয়াবহ সৌন্দর্য আছে, চারপাশের পাহাড়ে গভীর জঙ্গল। কিছু মোরে-টামু, টেগনুপোল পাস-এর দুর্গম গিরি-কন্দর পার হয়ে শেষে সমতলভূমিতে ইম্ফলের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে কী করে হেরে গেলেন এঁরা? এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, সকলেই প্রায় তিনটি কারণ বলে। এক, এয়ার পাওয়ারের অভাব, একটিও এরোপ্লেন ছিল না ওঁদের! দুই, সাপ্লাই লাইন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, দিনের পর দিন এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে পুষ্টির অভাবে ভুগছিল সব। তিন, প্রকৃতি একেবারে বিরূপ হলেন। সেবার আগে আগে বর্ষা নামল। আর সে কী বর্ষা! সকলেই জানে ও-অঞ্চলে জুন থেকে সেপ্টেম্বর বৃষ্টির জন্য কিছু করা যায় না। গ্রামবাসীরা বলে, বনের বাঘও চলাচল করতে পারে না। সেই সঙ্গে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। জোঁকের উপদ্রবে সবাই অস্থির। আবার জোঁকের কামড় থেকে 'নাগা সোর' বা নাগা ক্ষত বলে এক ধরনের অসুখ

দেখা দিল। এ অসুখে শরীরে ফোস্কা পড়ে যেত চারদিকে। রিট্রিট করতে করতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধিতে ঢলে পড়তে লাগল সব।

জাপানী সৈনিকদের সহ্যশক্তি অসীম একথা সবাই জানে। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারাই বা কম কিসে? প্যালেলে ইয়ামামোটো ফোর্স বলে যে জাপানী সেনাদল ঘাঁটি গেড়েছিল তারা জমান কিয়ানির নেতৃত্বে আই এন এ ফার্স্ট ডিভিসনের সাহস ও সহ্যশক্তি দেখে চমৎকৃত। ফুজিয়ারা তো তিনমাসের ওপর নিজেই ছিলেন সেখানে। রাতের অন্ধকারে শুনতেন, 'দিল্লী চলো' ধ্বনি। কিন্তু ফুজিয়ারার সঙ্গে আর যে দু' জন জাপানী অফিসার ছিলেন মেজর কেমাওয়ারি ও মেজর ওগাওয়া তাঁরা মারা যান যুদ্ধে।

এত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও রিট্রিটের অর্ডার যখন এল আজাদ হিন্দ ফৌজও তা মানতে চাননি, জাপানীরাও নয়। মুতাগুচি তো ফিফটিনথ আর্মির অফিসারদের ডেকে বললেন, খাবার নেই, গোলাবারুদ নেই তো হয়েছে কি? গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে শুধু বেয়নেট ব্যবহার করতে হবে, বেয়নেট না থাকে খালি হাতে লড়তে হবে, হাত যদি না থাকে পা চালাতে হবে, লাথি তো মারতে পারবে—ঈশ্বর জাপানকে রক্ষা করবেন, জাপানের পরাজয় হতেই পারে না। ফুজিওয়ারার মনে হয়েছিল, মুতাগুচি এক সময় হারাকিরি করবার কথা চিন্তা করছিলেন।

ইম্ফল অফিসাররা আমাদের হাতে একটি জাপানী বই উপহার হিসেবে দিলেন। তার প্রথম পাতায় সার দিয়ে নাম সই করে দিলেন সবাই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কয়েক বছর অন্তর কোহিমা ও ইম্ফল আসেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শহীদের হাড়গোড় সংগ্রহ করতে। এটা এঁরা একটা পবিত্র, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে গণ্য করেন। মনে আছে প্রথম বছর যে দলটি এসেছিল তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফুজিয়ারা স্বয়ং। এরোপ্লেন থেকে সবাই নামলেন দমদমে, সকলের গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, সেটাই ওদের আচার। আমাদের সীমান্তে যেতে হলে বিদেশীদের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। আগে থেকে লেখালেখি করে সেই অনুমতি চেয়ে রাখা হয়েছিল। তবুও

আমাদের যেমন মাঝে-মধ্যে হয়ে থাকে, চট করে কোথায় লালফিতের জট পড়ে গেল একটা। যেদিন ভোরে ইম্ফলের প্লেন ধরতে হবে তার আগের রাত বারোটা নাগাদ খবর এল, অনুমতি পাওয়া যাবে না। বিদেশী অতিথি, তায় তাঁদের সেন্টিমেণ্টাল এই যাত্রা, মহা অপ্রস্তুত সকলে।

আমাদের এক বিদেশী বন্ধু বলেন গভর্নমেণ্টকে দিয়ে যদি কোন কাজ করতে চাও—তা সে যে দেশের গভর্নমেণ্ট হোক না কেন, খুব করে 'বদার' (bother) করো। সেই মত আমরা সারা রাত দিল্লীতে অনেককে উৎপাত করলাম। পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তখন দিল্লীতে। রাত ছটোর সময় ফোন করে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল। যতদুর মনে পড়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরও ঘুম ভাঙাতে হয়েছিল। নানাবিধ উৎপাতে অস্থির হয়ে আবার অনুমতি দিয়ে ফেললেন কর্তৃপক্ষ। পাছে আবার কোন অসুবিধা হয় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো থেকে কেউ কেউ সঙ্গে গিয়েছিলেন। ওঁদের কাছে শুনেছি উন্মুক্ত রণাঙ্গনে হাঁটু গেড়ে বসে ওঁরা মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা করলেন। তারপর জাপান থেকে আনা প্যাক-করা খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী সাজিয়ে মৃত আত্মাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন। তার মধ্যে জাপানের সম্রাটের পাঠানো সিগারেটও ছিল। সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মত।

ইম্ফল অফিসাররা আমাদের সঙ্গে ছবি তুললেন সকলে। ওঁদের 'গুডবাই' বলার সময় খুব কষ্ট হল আমাদের। পরদিন আমরা গিয়েছিলাম চিডোরিগাফুচি—কোহিমা ইম্ফল থেকে আনা অস্থি ও দেহাবশেষ এখানে রক্ষিত হয়। সাজানো বাগান, তার একদিকে প্যাভিলিওন। সেখানে ছোট, বড় নানা ফুলের সাজি নিহত সৈনিকের পরিজনরা রেখে গেছেন। তার মধ্যে মস্ত বড় ক্রিসেনথিমামের এক বাস্কেট চোখে পড়ল, তার গায়ে কার্ড, তাতে লেখা আছে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর নাম। ফুলের ডালির পাশে আছে এক গ্লাস জল। এই ফুল ও জল প্রধানমন্ত্রী উৎসর্গ করে গেছেন সেদিন সকালেই।

॥ ৪ ॥

সকালে ফুজিয়ারা সারাদিনের প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দেবার সময় বললেন, আজকের লাঞ্চ হবে নাকামুরাইয়া রেস্তোরাঁতে। নাকামুরাইয়া! নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। চেনা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ফুজিয়ারা বললেন, তোমাদের প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সূত্রে নিশ্চয় শুনেছ এই নাম। যে জাপানী পরিবারে রাসবিহারী বসু বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা এই রেস্তোরাঁ। রাসবিহারী বসুর স্ত্রী ছিলেন এর মালিক এক সময়। আজকে এই রেস্তোরাঁর মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তবুও অতীতের সেই যোগাযোগের কথা মনে রেখে ওখানে একটা লাঞ্চ মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন রাসবিহারীর মেয়ে মিসেস তেতসুও হিগুচি॥

টোকিওর জনবহুল বিখ্যাত গিনজাতে এই রেস্তোরাঁ। অনেকবার এ পথ দিয়ে দ্রুত গতিতে মোটর গাড়িতে গিয়েছি ও এসেছি। আজ গাড়ি দূরে রেখে পায়ে হেঁটে এলাম। একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল গিন্‌জা লোক-জনে গিজগিজ করছে, ঠিক যেন মেলা বসে গিয়েছে। একেবারে বড় রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে মায়েরা বাচ্চা-কাচ্চার হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করতে করতে পথ চলেছেন। ফুটপাথে আর রাস্তায় উপচে-পড়া ভীড়ে ধাক্কা খেতে খেতে মনে হল ঠিক যেন পুজোর সময়ের রাসবিহারী অ্যাভেনিউ। কী ব্যাপার! সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিসেস নাগাসাকি, টোকিও ইউনির্ভাসিটির ইতিহাসের অধ্যাপিকা। মিসেস নাগাসাকি বুঝিয়ে দিলেন রবিবার গিন্‌জা শুধু পথচারীদের জন্য, সেদিন গাড়িতে করে এদিকে আসা নিষেধ। তাই লোকজন নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছে, পথের পাশে ছোট দোকানে কেনাকাটা করছে, বড় দোকানগুলোর কাঁচের শো-কেসে চোখ

মেলে দেখছে। দেখেশুনে মনে হল কলকাতায় বিশেষ কোন দিনে এরকম গাড়িবিহীন রাজপথ-এর নিয়ম করে দিলে কেমন হয়?

এই গিন্জার আর এক রূপ আমি দেখেছিলাম একদিন রাত্রে। কী মনে করে হঠাৎ সাবওয়েতে চড়ে একদিন গিন্জা স্টেশনে নেমেছিলাম। তারপর ওপরে উঠে এলাম। তখন আস্তে আস্তে দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে, জনবিরল হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। কোথায় কে কোন্ অদৃশ্য বোতাম টিপছে তা তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু দেখছি ধীরে ধীরে বড় বড় শো-কেসের শাটার নেমে আসছে যেন কোন ভৌতিক উপায়ে। সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল নির্জন রাস্তায় ফুটপাথের ওপর সাদা রুমাল বিছিয়ে বসে আছে এক বুড়ো। কাছে গিয়ে দেখি রুমালের পাশে দাঁড় করানো পিচবোর্ডে আঁকা মানুষের হস্ত-রেখা। লোকটি তা হলে গণৎকার, রাস্তায় বসে হাত দেখে। তার মুখের চামড়া কুঞ্চিত রেখাবহুল। একবার ইচ্ছে হল হাত মেলে ধরে বসে পড়ি ফুটপাথে কিন্তু অবধারিত ভাষা বিভ্রাটের কথা ভেবে আর এগোলাম না। তবুও একটি বিরাট, আধুনিক যান্ত্রিক শহরে নির্জন রাস্তায় ফুটপাথে বসে আছে বৃদ্ধ গণৎকার এ ছবিটা কেমন যেন মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেল।

নাকামুরাইয়াতে পৌঁছে দেখলাম খুবই ব্যস্ত জায়গা। লোকজনের আনাগোনা চলছে, প্রায় সব টেবিল ভর্তি। আমরা একপাশে কাউন্টারে উঁচু টুলে বসে ফলের রস খেতে খেতে আমাদের টেবিল সাজিয়ে ফেলল ওরা। ইতিমধ্যে মিসেস হিগুচি এসে গেছেন। ফুজিয়ারা পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিসেস হিগুচি ঈষৎ স্থূলকায়া, হাসিখুশি মহিলা। আমার হাতে দিলেন ওঁর উপহার। একটি সাদা সিল্কের স্কার্ফ। তাতে কোন বিখ্যাত জাপানী চিত্রকরের আঁকা নিসর্গচিত্র। মিসেস নাগাসাকি সেদিন আমার ইণ্টারপ্রেটার। আমি ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম মিসেস হিগুচির মেয়ে, অর্থাৎ রাসবিহারী বসুর নাতনী এসেছিলেন একবার কলকাতায় আমাদের কাছে। ওর ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়ে গেছে। বললাম, ওঁকে দেখে ওঁর যে বয়স হয়েছে এবং এত বড় ছেলে-মেয়ে আছে তা একবারে মনে হয় না। শুনে খুশি হলেন। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে গল্প করি,

ওঁর বাবার কথা আর নেতাজীর কথা জানতে চাই। কিন্তু জাপানে এই এক দুস্তর বাধা—ভাষা। আর একজনের মুখে অনুবাদ করে করে কত আর ভাবের আদানপ্রদান করা যায়। তবুও তিনি যথেষ্ট সজীব করে বর্ণনা করলেন দু'বার ওঁর নেতাজীকে দেখার ঘটনা। নেতাজী ওঁদের বাড়ীতে এসেছিলেন বাবাকে দেখতে। বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন। নেতাজী হাজার কাজের মধ্যেও সময় করে দেখতে এলেন। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মনও ভেঙে পড়ছিল। হাতাশার ভাব এসে গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে নেতাজী যখন এশিয়া সম্মেলনের জন্য টোকিও এলেন উনি রাসবিহারীকে অনেক আশা দিলেন। যুদ্ধে জয় হবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।

এক বছর পরে আবার এলেন নেতাজী। যুদ্ধের অবস্থা তখন অন্য রকম। রাসবিহারী বসুও প্রকৃতপক্ষে শেষ শয্যায়। দু'জনেই দেখা হতে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন। নেতাজী ওঁর হাত ধরে তখনো আশ্বস্ত করছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে আবার দেখা হবে। কিন্তু এ হল ১৯৪৪ সালের নভেম্বর। আর জানুয়ারী ১৯৪৫-এ রাসবিহারী বসু মারা গেলেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নেতাজী টেলিগ্রাম করলেন শোকবার্তা জানিয়ে। জাপানী অফিসারদের কাছে শুনেছি, ফিউনারেলের সব খরচ আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে বহন করতে চেয়েছিলেন নেতাজী।

রাসবিহারী বসু মারা যাবার কয়েক দিন আগে জেনারেল সেইজো আরিস্যুয়ে এসেছিলেন ওঁদের বাড়ীতে। উনি এসেছিলেন জাপান সম্রাটের পক্ষ থেকে ওঁকে এক বিশেষ সম্মান জানাতে। সম্রাট ওঁকে 'অর্ডার অব দি রাইজিং সান' উপাধি দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার কথা আমরা পরে আবার জেনারেল আরিস্যুয়ের নিজের মুখেও শুনেছি। আরিস্যুয়ে তাঁর কথা বেশীর ভাগ বলেছিলেন যেদিন টোকিওর জিওসাংকেই রেস্তোরাঁতে আমাদের ডিনার বৈঠক হয়েছিল। আরিস্যুয়ের নিজের দেশ হোকাইডো অঞ্চলের রান্না খাওয়া হচ্ছে সেদিন। বিরাট আস্ত কাঁকড়া বসিয়ে দিয়েছে নীচু টেবিলে। টেবিল ঘিরে মাটিতে কুশন-এ বসেছি সবাই। আরিস্যুয়ে কাঁকড়ার দাঁড়া কেটে কয়েকটি আমার

প্লেটে তুলে দিলেন। আমার হাতে চপস্টিক, প্লেটে কাঁকড়ার দাঁড়া, বসে আছি হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। অবস্থা বেশ কাহিল। ইয়াশিরোর স্ত্রী সেইকো তাড়াতাড়ি ওঁর চপস্টিক দিয়ে টুকটুক করে দাঁড়ার খোলস ছাড়িয়ে মাংস বার করে দিলেন আমাকে। তা না হলে আর নিশ্চিন্ত মনে আরিস্থুয়ের বলা শোনা হত না আমার।

আরিস্থুয়ে বললেন, 'মৃত্যুপথযাত্রী রাসবিহারী বসুর হাতে সম্রাটের দেওয়া সম্মান আমি তুলে দিলাম। বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে শরীর, উঠবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। আমি যখন ওঁর গালে আমার নিজের গাল ঠেকালাম ওঁর চোখ দিয়ে নীরবে জল পড়তে লাগল। কথা বলতে পারেননি। আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই সব শেষ।'

'অর্ডার অব দি রাইজিং সান'—এই সম্মান সম্রাট হিরোহিতো নেতাজীকেও দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নেতাজী খুবই বিনীত-ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। উনি বলেছিলেন, আগে আমার দেশ স্বাধীন হোক।

রাসবিহারী ও নেতাজীকে নিয়ে আরিস্থুয়ে আরো গল্প বললেন। নেতাজী আসছেন ইউরোপ থেকে জাপানে, সব ব্যবস্থা তৈরী। আরিস্থুয়ে সে সময় একবার সোজা চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে। রাসবিহারী তখন সেখানে। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেনস লীগের কাজকর্ম দেখাশুনো করছেন রাসবিহারী। আরিস্থুয়ে দেখা করলেন ওঁর সঙ্গে। আরিস্থুয়ে আমাদের পরিষ্কার বললেন, 'দেখো, আমাদের খুব চিন্তা হল যদি দুই 'বোসে'-এ ঝগড়া লেগে যায়! নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়া তো আশ্চর্য কিছু নয়, সবই সম্ভব। আমি তাই স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলাম রাসবিহারীকে, সুভাষচন্দ্র বসু এলে পর কী হবে। এক মিনিটও দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ উনি জবাব দিলেন—যেদিন আসবেন সেদিন থেকে উনিই হবেন পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন-এর নেতা।' আরিস্থুয়ে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। এই রকম নিঃস্বার্থভাবে নেতৃত্ব হস্তান্তর ভাবা যায় না। অবশ্য ওঁর মন থেকে সন্দেহ তখনো একেবারে দূর হল বলা যায় না।

তারপর নেতাজী তো এসে পৌঁছলেন টোকিওতে। জেনারেল স্থগিয়ামা একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন নেতাজীকে। সেই লাঞ্চে রাসবিহারীও নিমন্ত্রিত। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল তানাবে আর আরিস্থয়ে নিজে। আরিস্থয়ে বললেন, 'এই যেমন আজ আমরা খাচ্ছি, ঠিক তেমনি সেদিনও নীচু টেবিলের চারপাশে বসেছিলাম আমরা। নেতাজীও পা-মুড়ে বসেছেন, সাবেক জাপানী প্রথায় খাওয়া-দাওয়া চলছিল। শুধু রেস্তোরাঁ ছিল ভিন্ন। তার নাম হাসিগীওকামারিও, খুব পুরনো দিনের জাপানী খাবার জায়গা।' নানান আলোচনা হল। স্থগিয়ামা বেশ ইংরেজি জানতেন। ইংরেজিতেই কথাবার্তা হল। আরিস্থয়ে আবার ইংরেজি তত জানেন না, উনি জানেন ফরাসী-ভাষা। যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার শেষে রাসবিহারী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছেন, নেতাজী তাড়াতাড়ি আগে উঠে পড়লেন আর প্রায় ছুটে গিয়ে রাসবিহারীর হাত ধরে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তারপর ওঁর কোটটা নিয়ে এসে সযত্নে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলেন।

এই সামান্য ঘটনা আরিস্থয়ে আজও মনে রেখেছেন, কারণ উনি আশ্চর্য ও অভিভূত হয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আরিস্থয়ে বুঝতে পেরে-ছিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই। কোন আশংকা নেই এঁদের মনোমালিন্য হবার। মৌখিক বা লিখিত কোন আশ্বাস নয়, পরম মমতায় হাত ধরে সাহায্য করা আর কোট পরিয়ে দেওয়া দেখেই আরিস্থয়ে বুঝে গেলেন উনি মিথ্যেই ভেবে মরছিলেন।

জাপানী খাওয়া-দাওয়া চলে ঠিক যেন বিলম্বিত লয়ে সেতার বাজনার মত। জিওসাংকেই রেস্তোরাঁতে সেদিনও ঢিমেতালে আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ বক্তৃতা। খাদ্যদ্রব্য আসছে তো আসছেই, টেবিল ভরে গেল। বক্তৃতার ফাঁকে মাঝে মাঝে এক-একটা উপহার আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। আরিস্থয়ে দিলেন জাপানী ভাষায় লেখা ওঁর স্মৃতিকথা। বইটি উলটে-পালটে ছবিগুলো দেখলাম। একটাতে

মুসোলিনির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন আরিস্যুয়ে। এক সময়ে রোমের জাপানী দূতাবাসে মিলিটারি এটাচে ছিলেন উনি।

তারপর আরিস্যুয়ে এক সময় বার করলেন একটা সিল্কের কাপড়ে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। তার মধ্যে রয়েছে ওঁর এক মহামূল্যবান সম্পত্তি। জাপানে প্রায়ই দেখতাম, লোকজন কাপড়ের পুঁটুলিতে জিনিসপত্র নিয়ে ঘোরে। ঠিক যেমন আমাদের দেশেও দেখতে পাওয়া যায়। এটা বোধ হয় একটা ওরিয়েন্টাল অভ্যাস। ইউরোপে এ রকম দেখতে পাওয়া যায় না। তফাত হল, আমাদের দেশের পুঁটুলি অনেক সময় ম্লান ও বিবর্ণ। জাপানীদের ভারী সুন্দর ঝকঝকে সিল্কের কাপড়ে বাঁধা।

এমনি এক পুঁটুলি খুলে সাত রাজার ধন মাণিক বার করার ভঙ্গীতে আরিস্যুয়ে বার করলেন একটি রূপোর টি-পট। টি-পটের গায়ে খোদাই করা—To my friend Lieutenant-General Arisue—Subhas Chandra Bose—বন্ধুবর আরিস্যুয়েকে সুভাষচন্দ্র বসুর উপহার। একই সঙ্গে দিয়েছিলেন নাম সই করে এক ফটোগ্রাফ। এই দুটি জিনিস পরম সমাদরে রেখে দিয়েছেন উনি। কাউকে সহজে হাত দিতে দেন না এ-সবে, ইয়াশিরো বললেন। আজ সকলের হাতে হাতে একবার ঘুরল, তারপর আবার সিল্কের রুমালে বন্দী।

নেতাজী যেদিন প্রথম টোকিওতে পা দিলেন, সেদিনই বিকেলে ইমপিরিয়াল হোটেলে গিয়ে দেখা করেছিলেন আরিস্যুয়ে। কারণ উনি ছিলেন সে সময় চীফ অফ ইনফর্মেশন। ওঁর ওপর ভার ছিল নেতাজীর সঙ্গে আর্মি ও নেভির উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর ব্যবস্থা করা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করে দেওয়া। সুগিয়ামার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় আরিস্যুয়ে উপস্থিত ছিলেন। তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উনি নিজে ছিলেন না কিন্তু তখনি সুগিয়ামার কাছে শোনেন তোজো খুব অভিভূত হয়েছেন নেতাজীর ব্যক্তিত্বে। সে সব বহুদিনের কথা। কিন্তু আরিস্যুয়ে বললেন, এই রূপোর টি-পটের মতই উজ্জ্বল হয়ে আছে ওঁর মনে পঁয়ত্রিশ বছরেরও আগের সেই স্মৃতি। এখনো যেন স্পষ্ট চোখে ভাসে

হানেডা এয়ারপোর্টে নেতাজী ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে বলছেন, এবার টোকিওতে হল, পরের বার সম্ভাষণ হবে দিল্লীতে।

সেদিন নাকামুরাইয়াতে আমরা সাবেক জাপানী প্রথায় খেলাম না। বেশ ভাল ওয়েস্টার্ন লাঞ্চ খেলাম। লাঞ্চের পর মিসেস হিগুচি বললেন, এসো, তোমাদের জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। রেস্তোরাঁর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব সব শিল্প-নিদর্শন। কোথাও একটা সুদৃশ্য চীনেমাটির বৃহদাকার ফুলদানি, কোথাও দেওয়ালে চমৎকার সব পেইন্টিং। মিসেস হিগুচি বললেন, নাকামুরাইয়ার একটা নিজস্ব বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে। এটা শুধু একটা খাবার জায়গা কখনো ছিল না। এটা ছিল একটা সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা এখানে এককালে মিলিত হতেন। একদিকের দেওয়ালে দেখলাম এক অপূর্ব সুন্দর পোর্ট্রেট, একটি জাপানী মহিলার মুখ। মিসেস হিগুচি বললেন, এটা আমার মায়ের ছবি। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম রাসবিহারী বসুর স্ত্রীর প্রতিকৃতি। আজ আর নাকামুরাইয়ার ওপর ওঁদের পারিবারিক কোন স্বত্ব নেই, কিন্তু এই ছবিটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অতীত দিনের কথা।

ফুজিয়ারার সঙ্গে উনেও আর্ট মিউজিয়ামে দেখেছিলাম অপূর্ব সব জাপানী পেইন্টিং। একদিনে একসঙ্গে সব দেখা সম্ভব নয় তাই বেছে বেছে দেখতে হল। বেশী দেখেছিলাম প্রাচীন জাপানী চিত্রকলা। অন্য কাজের চাপে আর্টের চর্চা বেশী করা যায়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে নাকামুরাইয়াতে চোখে পড়ল কিছু সুন্দর জাপানী শিল্পের নমুনা।

মিসেস হিগুচি অল্পক্ষণের আলাপে তাঁর মধুর ব্যবহারে আমাদের হৃদয় জয় করে নিলেন। উনি কখনো আসেননি ভারতবর্ষে, যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর বাবা এত করলেন। আমাদের মনে হল, ওঁকে একবার নিশ্চয় নিয়ে আসা উচিত ভারতবর্ষে। উনি ভাইকেও হারান যুদ্ধের সময়। বাবার মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু এসব কথা অনেকদিন পর মনে পড়িয়ে দিয়ে কী জানি আমরা কষ্ট দিলাম হয়ত ওঁকে। আমাদের কাছে বিদায় চেয়ে উনি গিনজার ভীড়ে মিশে গেলেন।

॥ ৫ ॥

যত সব দুর্ধর্ষ জাপানী জেনারেল ও সুচতুর ডিপ্লোম্যাটদের নেতাজী নাকি এক সময় অনেক পড়িয়েছেন। সেই টোকিওতে প্রথমবার পা দিয়েই এই পড়ানোর কাজ শুরু করে দেন। বিষয় ভারতবর্ষের ইতিহাস। শুরু করতেন ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ থেকে এবং শেষ হতো মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে। নেতাজী অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহ বলতেন না, বলতেন স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। এতসব পড়াশুনোর কারণ হল, জাপানী অফিসাররা বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। অথচ পরস্পর সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন কখনোই দৃঢ় হতে পারে না। মাঝে মাঝেই দেখা যেত নেতাজী অনর্গল বলে চলেছেন, জাপানী অফিসাররা কেউ কেউ খাতা খুলে নোট নিচ্ছেন। পরে এঁরা নেতাজীকে বলেছিলেন ওঁদের সত্যি উপকার হয়েছিল, নেতাজীর কাছ থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন ওঁরা। আবিদ হাসান বলেন, উনিও অনেক কিছু লিখে রেখেছিলেন তখন। দুঃখ করে বলেছিলেন, যদি সেদিনকার সব নোট যত্ন করে রাখতাম, তাহলে এখন দিব্যি একখানা মডার্ন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির বই হয়ে যেত।

এদিকে ফুজিয়ারা ঠিক করে রেখেছেন, আমাদের একটু জাপানের ইতিহাস পড়িয়ে নেবেন। প্রথম দিকেই একদিন বললেন, চলো মেইজি মিউজিয়াম দেখবে। সম্রাট মেইজি সম্পর্কে জানলে বেশ জানা হয়ে যাবে আধুনিক জাপানের গোড়ার দিকের ইতিহাস। পড়তে হবে মনে করে শঙ্কিত হয়েছিলাম, মিউজিয়াম দেখে মুগ্ধ হলাম।

দূর থেকে চোখে পড়ল মিউজিয়ামের মস্ত বড় পাথরের প্রাসাদ। সামনে কৃত্রিম জলাশয়, ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে। মেইজি মিউজিয়াম

প্রকৃতপক্ষে চিত্রকলার গ্যালারি। ভিতরে মস্ত হলঘর, তার বড় বড় দেওয়াল জোড়া ক্যানভাস। বিভিন্ন খ্যাতনামা জাপানী চিত্রকরেরা সম্রাট মেইজির জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ চিত্রমালার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস ও চারুকলা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। আমাদের দেশে আর্টিস্টরা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে বড় একটা ছবি আঁকেন না। তা নয়ত আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চমকপ্রদ কত উপাখ্যান নিয়ে কত ছবি হতে পারত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন সোভিয়েট চিত্রকলায় এই ধরনের ইতিহাস-চিত্রে বক্তব্য বড় বেশী প্রকট হয়ে পড়ে, আর্ট চাপা পড়ে যায়। এই জাপানী ছবিতে দেখলাম বক্তব্য কোথাও আর্টকে ছাপিয়ে যায়নি। এদের হাতে যুদ্ধের ছবিও অপূর্ব নিসর্গ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন 'ফুশিমি ও টোবার যুদ্ধ' ছবিটি। অথবা ধরা যাক 'সম্রাট ধান রোপণ করা দেখছেন' এই ছবি—এখানে সম্রাট গৌণ, তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ছবির সামনের দিকে কৃষকদের ফিগারগুলি উপস্থাপনের ভঙ্গীতে ও পিছনে গাছপালার পটভূমিতে এক চমৎকার প্যাটার্ন ধরা পড়েছে।

সম্রাট মেইজি ১৮৬৭ সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজত্ব করেছিলেন প্রায় অর্ধ শতাব্দী। প্রাচীনপন্থী, ট্র্যাডিশনাল জাপানে তিনিই প্রথম আধুনিক সভ্যতার হাওয়া নিয়ে আসেন।

মেইজি মিউজিয়ামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত দেয়ালের ছবির দিকে চোখ রেখে হেঁটে গেলাম। আর আমার সামনে এক কীর্তিমান রাজপুরুষের জীবনকাহিনী ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল। কিয়োটোর রাজ-প্রাসাদে ৩রা নভেম্বর ওঁর জন্ম, সালটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৫২। আট বছর বয়সে যুবরাজ হিসেবে অভিষেক। আর বাবা সম্রাট কোমেইর মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে হাতে এল রাজ্যভার। কিয়োটোর রাজপ্রাসাদে অভিষেকের ছবি রয়েছে, আবার ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হলে পর সাবালকত্বপ্রাপ্তির বিশেষ অনুষ্ঠানের ছবিও রয়েছে। আর একটি ছবিতে দেখছি ইউরোপীর রাষ্ট্রদূতদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন কিশোর সম্রাট।

সতেরো বছর বয়স হতে মন্ত্রীকন্যা হারুকোর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এই মন্ত্রীকে বলা হচ্ছে মিনিস্টার অব দি লেফট। আর একজন মন্ত্রীকে অন্য ছবিতে দেখলাম তিনি মিনিস্টার অব দি রাইট। এই রাইট-লেফট ব্যাপারটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার হল না। যা হোক, লেফট মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর সম্রাট যেন দ্রুত আরো প্রগতিশীল হয়ে উঠলেন। বয়স তখন কুড়িও হয়নি, সম্রাট শাসন-ব্যবস্থায় প্রথম গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনলেন। ফিউডাল প্রথা লোপ করে দিয়ে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশকে কতকগুলি অঞ্চল বা প্রি-ফেকচার-এ ভাগ করে দিলেন।

বহির্বিশ্বর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সম্রাট আগ্রহী। রাজপুত্র ইয়াকুরার সঙ্গে এক দল প্রতিনিধি দিয়ে জাহাজে করে পাঠিয়ে দিলেন ইউরোপ আর আমেরিকায়। সম্রাটের বিশেষ দূত হিসেবে ইয়াকুরা এই দায়িত্ব নিলেন। জাপানে প্রথম রেললাইন পাতা হল মেইজি সম্রাটের উৎসাহে। টোকিও থেকে ইয়োকোহামা রেল লাইন চালু হল। সম্রাট উদ্বোধন করলেন, ট্রেনে চেপে গেলেন ইয়োকোহামা। রেল লাইন চালু করার মত যান্ত্রিক ও গদ্যময় একটা ব্যাপারকে চিত্রকর কোমারা যে কী অপূর্ব কাব্যিক পেইন্টিং-এ রূপান্তরিত করেছেন ছবিটি না দেখলে বোঝানো মুশকিল।

সম্রাটের নানাদিকে উৎসাহ, সবদিকে দৃষ্টি। ছবিতে দেখছি যুদ্ধের মহড়া দেখছেন। আর একটিতে নিজে দাঁড়িয়ে ইম্পিরিয়াল গার্ডদের মিলিটারি ট্রেইনিং দিচ্ছেন। পড়াশুনোতেও খুব নিষ্ঠা। মাস্টারমশাই নাগাসানে মোতোদা পড়াচ্ছেন সম্রাট ছাত্রকে, কুড়ি বছর ধরে জাপানী, চীনা ও সাধারণভাবে প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়িয়েছেন উনি।

রানী হারুকো পিছিয়ে নেই কোন কাজে। স্বামীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে উয়েনো মিউজিয়ামে, পরনে লাল সাদা ফুলকাটা কিমনো। রানী একাও অনেক অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। মেয়েদের ইস্কুল পরিদর্শন করছেন, সাল ১৮৭৫। অথবা সিল্ক ফ্যাক্টরি দেখতে এসেছেন, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী রাজমাতা এইশো। তবে রানী হারুকোর যে ছবিটি সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে তা হল রাজপ্রাসাদের বাগানে বিরহিণী রানী পায়চারি করছেন আর নীল

আকাশে উড়ে যাওয়া হংসবলাকার দিকে চেয়ে রচনা করছেন কবিতা। রানী হারুকো কবিতা লেখেন, হাজার ত্রিশেক জাপানী কবিতা লিখেছেন উনি, জানা গেল।

সম্রাট নানা রাজকার্যে ব্যস্ত। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারেল গ্রাণ্ট এসেছেন দেখা করতে। সম্রাট ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করছেন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে। নতুন কনস্টিটিউশন তৈরী হবে জাপানের, তার জন্য কনফারেন্স ডেকেছেন সম্রাট। নতুন শাসন-তন্ত্র প্রচলনের দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত কনস্টিটিউশন প্রধানমন্ত্রী কুরোদার হাতে তুলে দিলেন সম্রাট।

সম্রাটকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিলাম পাশ্চাত্ত্য ধরনে স্যুট পরা। রানীর কিন্তু ছিল কিমনো আর পিছনে দীর্ঘ বিনুনী। হঠাৎই ১৮৮৭ সালে রানীর 'হাসপাতালে রুগীদের পরিদর্শন' ছবিতে দেখছি কুইন ভিক্টোরিয়ার ধরনে গাউন পরা, চুলের স্টাইলও পাল্টে গেছে। এরপর থেকে রানী সর্বদা পাশ্চাত্ত্য পোশাক, মাথায় টুপিও পরেছেন নানারকম। আজকের জাপানে মেয়েরা সব স্কার্ট-ব্লাউজ পরে। পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরাটা তাহলে খুব একটা নতুন ব্যাপার নয়, মনে মনে ভাবলাম।

সম্রাট একদিকে যেমন খনিগর্ভে নামছেন খনি শ্রমিকদের অবস্থা দেখতে, অন্যদিকে তেমন রাজ দরবারে কবিসভা বসেছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বসে আছেন। রাজকবি টাকাসাকি এবং অন্যান্য কবিরা কবিতা পাঠ করছেন।

কিন্তু কবিতাই জীবনের সব নয়। যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথমে চীনের সঙ্গে। পরে রুশো-জাপান যুদ্ধ। মোমবাতির মৃদু আলোয় মিলিটারি ম্যাপের ওপর ঝুঁকে আছেন সম্রাট। হাসপাতালে আহত সৈনিকদের মধ্যে রানী। চীন-জাপান যুদ্ধের শেষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে টোকিওতে ইয়াসুকুনি শ্রাইন বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আত্মার প্রতি উৎসর্গীকৃত এই মন্দির। এরপর থেকে যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দেন তাঁদের সকলের আত্মা ঠাঁই পান পবিত্র এই মন্দিরে। ইয়াসুকুনি শ্রাইন পরে আমরা দেখতে

গেলাম। জাপানে ডায়েট বা পার্লামেন্টেরও প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট মেইজি।

রুশো-জাপান যুদ্ধের বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে। পোর্ট আর্থারের সারেনডার (১৯০৫)। জাপানী নৌবাহিনীর তখন জয়জয়কার। অ্যাড-মিরাল টোগোর ফ্ল্যাগশিপের ছবি রয়েছে। পোর্টসমাউথ-এ প্রেসিডেন্ট রুজভেলটের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

যুদ্ধের পর শান্তি। সম্রাট মেইজি ও রানী হারুকো ক্রিসেনথিমাম ফুলের প্রদর্শনীতে এসেছেন। সম্রাট চলেছেন টোকিও ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন-এ বক্তৃতা করতে।

অসাধারণ এই সম্রাটের জীবনদীপ নিভে গেল ১৯১২ সালের জুলাই মাসে। জাপানী শিল্পীর তুলি সর্বদা সংযত। একটি ছবি, রাজপ্রাসাদের বাইরে দলে দলে নরনারী জড়ো হয়েছে, প্রার্থনা করছে তারা। শেষ ছবি সম্রাটের মৃতদেহ-বাহী শকট চলে যাচ্ছে প্রাসাদের বাইরে, বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে।

মিউজিয়ামের বাইরে এসে আধুনিক টোকিও শহরের দিকে চেয়ে ধাতস্থ হতে সময় লাগল একটু। মনে মনে এক বিরাট যুগ পার হয়ে এলাম যেন।

এবার আমরা উয়েনো পার্ক-এ চলেছি শুনলাম। পার্ক শুনে আমি তো খোলামেলা জায়গা মনে করে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। মেইজি যুগের ঘোর ভাল করে কাটেনি। একটু খোলা জায়গায় বেড়ালে ভালই লাগবে। ভাষার ব্যবধানের জন্য মাঝে মাঝেই ঠিক কখন কী বলা হচ্ছে বুঝতে একটু অসুবিধা হত। মাঝে মাঝে একেবারে 'উলটা বুঝিলি রাম' গোছের ব্যাপারও হত। যেমন একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কলকাতায় অনেকেই তো উসুদাকে চেনেন। অশ্বিনী দত্তর ওপর কাজ করছিলেন। তাছাড়া জাপানী ভাষা শেখাতেন। উসুদা ও মিসেস উসুদা কলকাতায় আমাদের খুবই পরিচিত ছিলেন। উসুদার সঙ্গে দেখা হল টোকিওতে। এমনকি উনি একদিন আমাদের দোভাষীর কাজও করলেন। কিন্তু মিসেস উসুদার দেখা পাচ্ছিলাম না। ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞেস করাতে উনি যা বললেন তাতে বুঝলাম, ওঁর একটি বেবী হয়েছে সম্প্রতি, তাই উনি আসতে পারছেন না।

শুনে খুবই খুশি হয়ে মিঃ উস্মুদাকে কনগ্র্যাচুলেশনস বললাম। উনিও অমায়িক হাসলেন। কিছুক্ষণ পর অন্য কথার মধ্যে আবার মিসেস উস্মুদার কথা উঠতে 'ডিসেম্বর, ডিসেম্বর' কী যেন বললেন ওঁরা। আমি অবাক হয়ে বললাম, ও ডিসেম্বরে জন্মেছে বুঝি, তবে তো বেশ বড় হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সদ্যোজাত। এবারও সকলেই অমায়িক হাসি হাসলেন। তারপর দিনের শেষে তৃতীয় বার ঐ প্রসঙ্গ উঠলে পর আমি বুঝলাম যে মিসেস উস্মুদার সন্তান এখনো জন্মায়নি। সেটা ছিল নভেম্বর মাস, সামনের ডিসেম্বরে তার জন্মগ্রহণ করার কথা। এবার আমার অমায়িক হাসি হাসবার পালা।

গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়ালো, মস্ত বড় মিউজিয়াম। লেখা আছে, উয়েনো আর্ট মিউজিয়াম। এবার বুঝতে পারলাম ফুজিয়ারার প্ল্যানমত এখন জাপানী আর্ট নিয়ে পড়াশুনোর পালা। জাপানী আর্ট সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। জাপানী কালার প্রিন্ট-এর কথা জানি। যেসব প্রিন্ট ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ান আর্টিস্টদের প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে ইমপ্রেশনিস্টরা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই সূত্রে হোকুসাই বা উতমারোর ছবি মনে পড়ছিল। কিন্তু না, ফুজিয়ারা সেদিকে একেবারেই নিয়ে গেলেন না। উনি আমাদের মিউজিয়ামের সেই দিকে নিয়ে গেলেন, যেখানে রয়েছে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাচীন জাপানী চিত্রকলা। এতবড় মিউজিয়াম সব তো দেখা সম্ভব নয়, বাছতেই হল।

বেছেও যা রইল একসঙ্গে অত ছবির রস গ্রহণ একেবারেই সম্ভব নয়। হলের পর হল পার হয়ে যাচ্ছি, দেয়ালে বিরাট বড় ক্যানভাস, নয়ত সিল্কের স্ক্রোল। সাধারণ ভাবে জাপানী ছবির দু'একটি লক্ষণ চোখে পড়ে। এক হল শিল্পীর তুলিতে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সংযম। যেখানেই শিল্পকলায় ধর্মের প্রভাব থাকে, সেখানেই ছবি স্টাইলাইজড হয়ে ওঠে আর অনাড়ম্বর হয়ে যায়। জাপানী ছবিতে সবচাইতে মনকে টানে যা, তা হল ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'গ্রেস'। জাপানী ছবিতে একটা ফুল, একটি পাতা, উড়ে-

যাওয়া পাখি বা জলের নীচে মাছ সবকিছুই অসম্ভব 'গ্রেসফুল' হয়ে ওঠে। উয়েনো আর্ট মিউজিয়ামের ঘরের পর ঘর ঘুরতে ঘুরতে বুঝলাম, কেন জাপানীরা তাদের ঘরে একটি দেয়ালে একটিমাত্র ছবি টাঙিয়ে রাখে, কেনই বা সিল্কের স্ক্রোল বাক্সবন্দী করে রাখে আর মাঝে মাঝে বার করে তার সৌন্দর্য আস্বাদন করে। এদের ছবির আবেদন এমন যে, ভীড়ের মধ্যে গাদাগাদি করে দিলে উপলব্ধি যথার্থ হয় না! প্রত্যেকটা আলাদাভাবে দেখতে হয়। এ যেন একটা সুন্দর কবিতা, আজ একবার পড়লাম আবার কিছুদিন পর বইটা বার করে আর একবার পড়ব।

নেতাজী যেমন জাপানী জেনারেলদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়িয়েছিলেন, জাপানীরাও কিন্তু তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক নেতাজীকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। নেতাজী তখন হাসপাতাল, জাহাজের ইয়ার্ড, ইস্কুল, ইউনিভার্সিটি অনেক কিছু দেখেছেন। জাপানী চিত্রকলা দেখেছিলেন কিনা এ-খবর কোন বইপত্রে চোখে পড়েনি, আর কেন যেন এ বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসাও করা হয়নি। কিন্তু টোকিওতে আমাদের হাতে নানারকম ছবি, ডকুমেণ্ট অনেকে দিলেন, তার মধ্যে একটি ছবিতে দেখছি নেতাজী কোন চিত্রশালা পরিদর্শন করছেন। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে এই ছবি উয়েনো মিউজিয়ামেরই হবে।

একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, অন্যদিকে আধুনিক কম্পিউটার সভ্যতা—জাপানে এই দুই ধারা পাশাপাশি বয়ে চলেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিত্রকলা আমাদের যেমন মুগ্ধ করল, তেমনি তাক লেগে গেল জাপানী টেলিভিশনের কাজকর্ম দেখে।

জাপানের মস্ত বড় রেডিও টেলিভিশন সংস্থা হল নিপন হোসো কিওকাই অর্থাৎ জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা সংক্ষেপে এন. এইচ. কে. (N. H. K.)। এদের সঙ্গে আমাদের কলকাতায় থাকার সময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাই জাপান ভ্রমণের সময় যেন একটা দিন অন্তত ওদের জন্য আলাদা করে রাখা হয় এই অনুরোধ ছিল ওদের।

জাপান টেলিভিশন কিছুকাল আগে নেতাজীর ওপর একটি ডকুমেণ্টারি

ছবি তৈরী করে দেখিয়েছেন। সেই ছবি তৈরীর সূত্রেই ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। এই ধরনের কাজ ওরা কত নিষ্ঠা সহকারে করে তা দেখবার সুযোগ তখন হয়েছিল। আগে চিঠিপত্রে নানারকম আলোচনা প্রাথমিক স্তরে হল। তারপর একদল টেলিভিশন কর্মী কলকাতা ও দিল্লি ঘুরে গেলেন একটা রিকনয়টর ট্রিপ করতে অর্থাৎ সরেজমিনে সবকিছু দেখে ও বুঝে নিতে। তারপর এল ডিরেকটর, প্রোগ্রাম অফিসার, ফটোগ্রাফার সহ বিরাট দল। পরিচালক ইসোমুরা নাওনোরি জাপানে টি ভি ডিরেক্টর হিসাবে খ্যাতি-মান। ইনি সে সময় প্রধানত দিল্লীতে কাজ করেন। কলকাতার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সোস্থকে ইয়াসুমা।

এই জাপানী টেলিভিশন ছবির নাম "চলো দিল্লী"। কলকাতায় নেতাজী ভবনে কয়েকদিন ধরে শুটিং করলেন ইয়াসুমা। নেতাজী যে গাড়িতে কলকাতা থেকে গোমো গিয়েছিলেন দেশ থেকে অন্তর্ধানের সময়, মিউজিয়াম পিস হিসেবে সাজানো সেই গাড়ি আবার পথে নামিয়ে চালাতে হল ডকুমেণ্টারি ছবির প্রয়োজনে। "চলো দিল্লী" ছবি করার আগে এর পরিচালক, সহ-পরিচালক ও অন্যান্যরা অন্তত একবছর রিসার্চ করেছেন বিষয়টির ওপর। ছবিটিতে মোটামুটি তিনটি ভাগ আছে। প্রথম, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ভারতীয় আর্মির চল্লিশ হাজার সৈনিকের আত্মসমর্পণ। সেখানে ফুজিয়ারা ঘোষণা করলেন ওঁরা যুদ্ধবন্দী নন, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কাজ করতে পারেন। এরপর ফ্ল্যাশব্যাক, নেতাজীর ভারতীয় রাজনীতিতে কার্যকলাপ। সেই সূত্রে আসছেন গান্ধিজী ও নেহরু। নেতাজীর যুদ্ধের সময় বার্লিন চলে যাওয়া। সাবমেরিনে ইউরোপ থেকে এশিয়া। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ আন্দোলন সংগঠন। বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে '৪৪ সালের মার্চ এপ্রিল মে জুন—ইমফল যুদ্ধ। ছবির শেষ পর্ব খুবই ইন্টারেস্টিং। সেখানে দেখানো হয়েছে লালকেল্লায় বিচার। যুদ্ধের শেষে শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন অভিযুক্ত হয়েছেন, তাদের বিচার চলছে দিল্লীর লালকেল্লায়।

ডিরেক্টর খুব কায়দা করে সমস্ত ব্যাপারটা উপস্থাপিত করেছেন।

বিচারের দৃশ্যগুলি পুনরাভিনয় করা হয়েছে। ভুলাভাই দেশাই বা জওহরলাল নেহরুর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেতারা। অথচ শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন নিজেরাই নিজেদের ভূমিকায় রয়েছেন। যদিও ইউনিফর্ম পরেছেন, তবুও চেহারা নবীন করে দেবার কোন চেষ্টা করা হয়নি। কেন তোমরা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে—? এই অভিযোগের জবাবে তিনজন অফিসার আলাদাভাবে নিজেদের বক্তব্য বলে গেলেন। তারপর স্ক্রীনে দেখা গেল ডিরেক্টর হাততালি দিতে দিতে ওদের অভিনয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে কল্পনা ও বাস্তব, অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে দেওয়া হল। একেবারে শেষের দিকে একটি দৃশ্যে দিল্লীর লালকেল্লার সামনে নেতাজীর যে স্ট্যাচু আছে তার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টর ইসোমুরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেতাজীর সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে বলছেন। এই দৃশ্যটি নাকি জাপানী টি ভি দর্শকদের বিশেষ ভাল লেগেছে।

যেদিন জাপান টেলিভিশন তাদের জাতীয় নেটওয়ার্কে এই 'চলো দিল্লী' ছবি দেখালো সেদিন ফিল্ম শেষ হওয়া মাত্র টেলিভিশন আপিসে ক্রমাগত টেলিফোন বাজতে লাগল। অসংখ্য দর্শক ছবির জন্য টেলিফোনে অভিনন্দন জানালেন। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শত শত চিঠি স্তূপাকৃত হয়ে উঠল টেবিলে। একটা সিরিয়াস প্রোগ্রামের জন্য এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ওরা আগে কখনো পাননি। জনপ্রিয় কোন প্রোগ্রামের জন্যও যে ধরনের চিঠিপত্র পান, এই প্রোগ্রামের জন্য যেসব চিঠিপত্র এল তা একেবারে ভিন্ন সুরের।

টেলিভিশন বন্ধুরা আমাদের জন্য একটা ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। ওঁদের আপিস থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলে পার্ক এভেনিউ, তার উপর রেস্তোরাঁ, নাম 'পার্কো'। একই ফ্লোরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রান্নার জন্য বিভিন্ন রেস্তোরাঁ। আমরা জাপানী রেস্তোরাঁতে গেলাম। নাম লেখা 'ইনাগিকু টেম্‌পুরা'। মাটিতে পা মুড়ে বসতে হল না। কাউন্টারের ধারে উঁচু উঁচু টুল। তাতে বসলাম। সামনে দাঁড়িয়ে রান্না

করে দিচ্ছে পাচকমশাই। এটা ওটা ভেজে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। টুলে বসে খেলে কি হবে, বাকী সবই জাপানী প্রথা মত। একটার পর একটা পদ তৈরী হচ্ছে আর খাওয়া হচ্ছে। অয়েস্টার এল, কাঁকড়া এল, ঈলমাছ, কাটুল মাছ, ছোট ছোট ভাতের ডেলা সমুদ্রের তলার লতাগুল্ম দিয়ে পেঁচিয়ে দেওয়া আর লালচে করে ভাজা চিংড়ি মাছ আসছে তো আসছেই।

খেতে খেতে 'চলো দিল্লীর' সাফল্য সম্পর্কে অনেক কথা হল। চিঠিপত্র শেষ পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক এসেছিল। এইসব চিঠিপত্রের বক্তব্য ফুজিয়ারার কাছেও শুনেছি। বেশ আশ্চর্য হবার মত কথাবার্তা ছিল তাতে। সাধারণত একটা ধারণা আছে, জাপানীরা তাদের যুদ্ধের সময়ের দিনগুলির কথা আর মনে করতে চায় না। তা তো ঠিক নয়। অনেকে লিখল সেসব দিনের 'পয়েগ্ন্যান্ট মেমরি' তাদের মনে পড়েছে, মনে পড়ে খারাপ লেগেছে একথা কেউ বলেনি। টোকিওর এক গৃহিণী লিখেছিলেন—আমাদের বলা হয় যেন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে খুব খারাপ কাজ করেছিল। এ যুদ্ধ হল আগ্রাসী যুদ্ধ। কিন্তু সত্যি ঘটনা তো তা নয়। ইতিহাস বলছে জাপান যুদ্ধ না করলে ভারতবর্ষ সহ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি আসত না। এই কথা মনে করলে আমাদের জাতীয় গৌরব ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে বই কমবে না।

আর একটা ধারণা আছে যে, জাপান ইমফল যুদ্ধে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। নেতাজী যুদ্ধকে ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরকম একটা অনিশ্চিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার জাপানী সৈনিক সম্পূর্ণ অকারণে প্রাণ হারালো। এই বিষয়ে জাপানী টি ভি দর্শকরা যে মতামত দিয়েছেন তা বেশ কৌতূহলজনক। একজন লিখেছেন, একসময় ভাবতাম ইমফল যুদ্ধ অযৌক্তিক আর অর্থহীন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে জাপানের মত ছোট্ট একটি দেশ ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে পেরেছিল, একথা ভাবলে ইমফল যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আত্মা নিশ্চয় পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

এক বৃদ্ধা, তাঁর বয়স একাশি বছর, একখানা মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন 'চলো দিল্লী' দেখবার পর। উনি লিখলেন—

"Many people have told me that the death of my son was useless and meaningless, and that he died for no worthy cause. I have cursed what I believed was the recklessness of the Imphal campaign. When I viewed NHK's programme, I realized that my son did not die in vain and it relieved my troubled mind."

এই বৃদ্ধার ছেলে ইমফল যুদ্ধে মারা গেলে পর অনেকেই ওঁকে বলেছিল, তোমার ছেলে কোন সুযোগ্য বা মহৎ কাজে প্রাণ দেয়নি, ওর মৃত্যু হয়েছে নিরর্থক! কিন্তু টিভিতে 'চলো দিল্লী' দেখে উনি উপলব্ধি করেছেন—"আমার ছেলের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি আর তাই আমার অশান্ত মন আজ শান্ত হয়েছে।"

যাঁরা এই ছবি তৈরী করেছেন তাঁদের কাছে এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

॥ ৬ ॥

জাপানী টেলিভিশনের বিরাট ত্রিশতলা বাড়ীর একতলায় যখন এসে পৌঁছলাম, আমাদের অভ্যর্থনা করলেন পুরোন বন্ধু ইয়াসুমা আর জাপান রেডিওর এশিয়া ডিভিশনের আকিরা ইনাহারার সঙ্গে এর আগেই আমাদের আলাপ হয়েছিল। উনি একজন জাপানী সাহিত্যিক, আবার হিন্দি জানেন বেশ ভাল। ইয়াসুমা নেতাজী ভবনে শুটিং করার সময় যেমন দেখেছিলাম, তেমনি আছেন হাসিখুসি চটপটে আর স্মার্ট। ইয়াসুমার সঙ্গে টেলিভিশনের আরো একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন, নানান জাপানী নামের ভীড়ে তার নামটা মন থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ আমাদের ডিনারের সময় উনিই তদারক করেছেন। আবার ওঁরই উৎসাহে আমরা একদিন এন এইচ কে

কনসার্ট দেখতে ও শুনতে নিমন্ত্রিত হলাম। —ওঁদের ঐ ত্রিশতলা বাড়ীর উল্টোদিকে এক বিরাট অডিটোরিয়াম তৈরী হয়েছে। জাপান টেলিভিশনের নিজস্ব অডিটোরিয়াম। যেদিন কনসার্ট-এ গেলাম, দেখলাম একসঙ্গে চার হাজার দর্শক বা শ্রোতা বসতে পারেন। কনসার্টবাজিয়েরা মেয়ে-পুরুষ সকলে জাপানী। কিন্তু কনডাকটর হলেন একজন জার্মান মিউজিশিয়ান।

প্রথমে আমরা রেডিও ডিভিশনে গেলাম। যেখানে আছেন হানেডা। চমৎকার বাংলা বলতে-কইতে পারেন আর লিখতেও পারেন। হাতের লেখা দেখে রীতিমত ঈর্ষা হল। হানেডা নিয়ে গেলেন সবচাইতে ওপরতলায় যেখানে ক্যানটিন। জানলার ধারে বসে ফলের রস খেতে খেতে নীচে টোকিও শহরের শোভা দেখা হল। ইতিমধ্যে হানেডা নিয়ে এলেন এক শাড়ি পরা ভারতীয় মহিলাকে। আলাপ হতে দেখি একেবারে কলকাতার মেয়ে। জাপান রেডিওর বাংলা বিভাগে যুক্ত আছেন।—এরপর স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে আমাদের ছুটো ইন্টারভিউ রেকর্ড করা হল। ডাঃ বসুকে প্রধানত নেতাজী সম্পর্কেই নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হল। আমার কিন্তু মূল বিষয় হয়ে গেল জাপানের মেয়েরা।

ক'দিন টোকিওতে থাকতে থাকতে আমি জাপানী মেয়েদের সম্পর্কে একটা থিসিস মনে মনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম। সুযোগ বুঝে তার সদ্ব্যবহার করলাম। বললাম জাপানী মেয়েদের আমার খুব ভাল লেগেছে। কারণ ওদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের ফলে এক চমৎকার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। ওঁরা তো ইউরোপের পোশাক, শিক্ষা-দীক্ষা সবই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারই সঙ্গে প্রাচ্যের নম্রতা ও বিনয় ওঁদের মধ্যে রয়ে গেছে। যেন ছুই জগতের যা কিছু ভাল সবই ওঁরা গ্রহণ করে বসে আছেন।

আমাদের সঙ্গে প্রায়ই ঘুরতেন অধ্যাপিকা নোবুকো নাগাসাকি। টোকিও ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপিকা। কথা বলেন নরম, মৃছ গলায়, চালচলন স্নিগ্ধ শান্ত। চট করে বোঝাই যায় না নিজের বিষয়ে ওঁর

পাণ্ডিত্য অনেক। সাহিত্যিক ইয়াশিরোর স্ত্রী, ভারী সুন্দরী। কাজ করেন আপিসে, স্বামীর চাইতে ইংরেজী ভাল জানেন। কিন্তু হাবভাব দেখলে মনে হয় না ঘরসংসারের বাইরে পা ফেলেছেন।

টোকিও শহরে ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটি বলে এক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আধুনিক স্থাপত্য, নূতন ধরনের বাড়ী। এখানে ঠিক নিয়মিত ক্লাস হয় না, তবে রিসার্চের প্রোজেক্ট হয়। এখন যিনি এর ভার নিয়ে রয়েছেন তিনি এক ইংরেজ মহিলা। ঠিক ইংরেজ নন, স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। একদিন সেখানে কাজে যেতে হল। সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিসেস নাগা-সাকি। টেবিলের একপাশে সেই মহিলা, অন্যদিকে নাগাসাকি। চরিত্রের বৈপরিত্য বিশেষভাবে চোখে পড়ছিল। তার মানে এই নয় যে, মহিলা কিছু খারাপ। বেশ চমৎকার মহিলা। শুধু একজন প্রখর আর একজন স্নিগ্ধ।

অবশ্য জাপানী মেয়েরা কালে তাদের নম্রতা হারিয়ে উগ্র হয়ে যাবেন না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ওঁরা তো খুব বেশীদিন বাইরের জগতে আসেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী যখন মেয়েদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন, জাপানী জেনারেলদের দিক থেকে প্রবল আপত্তি হয়েছিল। ওঁরা তো রীতিমত শকড্। মেয়েরা যুদ্ধে যাবে! এমন অদ্ভুত কথা কে কবে শুনেছে। নেতাজীকে অনেক কষ্টে তাঁদের বোঝাতে হয়েছিল। নারীবাহিনীর কম্যানডার লক্ষ্মী সায়গল (স্বামীনাথন) বলেছেন, প্র্যাকটিসের জন্য গোলা-বারুদ দিতে জাপানী অফিসাররা খুবই আপত্তি করত। ওরা মনে করত আমাদের হাতে ওসব দেওয়া অপচয় করা। আবার নেতাজীকে দিয়ে বলাতে হল। তারপর ওরা হঠাৎ এসে উপস্থিত হত ট্রেইনিং-এর সময়। ধীরে ধীরে কিন্তু ওরা ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা মেনে নিতে বাধ্য হল।

যা হোক, রেডিও সাক্ষাৎকার হয়ে যাবার পর টেলিভিশন কর্মীরা আমাদের ওঁদের স্টুডিও দেখাতে নিয়ে চললেন। বিদায় জানাবার আগে জাপান রেডিওর বন্ধুরা আমাকে একটি ব্রোকেডের টেবিলঢাকা উপহার

দিলেন। ইয়াসুমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমাদের ক'টা টেলিভিশন স্টুডিও। ওঁরা বিনীতভাবে বললেন, খুব বেশী নেই। এই ফ্লোরে আছে মোটে ষোলোটা। সবচাইতে যেটা বড় তার মধ্যে ঢুকে মনে হল রবীন্দ্র সদনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেন। চারিদিকে যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে হঠাৎ কলকাতা টেলিভিশনের বন্ধুদের মুখ চোখে ভেসে উঠল—পঙ্কজ, শর্মিষ্ঠা আরো অন্যান্যরা। একটি স্টুডিওতে নিয়ে আমাদের একপাশে বসালো। সেখানে একটা নাটক চলছে তখন। একটি জাপানী গৃহের খাবার ঘরের সেট। খেতে বসে বাবা ও ছেলেতে কি নিয়ে যেন নাটকীয় সংঘাত বেঁধে উঠেছে। ছেলের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন, শুনলাম তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতা।

ইমফল অফিসাররা সেই ইচিগাওয়া কাইকোশার অনুষ্ঠানে আমাদের একটি জাপানী বই উপহার দিয়েছিলেন। ইয়াসুমা বললেন, হ্যাঁ, বইটি হল 'চলো দিল্লী'-র স্ক্রিপ্ট ও ছবি নিয়ে লেখা। ফিল্মের মত বইটিও জনপ্রিয় হয়েছে খুব, বেস্ট সেলার হয়েছে। এত বছর বাদেও নেতাজীর এই জনপ্রিয়তা দেখবার মত। অবশ্য এর জন্য জাপানী মানসিকতার পরিবর্তনও দায়ী। ঠিক যুদ্ধের পর কিছুদিন এরা নিজেদের প্রতি করুণা বা সেলফ্ পিটিতে আচ্ছন্ন ছিল। যেন সেই মেইজি যুগ থেকে জাপান শুধু একটার পর একটা ভুল যুদ্ধ করে চলেছে। এখন ওরা অনেক কিছু আবার সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে দেখতে পাচ্ছে। নিজেদের দেশপ্রেম ও জাতীয় গৌরবে লুপ্ত আস্থা আবার ফিরে পেয়েছে।

সেদিন বিদায় নেবার আগে কথায় কথার ইয়াসুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত বিরাট কর্মকাণ্ড আপনাদের, তা কর্মীসংখ্যা কত হবে? ইয়াসুমা সর্বদাই বিনীত। বললেন, বেশী নয়, কর্মী আমাদের মোটে ষোলো হাজার।

জাপান রেডিও-টেলিভিশনের এই বাড়ী অবশ্যই নূতন। এখানে নেতাজী কোনদিন আসেননি কিন্তু জাপান রেডিও থেকে অনেকবার বক্তৃতা করেছেন নেতাজী। জাপান রেডিও কর্মীরা তাই নিজেদের নেতাজীর

অন্তরঙ্গ বলে মনে করেন। এশিয়া ডিভিশনের ইনাহারা আমাদের হাতে এক অমূল্য উপহার তুলে দিলেন। টোকিও রেডিও থেকে নেতাজী যেসব বক্তৃতা করেছেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সেইসব টেপ।

১৯৪৩ সালের ২১শে জুন নেতাজী প্রথম টোকিও থেকে স্বদেশবাসীর উদ্দেশে বেতার বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে উনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্ হল ভারতবর্ষে। তাই ইংরেজ আমাদের কোনদিনই নিজে থেকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে না। হ্যাঁ, আপোস করার চেষ্টা মাঝে মাঝে করবে কিন্তু আমরা যেন সে ফাঁদে পা না দিই। ভারতবর্ষের ভিতরে এবং বাইরে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে!

আবার ২৪শে জুন বেতার বক্তৃতা দিতে এলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দেশবাসীকে সেকথা জানালেন নেতাজী। সেবার টোকিও ছেড়ে যাবার আগে জাপানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক বাণী রেকর্ড করে যান। তাতে নেতাজী বলেছিলেন—আমি যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র, তখন এশিয়ার ছোট্ট দেশ জাপান ইউরোপের মস্ত বড় দেশ রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে শুনেছিলাম। এ-খবর তখন ভারতবর্ষের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। তখন থেকে আমরা অ্যাডমিরাল টোগো বা জেনারেল নোগির নাম শুনে আসছি। আজ আপনারা আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনের সময় ১৯৪৩-এর নভেম্বরে নেতাজী আবার টোকিওতে এলেন। আবার এলেন রেডিও স্টেশনে। এবারের বক্তৃতায় ছিল আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের খবর আর চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার আহ্বান। উনি বলেছিলেন, এবারের সংগ্রামে আমাদের আছে নিজস্ব আর্মি আর আছে বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতা। মহাযুদ্ধ আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে তা যেন আমরা গ্রহণ করি।

জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের জন্য যেমন আমাদের একটি দিন আলাদা করে রাখা ছিল, তেমনি আর একটি দিন রাখা ছিল জাপানের পি.

ই. এন-এর জন্য। পি. ই. এন. বা 'পেন' ক্লাব লেখকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা। দেশ-বিদেশে এদের বিভিন্ন শাখা ছড়িয়ে আছে। টোকিওতে জাপানের 'পেন' ক্লাব খুবই কর্মচঞ্চল। জাপান যাচ্ছি শুনে কলকাতায় আমাদের 'পেন'-এর সভাপতি শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় বললেন, আমি যেন অবশ্য টোকিও 'পেন'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। দেখা গেল কলকাতা ও টোকিওতে বেশ কিছুকাল কোন আদান-প্রদান হয়নি, তাই এখন সেখানে কে সভাপতি, কে সেক্রেটারি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবুও অন্নদাশংকরবাবু কাউকে কাউকে চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন।

জাপানে আমাদের লেখক-বন্ধু ইয়াশিরো রয়েছেন। তাঁর কাছে 'পেন' সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখলাম। জবাবে এল এক টেলিগ্রাম—'ওয়েলকাম টু টোকিও'। টোকিও 'পেন' একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আর আমার সেই জাপানী-বাংলা দোভাষীর ভাষায় 'ভোজন' ছাড়া তো ওখানে মিটিং হয় না। সঙ্গে 'ভোজন'-এর ব্যবস্থাও আছে। লাঞ্চ-মিটিং হবে।

ফুজিয়ারা তো জাপানের ইতিহাস, জাপানের শিল্পকলা সম্বন্ধে পড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ধারণা হোক নিশ্চয় তাও চাইতেন। 'পেন'-এর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সে ব্যবস্থা আপনা থেকেই হয়ে গেল।

টোকিওতে আমরা ছিলাম ইন্টারন্যাশনেল হাউজ অব জাপানে। সেখানে বিভিন্ন দেশের স্কলার ও জ্ঞানীগুণী মানুষেরা রয়েছেন দেখতাম। ইন্টারন্যাশনেল হাউজের আছে অনেকগুলো কনফারেন্স রুম। রোজই দেখতাম সবগুলোতে কোন না কোন মিটিং চলছে। একটাতে হয়ত চেম্বার অব কমার্সের মিটিং, অন্যটাতে সমাজকল্যাণ কর্মীদের, আর একটাতে কোন মহিলা সংগঠন। 'পেন' তাদের মিটিং-এর জন্য এখানেই একটা কনফারেন্স রুম বুক করে রেখেছেন শুনলাম। এতে আমাদের সুবিধা হল বেশ।

টোকিও 'পেন'-এর পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করছিলেন জাপানী কবি রিকুটারো ফুকুদা। প্রথমে ইন্টারন্যাশনেল হাউজের সুন্দর বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হল অভ্যাগতদের সঙ্গে। ফুকুদা ছাড়া যাঁদের

কথা মনে পড়ছে, তার মধ্যে আছেন আর একজন কবি চিউকো ওনো। ওনো ওঁর নিজের এক মস্ত মোটা জাপানী কবিতার বই আমাকে উপহার দিলেন। আর একজন জাপানী পাবলিশিং সংস্থার চিফ এডিটর ছিলেন, নাম তাঁর কুরোমারু। সাহিত্যিক ইনাহারা ছিলেন, উনি তো রেডিও জাপানে আছেন, হিন্দি জানেন বেশ ভাল। বন্ধুবর ইয়াশিরো তো ছিলেনই। ইয়াশিরো হলেন শিশু সাহিত্যিক। ঝলমলে ছবিওয়ালা বই দিলেন কয়েকটা। কয়েকখানা বিশেষ করে দিলেন আমার বালক পুত্রের জন্য। জাপানীভাষা শিখে একদিন পড়ে নেবে এই আশা প্রকাশ করলেন।

সত্যি বলতে কি, বইগুলো হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি আর একটু হতাশ বোধ করছি, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। এমন সময় রিকুটারো ফুকুদা দিলেন একটি কবিতার সংকলনের ইংরেজীতে অনুবাদ। যাক, বাঁচা গেল। খুলে চোখে পড়ল রিকুটারো ফুকুদার কবিতা—নাম 'ইউরোপে গ্রীষ্মকাল'। ভূমধ্যসাগর পার হয়ে এসে কবি বসেছেন এক কাফেতে। চারদিকে এলপাই গাছ। কোকোকোলাতে চুমুক দিয়ে কবি দেখছেন সামনে ভেসে যাচ্ছে পালতোলা নৌকো। আর একটি কবিতা চোখে পড়ল ওকির লেখা—'রুটি ও গান'। আমি রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে গান লিখছি কিন্তু হায় যখন গান ছিঁড়ে ফেলি তখন হাতে থাকে শুধু রুটি।

ঘরের ভিতর বৈঠক শুরু হল। আমাকে কি বক্তৃতা করতে হবে, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ভাষা এক সমস্যা। ইনাহারার সঙ্গে হিন্দি বলা যায়। ফুকুদা চমৎকার ইংরেজী জানেন। বাকী সকলের দিকে চেয়ে শুধু হাসি বিনিময় করছি। আর ওঁরা তো ক্রমাগত নীচু হয়ে 'বাও' করে যাচ্ছেন। ঠিক আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা নয়, তবে কিছু তো বলতেই হবে, ফুকুদা বললেন। আমি বলব আর ফুকুদা অনুবাদ করবেন।

যে বিষয়ে আমাকে বলতে হল তা আমার খুবই প্রিয়। বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। ওঁরা বললেন, জাপানে দুটি ভারতীয় নাম ওঁদের একান্ত পরিচিত ও বিশেষ প্রিয়—ট্যাগোর ও চন্দ্র বোস। এঁরা দুজনেই কলকাতার মানুষ আর আমি এসেছি কলকাতা থেকে, তাই ওঁরা ওঁদের

বিষয়ে শুনবেন। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ করার পর যখন দেশে ফিরলেন, সেই একই জাহাজে আসছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সমুদ্রযাত্রা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে 'দেশনায়ক' লেখা পর্যন্ত যতটা পারলাম ওঁদের বললাম। মাঝে মাঝে প্রশ্নও হল। একজন কবি আর একজন দেশসেবক দু'জনের সম্পর্ক কেমন ছিল। দেশের অর্থনৈতিক প্ল্যানিং-এ দু'জনের উৎসাহের কথা জেনে ওঁরা আশ্চর্য হলেন। দেশ থেকে সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর কবির উদ্বেগের কথা ওঁরা শুনলেন। এও শুনলেন, কবিকে টেলিগ্রাম করা হল—সুভাষ যেখানেই থাকুক আপনার আশীর্বাদ যেন তাঁর উপর থাকে।

ইতিমধ্যে লাঞ্চ শুরু হল। পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন লাঞ্চ। লাঞ্চ খেতে খেতে জাপানী ভাষায় অন্যরাও কেউ কেউ বললেন। কবি ওনো লম্বা বক্তৃতা করে ফেললেন। টোকিও ও কলকাতার 'পেন'-এর মধ্যে আরো সম্প্রীতি গড়ে উঠুক এই কামনাও করলেন অনেকে।

লাঞ্চ শেষ হতে আমাকে চমকে দিয়ে ওঁরা বললেন, এবার গান শুনবেন, ট্যাগোরের গান। পরে দেখেছিলাম খাওয়াদাওয়ার শেষে প্রায়ই এঁরা গান করতে বলেন। নিজেরাও গান করেন। আমি গাইলে অন্যরাও গাইবেন বলাতে না করা গেল না। আমার গান শেষ হতেই কবি ওনো লাফিয়ে উঠে খুব ভাব দিয়ে এক জাপানী গান ধরলেন। অন্য সকলেই দেখলাম চোখ বুজে মাথা নাড়ছেন। গান শেষ হলে পর ফুকুদা বুঝিয়ে দিলেন এটা একটা খুব রোমান্টিক গান—'ভাঙা প্রাসাদের ওপর চাঁদ উঠেছে।'

লাঞ্চ শেষ হলে পর ওঁরা আমাদের নিয়ে চললেন ওঁদের 'পেন' অফিসে। আকাসাকা অঞ্চলে ওঁদের অফিসে গিয়ে বুঝলাম সত্যিই টোকিও 'পেন' ক্লাব খুবই কর্মচঞ্চল। অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত সেখানে। আবার মস্ত বড় টেবিল ঘিরে বসে আলাপ-আলোচনা হল। শিজু ওয়ামা চা নিয়ে এলেন। অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ছে। বয়স অল্প, অনেক উপন্যাস লিখেছেন। খুব নাকি পপুলার লেখক। অনেক বই সিনেমা হয়েছে। নাম হল রিয়ো হামাদা, এই ছদ্মনামে লেখেন শুনলাম।

'পেন' অফিসে আমাকে কিছু 'পেন' ম্যাগাজিন দেওয়া হল। এডিটর দেখলাম রিকুটারো ফুকুদা। তা ছাড়া আরো কিছু মোটা মোটা কিন্তু চমৎকার ছাপানো বই উপহার পেলাম। দেশে ফিরব কী করে এত বই নিয়ে একটু চিন্তা হল। বিদায় নেবার সময় কলকাতার সব 'পেন'-সদস্যদের অনেক প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন ওঁরা। কলকাতা ফিরে আমাদের এক 'পেন'-মিটিং-এ তাঁদের সম্ভাষণ পৌঁছে দিয়েছিলাম আমি। টোকিও পেন'-এর বর্তমান সভাপতি কেনজি টাকাহাসি পা ভেঙে শুয়ে আছেন হাসপাতালে। ওঁরা আমাকে বললেন, ওঁর আরোগ্য কামনা করে কয়েক লাইন লিখে দিতে। ওঁকে তাই চিঠি লিখে রেখে এলাম।

টোকিওতে এই দিনটি আমাদের রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। কারণ বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন মাদাম কোরা। এঁর কথাও কলকাতায় থাকতে শুনেছি অনেক। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগিণী ইনি। যতবার কবি এদেশে এসেছেন, ওঁর ইন্টারপ্রিটারের কাজ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। আর আজও তাই ভারতবর্ষকে মনে করেন আপন দেশ। ওঁর সঙ্গে এই মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন কাজুও আজুমা।

এই বৃদ্ধ জাপানী মহিলার সঙ্গে গল্প করে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে সন্ধ্যাটা কেটে গেল। এখনো উনি ভারতবর্ষ নিয়ে কতকগুলো প্রোজেক্ট-এ কাজ করছেন। যেমন বৃক্ষরোপণের একটা প্রোজেক্ট-এর কথা শুনে কৌতূহলী হলাম। গাছ কেটে ফেলায় বন্যা বেশী হচ্ছে, তাই হিমালয় অঞ্চলে কি একটা বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত সংগঠনে উনি সাহায্য করেছেন। আমি অবশ্য পুরোন দিনের গল্প শোনাতে বেশী আগ্রহী। মাদাম কোরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আর আমাদের টোকিওতে একটি ব্যস্ত অথচ বড় সুন্দর দিন শেষ হল।

॥ ৭ ॥

দেশের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে জাপানীরা তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। দেশের কাজে বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে যে মহৎ মৃত্যু বরণ করে, মৃত্যুর পর সে পরিণত হয় দেবতায় আর তার স্থান হয় তখন পবিত্র ইয়াসুকুনি মন্দিরে। ইয়াশুকুনি জাপানীদের জাতীয় স্মরণমন্দির। আমরাও একদিন যুদ্ধে মৃত বীরদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত হলাম।

প্রথমেই এক বিরাট তোরণ পার হয়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে হয়। দুটি বিরাট গোলাকৃতি স্তম্ভ দু' দিকে উঠে গিয়েছে আর সেই দুই স্তম্ভের উপর শয়ান আর একটি একই রকম বিশাল, গোলাকার স্তম্ভ। বেশ আশ্চর্য হলাম যখন শুনলাম ফুজিয়ারা বলছেন, এটি হল মন্দিরের প্রধান "তোরি"। জাপানী ভাষায় 'তোরি' হল আমাদের তোরণ বা গেট। পরে দেখেছিলাম সংস্কৃত বা বাংলা কথার সঙ্গে কোন কোন জাপানী কথার এই ধরনের মিল আরো আছে। জাপানে আমাদের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত অবতার সিং তো এই নিয়ে অনেক গবেষণা করে ফেলেছেন এবং আমাকে লম্বা লিস্টি শুনিয়েছিলেন এই রকম কথার। আমাদের বন্ধু ইয়াশিরো অনর্গল জাপানী ভাষায় কথা বলতে বলতে একটা কথা প্রায়ই ব্যবহার করছিলেন 'ছোট্টো-মোট্টো'। বেশ কয়েকবার শুনবার পর জানতে চাইলাম কথাটার মানে কী। ইয়াশিরো বললেন, ওর মানে 'লিটল'। আমরাও তো 'লিটল' বলতে 'ছোট্টো' বলি। যত দূর বুঝতে পারলাম ওদের ছোট্টোমোট্টো মানে হল 'জাস্ট এ লিটল' বা 'এই একটু'।

যা হোক, 'তোরি' পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। এই দৃশ্য ও তার আনুষঙ্গিক শব্দধ্বনি আমাদের খুবই পরিচিত মনে

হল। বেশ কিছু লোক একসঙ্গে জড়ো হয়েছে, হাতে তাদের রকমারি পতাকা, ফেস্টুন। সকলে মিলে উচ্চকণ্ঠে কিছু একটা বলছে। ভাষা না বুঝলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে এরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অনেকটা আমাদেরই ভঙ্গীতে—চলবে না, চলবে না—বলছে। কী চলবে না? আমি ফুজিয়ারার দিকে তাকালাম। ততক্ষণে বিক্ষোভকারীরা কেউ কেউ এগিয়ে এসে ফুজিয়ারার সঙ্গে কী সব আলোচনা করে চলেছেন। তখনি লক্ষ করলাম, বিক্ষোভকারীরা সকলেই বয়সে বেশ প্রবীণ। অনেকে ফুজিয়ারার সমবয়সী হবেন। শুনলাম আজকের বিক্ষোভে ফুজিয়ারারও যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু অতিথি পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকায় তা আর হয়ে ওঠেনি। ফুজিয়ারা বললেন, চলো ভিতরে গিয়ে বুঝিয়ে বলছি কেন এই বিক্ষোভ।

আরো একটা 'তোরি' পার হয়ে একটা হলের সামনে এলাম। বাইরের দরজায় দু'জন পুরোহিত আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। জুতো খুলে জাপানীদের ঘরে পরবার চটি পরে ভিতরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে বসা মাত্রই চীনেমাটির ছোট ছোট বাটি ভরে চা দিয়ে গেল। জাপানী চা পাতলা সবুজ রঙ আর বেশ তেতো, অন্তত আমার রুচির পক্ষে। এদিকে যেখানেই যাই বসতে না বসতেই চা নিয়ে আসে। আর দু' এক চুমুক খেয়ে একটু কমতেই আবার বাটি ভরে দিয়ে যায়। শুনলাম এই চা পান করা হজমের পক্ষে নাকি ভাল। জাপানী লাঞ্চ ও ডিনারের শেষেও এই চা অনেকবার খেলাম।

সাধারণত যে চা পান করছিলাম তা পাতলা। কিন্তু মন্দিরে বা প্রথাসিদ্ধ চা-পান অনুষ্ঠানে যে চা দেয় তা বেশ ঘন ও রঙ গাঢ় সবুজ। খেতে আর একটু বেশী তেতো। ফুজিয়ারা এক ফাঁকে চুপিচুপি শিখিয়ে দিলেন কেমন করে খেতে হবে এই চা। দুই হাতের তেলোতে বাটি ধরে আস্তে করে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ঠোঁটের কাছে নিয়ে সাড়ে তিন চুমুকে খেয়ে নিতে হবে চা। যথাসাধ্য হিসেব করে প্রথামত চা পান করতে চেষ্টা করতাম।

আমরা চা খেতে খেতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ঘরে এসে ঢুকলেন।

ক্ষীণকায় বৃদ্ধ, পরনে সাদা পোশাক, নীচের দিকে খয়েরী রঙ। উনি আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াসুকুনিতে স্বাগত জানালেন। আমরাও নীচু হয়ে অভিবাদন জানালাম। বাইরে কিসের বিক্ষোভ জানতে চেয়েছি শুনে উনি নিজেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। জাপানের জাতীয় জীবনে ইয়াসুকুনি জিনজা বা মন্দিরের আছে এক বিশেষ মর্যাদা। যেদিন থেকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা যে-কোন প্রতিনিধি এলে ইয়াসুকুনিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন এই হল নিয়ম। মেইজি সম্রাট ১৮৬৯ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, অবশ্য 'ইয়াসুকুনি' এই নাম সম্রাট দেন দশ বছর বাদে। 'ইয়াসুকুনি' মানে শান্তিপূর্ণ রাজত্ব। মেইজি সম্রাট বলেন, এই মন্দিরে যাঁদের বিদেহী আত্মা স্থান পেয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই জাপানের শান্তি ও সমৃদ্ধি।

এটা কোন সমাধিস্থান নয়। এখানে কারু দেহাবশেষ নেই, আছে শুধু ওরা যাকে বলছে বিদেহী আত্মা বা স্পিরিট। মেইজি যুগের গোড়া থেকে শুরু করে চীন-জাপান যুদ্ধ, রুশো-জাপান যুদ্ধ, দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ—এর সবেতেই যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের স্পিরিট সংরক্ষিত আছে এই মন্দিরে। আজ পর্যন্ত পঁচিশ লক্ষ আত্মা এই মন্দিরে দেবতার আসন লাভ করেছেন। এঁদের সকলের সম্বন্ধে সব রকম তথ্য এই মন্দিরে রাখা আছে। তাঁদের নাম-ধাম, কোন যুদ্ধক্ষেত্রে, কবে মারা গেলেন—সব তথ্য জানতে পারা যায়।

এদিকে যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ম্যাকআর্থার যখন ভার নিলেন, তিনি প্রথমেই ঠিক করলেন ইয়াসুকুনি জিনজা একেবারে বাতিল করে দেবেন। কারণ, জাপানীদের যে যুদ্ধস্পৃহা বা ওয়ার স্পিরিট আছে তা একেবারে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন উনি। এই যে যুদ্ধে মৃত দেশপ্রেমিকদের সম্মান জানানো, এর মধ্য দিয়ে ওদের যুদ্ধস্পৃহা জাগিয়ে রাখা হয়। পরে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলেন ম্যাকআর্থার। ওঁর মনে হল একেবারে তুলে দিলে জাপানীদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগবে এবং বলা যায় না, যদিও সে সময় ওরা পরাজিত, হতমান জাতি, তবুও প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। তাই উনি একেবার বাতিল করলেন না। কিন্তু

ইয়াসুকুনির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিলেন। ইয়াসুকুনি একটি সাধারণ মন্দির হয়ে গেল, জাতীয় মর্যাদা রইল না। এখন থেকে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের আর ইয়াসুকুনিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য না দিলে চলবে। প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য সরকারী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত, বা প্রাইভেট ভিজিট করতে পারবেন কিন্তু সরকারী পরিচয়ে যাবেন না।

ম্যাকআর্থার মনে করেছিলেন, এইভাবে ইয়াসুকুনি নিজে নিজে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। জাপানের সাধারণ মানুষ ইয়াসুকুনিতে যেমন আসতেন তেমনি আসতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রীও যখন যিনিই থাকুন ফুল ও জল নিয়ে ব্যক্তিগত ভিজিট করতে লাগলেন। রাজপরিবারের সকলেই মাঝে-মধ্যে ঘুরে যেতেন।

আজ বাইরে যাঁরা বিক্ষোভ করছেন তাঁরা হলেন ওয়ার ভেটেরান—যুদ্ধ-ফেরত প্রবীণ জাপানী অফিসারবৃন্দ। তাঁদের দাবি ইয়াসুকুনিকে তার আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে দিতে হবে, ফিরিয়ে দিতে হবে জাতীয় স্বীকৃতি। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করছে। সরকারে যাঁরা আছেন তাঁদেরও সহানুভূতি আছে এই আন্দোলনে।

ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ যখন জাপান সফরে আসেন, তখন নাকি ইয়াসুকুনিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নানা রকম নিয়মকানুনের বাধা লঙ্ঘন করে তার ব্যবস্থা করা যায়নি। সব রাষ্ট্র-প্রধানরা টোকিও এলেই ইয়াসুকুনিতে আসতেন এ কথা বলতে গিয়ে পুরোহিত বললেন, দাঁড়াও, তোমাদের দেখাব বলে একটা জিনিস ঠিক করে রেখেছি। দু'খানা পুরোন ভিজিটরস্ বুক বার করলেন উনি। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে নেতাজী এসেছিলেন টোকিওতে। আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে উনি বৃহত্তর এশিয়া সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। একটি খাতায় দেখলাম নেতাজীর সই। ইয়াসুকুনিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। নেতাজীর সইয়ের নীচে আবিদ হাসান, আনন্দমোহন সহায় ও অন্যান্য ভারতীয় সঙ্গীদের সই। অপর খাতাটি খুলতে বার হল আবার নেতাজীর সই। পরের বছর ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে নূতন প্রধানমন্ত্রী কয়সোর

সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন। তখনো প্রথা অনুযায়ী ইয়াসুকুনিতে এসেছেন। সেবার নেতাজীর পরে সই রয়েছে হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য সঙ্গীদের। পুরোহিত বললেন, তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যতবার টোকিও এসেছেন, ইয়াসুকুনিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন, দেখছো তো।

আমাদের সঙ্গে সেদিন ছিলেন ফুজিয়ারা ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপিকা নাগাসাকি ও ক্যাপ্টেন নিশিদা। নিশিদা জাপানের ফিফটিনথ্ আর্মিতে ছিলেন যুদ্ধের সময়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ইমফল রণাঙ্গনে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমাদের জাপান সফরের সময় সর্বদা উনি আমাদের নির্বাক্ সঙ্গী। নির্বাক্, কারণ ইংরেজী উনি একেবারে বলেন না, এমন কি 'ইয়েস', 'নো' পর্যন্ত নয়। তাই উনি নীরবে গাড়ি চালান, নীরবে ছবি তুলে চলেন। নিশিদা ভিজিটরস্ বই দুটি কার্পেটের ওপর নামিয়ে ক্যামেরা নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। নেতাজীর দুটি মূল্যবান সই সংগ্রহ হল নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালার জন্য।

ইতিমধ্যে অন্যান্য পুরোহিতরা কিসের যেন একটা তোড়জোড় করছিলেন। এবার আমাদের ডাক পড়ল। দেখলাম আমাদের নিয়ে যেন ছোটখাট একটা শোভাযাত্রার মত হতে চলেছে। একজন পুরোহিত মাথায় একটা হেলমেটের মত টুপি পরেছেন, তাঁর হাতে একটা দণ্ড। তিনি শোভাযাত্রার আগে আগে চললেন। আমাদের দলের মধ্যে ডাঃ বসুকে উনি ডেকে নিলেন ঠিক ওঁর পিছনে দাঁড়াতে এবং উনি যেমন বলবেন তেমন করতে বললেন। আমরা একে একে তাঁর পিছনে। টুপি-পরা পুরোহিতকে দেখেই আমার মনে পড়ে গেল নেতাজীর ঠিক এমনি ছবি দেখেছি। আগে টুপি মাথায় পুরোহিত, পিছনে নেতাজী ও অন্যান্যরা। সে ছবি যত দূর মনে পড়ল মেইজি জিংগু বা মেইজি মন্দিরে। তবে শোভাযাত্রায় চলতে চলতে আমার মনে হল, সে ছবি ইয়াসুকুনিতে হওয়াও বিচিত্র নয়।

দীর্ঘ, টানা কাঠের করিডর ধরে আমরা শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হলাম। প্রথমে যেখানে থামলাম, সেখানে একটি ছোট পাথরের চৌবাচ্চা। একটি প্রকাণ্ড বাঁশের হাতায় করে জল তুলে আমাদের হাতে ঢেলে দেওয়া

হল। জাপানের শাস্ত্রীয় মতে আমরা হস্ত প্রক্ষালন করলাম। আবার শোভাযাত্রা চলতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে আবার দাঁড়ালাম। এবার পুরোহিত আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। ওঁর হাতে এক বিরাট কারুকার্য-করা কাপড়ের পাখা। সেই পাখা দিয়ে আমাদের ধীরে ধীরে হাওয়া করলেন, কিছু মন্ত্রোচ্চারণও করলেন মনে হল। বুঝলাম আমরা এবার শুদ্ধ হলাম, আমাদের 'পিউরিফিকেশন' হল।

এরপর প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। এখানে মৃত বীরদের উদ্দেশ্যে একটা তর্পণের মত অনুষ্ঠান হল। পুরোহিত ডাঃ বসুকে ডেকে পাশে দাঁড় করালেন। বললেন, সকলের পক্ষ থেকে উনি তর্পণ করলেই হবে। আমরা মাঝে মাঝেই নীচু হয়ে 'বাও' করছিলাম। পুরোহিত ওঁর হাতে বেলপাতার মত দেখতে একটা পাতা দিলেন। আমি ফুজিয়ারাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম পাতাটার নাম 'সাকাকি'। পুরোহিতের নির্দেশমত গোড়ার দিকটা আগে করে ছ' হাতের মধ্যে পাতাটা উনি ধরলেন, তারপর সামনের বেদীতে সেটা অঞ্জলি দেওয়ার মত করে রাখলেন। পুরোহিত বললেন, এই সঙ্গে শহীদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়ে গেল এই পাতা এবং আমাদের শ্রদ্ধা। এবার পুরোহিত বললেন, ছ'বার হাততালি দাও। দেওয়া হল। তারপর ছ'বার মাথা নীচু করে অভিবাদন করো। করা হল। আমার মনে হচ্ছিল আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক কিছু তিনবার করা হয়, হয়ত তিনবার মন্ত্রোচ্চারণ করা হল কিন্তু এদের অনেক কিছু ছ'বার করা হয়। ছ'বার হাতে তালি দেওয়া, ছবার 'বাও' করা, ছ'বার ঘণ্টাধ্বনি করা ইত্যাদি। সেদিনের সব অনুষ্ঠানের শেষে একবার হাতে তালি দেওয়া হল।

এবার মিছিল আবার ফিরে চলল। মন্দিরের বাইরে, করিডরে একবার দাঁড়ালাম। আমাদের সকলের হাতে ধরিয়ে দিল ছোট ছোট সাদা পাথরের বাটি, চন্দনের বাটির মত দেখতে। বাটিতে রয়েছে 'সেক্রেড ওয়াইন'। আর ছিল গোল, চ্যাপটা সাদা রঙের জাপানী বাতাসা। এই ওয়াইন আর বাতাসা হল প্রসাদ। সাধারণত ইয়াসুকুনিতে প্রধান মন্দিরের আশেপাশে

ছবি তোলা নাকি নিষেধ। তবুও কি মনে করে বৃদ্ধ পুরোহিত আমাদের সঙ্গে একবার মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন আর ক্যাপ্টেন নিশিদা ছবি তুলে নিলেন।

ফিরে এসে পুরোহিতের ঘরে বসে আবার কথাবার্তা হল খানিক। যে পঁচিশ লক্ষ আত্মা এই মন্দিরে আছেন, তাঁদের মধ্যে কারা আছেন সে কথা শুনছিলাম। মেইজি যুগের রাজভক্তদের মধ্যে ইয়োশিদা, উমেদা প্রভৃতি আছেন, একটি ছ' মাসের শিশুর আত্মা কী এক বিশেষ কারণে স্থান পেয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওকিনাওয়ার রণাঙ্গনে যেসব ছাত্র নিহত হন, তাঁদেরও ঠাঁই হয়েছে পবিত্র ইয়াসুকুনিতে। অল্প দিন আগে জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো ইয়াসুকুনিতে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এ খবরটা পৃথিবীর সংবাদজগৎ থেকে জাপানীরা একটু গোপন রেখেছিল। একদা 'ওয়ার ক্রিমিনাল' তোজোর দেবতায় রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটা সব হয়ে যাবার পর এবং প্রধানমন্ত্রী ওহিরা এসে ফুল উৎসর্গ করে যাবার পর বাইরের পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করা হয়। শুনেছি এ নিয়ে দেশবিদেশে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরোহিতের কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম অনেক জাপানী পরিবার, মেয়ে, পুরুষ, শিশুর ভিড় বাইরের চত্বরে। এরা সব নিহত সৈনিকদের পরিবার। এরা মাঝে মাঝেই শ্রদ্ধা জানাতে আসে এই মন্দিরে। বছরে চারবার বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এখানে। নববর্ষে ১লা জানুয়ারিতে, জুলাই মাসে 'স্মরণ-দিবসে' আর এপ্রিলে বসন্তোৎসবে, তখন চেরীফুল ফুটে থাকে মন্দিরের চারপাশে। এ ছাড়া অক্টোবরে শরৎ-উৎসব। এই সব দিনে বহু মানুষ আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। অন্যান্য সময়ে টোকিও ও চারপাশ থেকে সর্বদাই শহীদদের পরিবারের আনাগোনা লেগে থাকে। সেদিন দেখলাম, একটি পরিবার এক মস্ত বড় ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ডের লেখা পড়ছে। বোর্ডে জাপানী ভাষায় কী সব লেখা। নিহত সৈনিকদের ডায়েরি বা চিঠিপত্র থেকে মাঝে মাঝেই লম্বা উদ্ধৃতি দেওয়া থাকে এই বোর্ডে, সবাই ভিড় করে পড়ে। লেখা পাল্টে দেওয়া হয়

মাঝে মাঝে। সেদিন একটি একুশ বছরের ছেলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তার মা'র কাছে বিদায় চেয়ে চিঠি লিখছে—এই ছিল বোর্ডের লেখা।

এরপর আমরা শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম মেইজি জিংগুতে। ইয়াসুকুনিতে আছেন লক্ষ লক্ষ দেবতা। এর আগে গিয়েছি 'চিডোরিগাফুচি'তে। সেখানে আছে অজ্ঞাত সৈনিকদের দেহাবশেষ। ইম্ফল থেকে, কোহিমা থেকে আজও ওঁরা সংগ্রহ করে নিয়ে যান ওঁদের নিহত সৈনিকদের অস্থি। 'চিডোরিগাফুচি'তে আমরা ফুল উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু মেইজি শ্রাইন হল শুধু সম্রাট মেইজির বিদেহী আত্মার বিশ্রাম ও পূজার জায়গা। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ কিয়োটোর কাছে ফুশিমি নামে জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁর স্পিরিট আছে মেইজি জিংগুতে।

মেইজি শ্রাইনে বিরাট বাগান। অনেকে দেখলাম বেড়াচ্ছেন। মন্দিরের দিকে চলেছি, আচমকা দেখা হয়ে গেল কলকাতার এক বিরাট দল, মেডিকেল কংগ্রেসে এসেছেন। ফুজিয়ারা, নিশিদা সব নেতাজীর সহযোগী শুনে ওঁরা ওঁদের সঙ্গে ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মন্দিরের অনুষ্ঠানে এবার আমাদের হয়ে যা কিছু করার ফুজিয়ারাই করে দিলেন। দেখলাম, উনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ধূপ জ্বেলে দিলেন, তারপর আবার দু'বার হাততালি, দু'বার 'বাও' করা এই সব হল। এই মেইজি জিংগুতে নেতাজী এসেছিলেন ১৯৪৩-এর নভেম্বরে। ঠিক কোন দিন মেইজি-মন্দিরে এসেছিলেন জানা যায়নি। ইয়াসুকুনিতে সই ও তারিখ দেখেছি, ভিজিটরস্ বইতে এখানে সেরকম কিছু দেখিনি। তবে মনে হয় নভেম্বরের তিন তারিখে এসে থাকতে পারেন। সেদিন হল মেইজি সম্রাটের জন্মদিন। দিনটি ওঁরা মেইজি কনস্টিটিউশন দিবস হিসেবে পালন করেন এখনো।

নেতাজীর সম্পর্কে সরকারী দলিলে জাপানীরা এক জায়গায় নভেম্বরের তিন তারিখের উল্লেখ করতে গিয়ে একটু কবিত্বময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। লিখছে—'তেসরা নভেম্বর মেইজি কনস্টিটিউশন দিবস। আজও যেমন এই সময়ে চন্দ্রমল্লিকা ফোটে আর তার সুগন্ধের প্রাচুর্যে ভরে দেয় চারদিক, যুদ্ধের



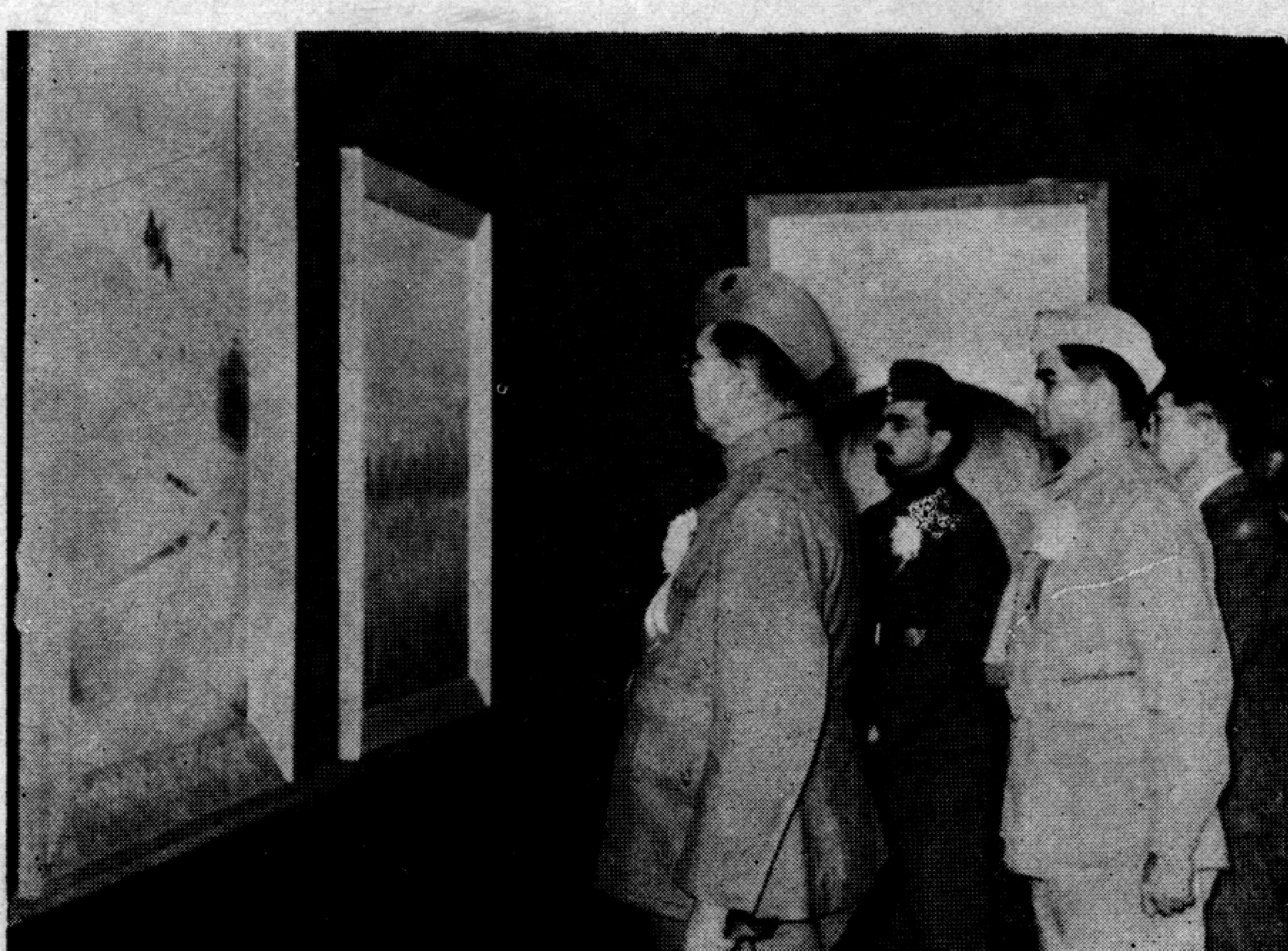
টোকিওতে নিপন টাইমস কাগজ পড়ছেন নেতাজী



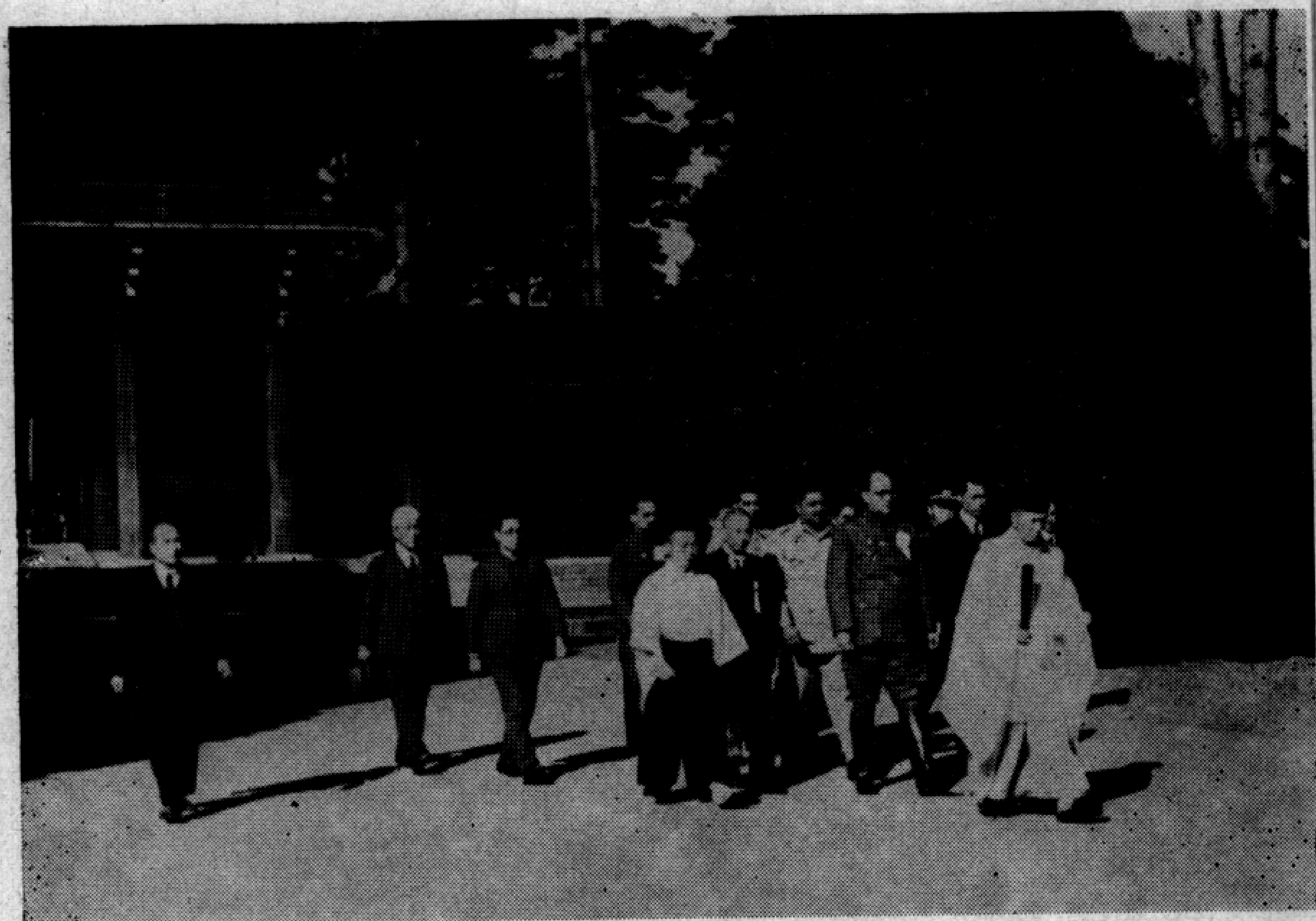
রাসবিহারী বসুর মেয়ের সঙ্গে নাকামুরাইয়া রেস্তোরাঁতে



টোকিওতে নেতাজী ও রাসবিহারী বসু



নেতাজী জাপানী চিত্রকলা দেখছেন



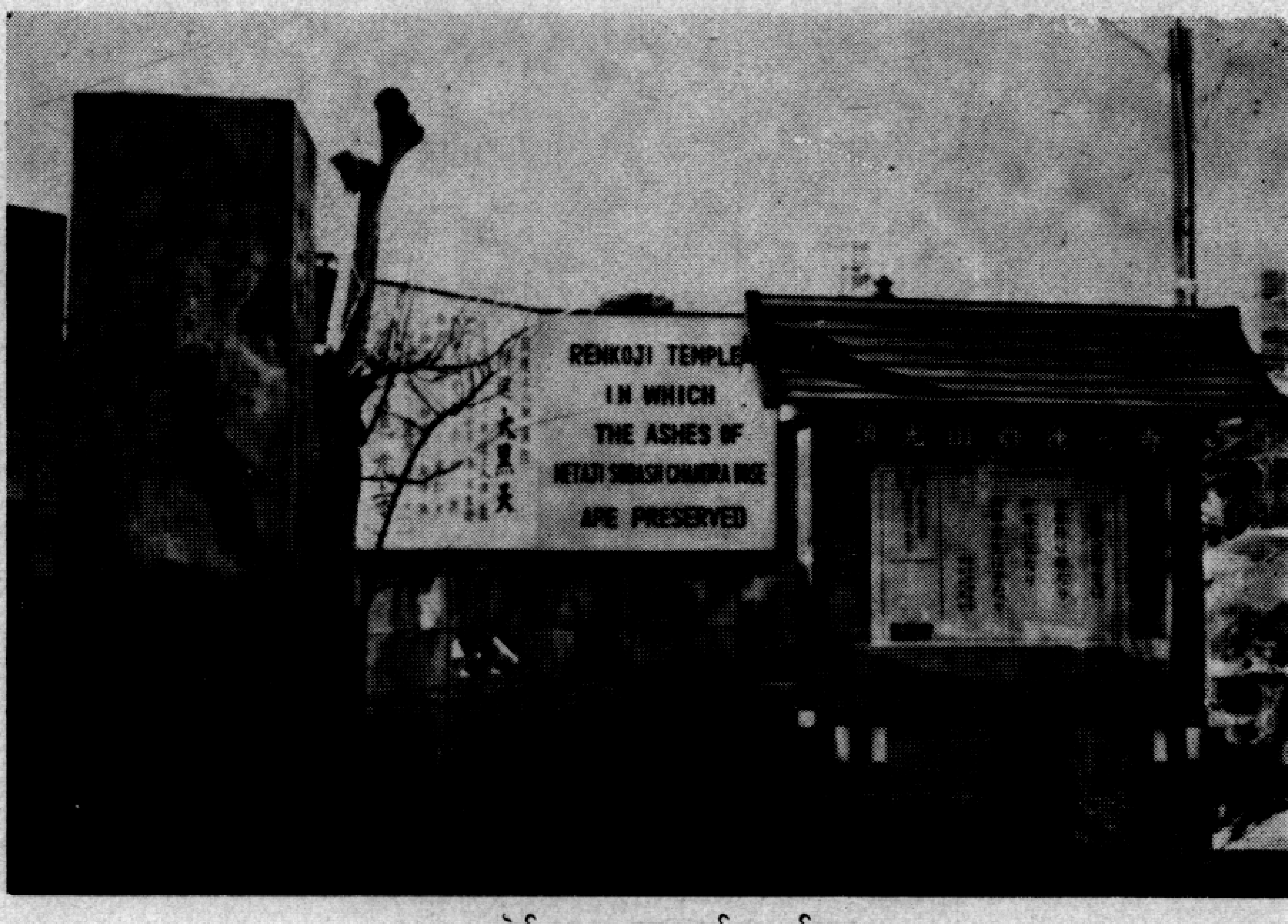
মেইজি মন্দিরে নেতাজী



শিব্‌সাওয়া পরিবারে থাকতে এলেন নেতাজী



আলোচনার টেবিলে তোজো ও নেতাজী, নেতাজীর পাশে দোভাষী কাকিংসুবো



টোকিওর রেনকোজি মন্দির



মিসেস তোজোর সঙ্গে



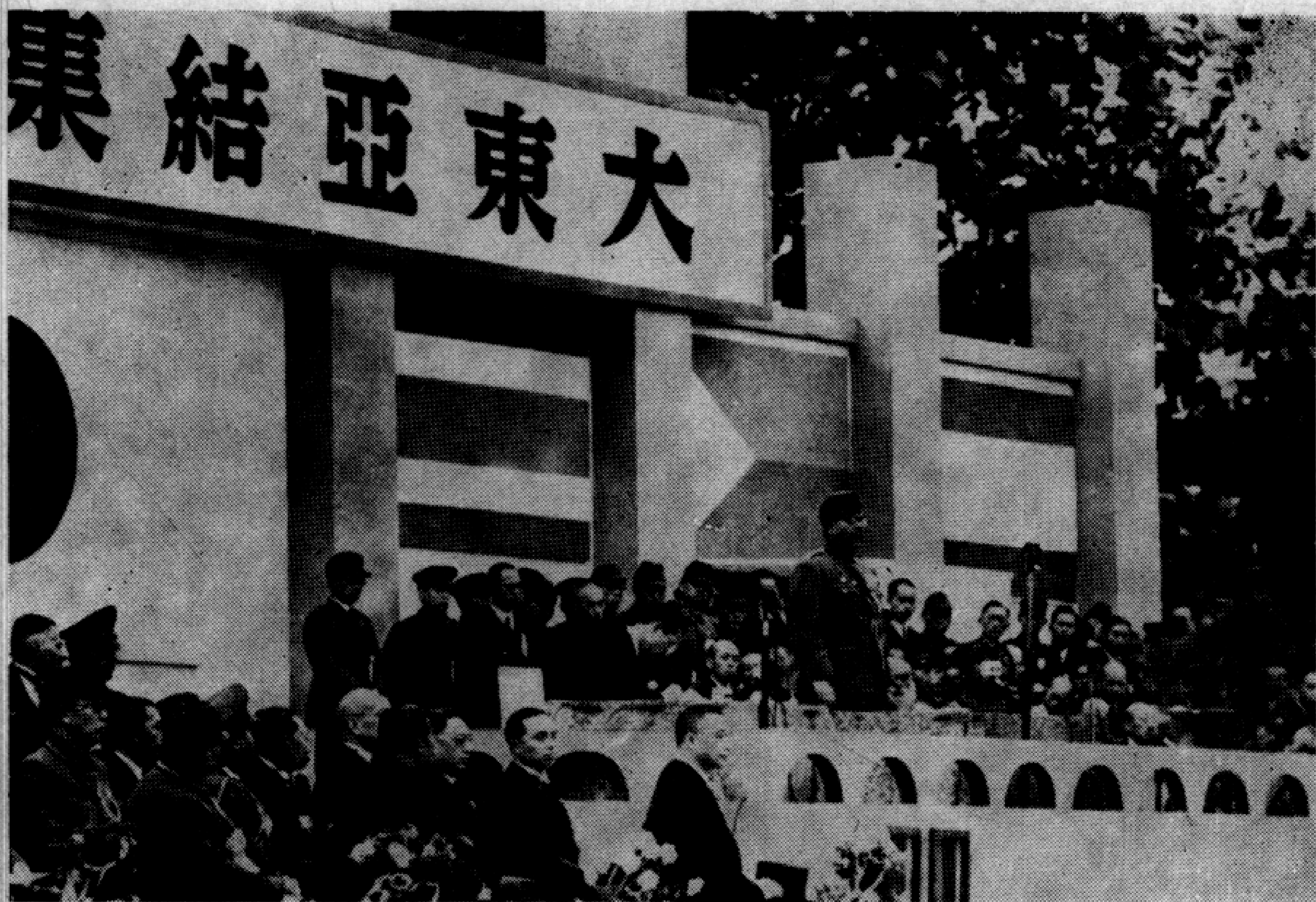
রেনকোজি মন্দিরের ভিতর



ফুজিয়ারা পরিবারের সঙ্গে জাপানী ডিনার



জাপানী রীতিতে নেতাজীকে আপ্যায়ন



টোকিওর হিরিয়া পার্কে বক্তৃতা করছেন নেতাজী



টোকিওতে এশীয় নেতাদের গেট-টুগেদার, বা ম ও জোসে লরেলের সঙ্গে নেতাজী

সময়ের সেই দিনগুলিতেও তার কোন তারতম্য হত না। নেতাজী তাঁর ঘরের জানলায় দাঁড়ালে দেখতে পেতেন শিনগাওয়া উপসাগরের সুন্দর দৃশ্য। তিনি নিশ্চয় সেদিন জানলার বাইরে শরৎকালের প্রসন্ন আকাশের দিকে চেয়েছিলেন আর তখনি হয়ত তাঁর মনে পড়েছিল বিখ্যাত মেইজি সম্রাটের স্মৃতি· আর মনে পড়েছিল কেমন করে স্বল্পবিখ্যাত, ছোট্ট দেশ জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।'

এর আগের দিন জাপানে জার্মান রাষ্ট্রদূত স্টাহ্‌মার এসে নেতাজীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দেন। তাতে ছিল জার্মান গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ সরকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে সেই খবর। নেতাজী খুশী হলেন। কিন্তু ইউরোপে ওঁর অপর সহযোগী দেশ ইটালির পতন আসন্ন জেনে উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। উনি কখনো ভোলেননি কাবুলে যে সময় উনি পথে পথে ঘুরছেন, বিদেশী দূতাবাসগুলির সাহায্য চাইছেন দেশের মুক্তি-সংগ্রামে, তখন ইটালিই প্রথম এগিয়ে আসে। যা হোক, নিজেদের চরম দুঃসময়ের মধ্যেও ইটালি পরে আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি পাঠিয়ে দেয়।

তেসরা নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে নেতাজী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেদিনই প্রধানমন্ত্রী তোজোর বাসভবনে সন্ধ্যাবেলা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতারা এক প্রীতি-সম্মেলনে মিলিত হন। বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে যে-সব নেতারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে এক বার্মার বা ম ছাড়া অন্য কাউকে নেতাজী চিনতেন না। সেই গেট-টুগেদার-এ প্রথম সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। এর পর মূল অধিবেশনের সময় ছাড়াও বিভিন্ন রিসেপশন, ডিনার প্রভৃতিতে এঁরা ঘরোয়াভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পান। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও মধুর ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

তেতাল্লিশ সালের সফরের সময় নেতাজী যে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন তার গল্প শুনলাম। ছবিও পাওয়া গেল তার। এই সাংবাদিক সম্মেলন আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হল, কারণ উনি সাংবাদিকদের কাছে ভারতবর্ষের তখনকার খাদ্য-পরিস্থিতির কথা বিশ্লেষণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে খাদ্য-ঘাটতি চলছে। বাংলাদেশে ঘোরতর মন্বন্তর,

মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। নেতাজী খুব বিচলিত হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকার এ ব্যাপারে কী পলিসি নিয়েছে, সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজী সে কথা বলছিলেন। উনি বলেন, আমরা দু-রকম প্ল্যান ভেবেছিলাম। এক, আমরাই জাহাজে করে ভারতবর্ষে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করব। দুই, আমরা চাল বা খাদ্যশস্য জাপানের কোন বন্দরে এনে জমা করব। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন জাহাজ পাঠিয়ে চাল নিয়ে যান। এই জাহাজ পাঠানো বা লেনদেনের ব্যাপারে কোন শর্ত আমাদের দিক থেকে থাকবে না। এই দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে আমরা অগ্রসর হই। চাল পাঠাবার প্রাথমিক সমস্ত আয়োজন করা হয়ে যায়। এ বিষয়ে হিকারি কিকান সাহায্য করেছে, বার্মা গভর্নমেণ্টও সাহায্য করতে চেয়েছে। আমরা সেইমত ভারতবর্ষের উদ্দেশে বেতারে প্রচার করেছি। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদের সাহায্যের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। ওরা তো চায় আমাদের দেশ খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত থাক। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাচ্ছে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, তবু আমাদের এই মানবিক ন্যায়সঙ্গত আবেদনে সাড়া দেবে না।

এই সাংবাদিক সম্মেলনের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল, নেতাজীর এই দুর্ভিক্ষে সাহায্য করার ও চাল পাঠাবার প্রস্তাবের কথা ইংরেজদের দলিলপত্রেও দেখেছি। পয়লা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের উদ্দেশে ব্রডকাস্ট শোনা গেছে সকালবেলা। হোম পলিটিক্যাল ফাইলে দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে নোট পাঠানো হচ্ছে চীফ সেনসরকে। নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এ-খবর সেনসর করো, কিছুতেই যেন প্রেসে না যায়, কোন খবর কাগজে ছাপা না হয়। আরো রকমারি মন্তব্য আছে যার সারমর্ম হল এই যে, সুভাষ বোস খুব একটা স্টাণ্ট দেবার চেষ্টা করছে। তার প্রস্তাবে তো সাড়া দেওয়া যায় না। দেখতে হবে কোনমতে যেন সুভাষ বোস এরকম একটা কাজের জন্য ক্রেডিট না পেয়ে যায়। ওই পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখেই 'আর টট্যানহাম' সই করা মন্তব্য রয়েছে—

"From the home department point of view we are, of course,

particularly anxious to discredit Subhas Bose in every possible way".

॥ ৮ ॥

নেতাজীর দ্বিতীয়বার জাপান সফরের সময় অর্থাৎ '৪৩ সালের নভেম্বরে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন নিঃসন্দেহ প্রধান ঘটনা। বিশেষভাবে এই কনফারেন্স-এ যোগ দেবার জন্যই তো উনি জাপানে এলেন। এর গুরুত্ব সম্পর্কে উনি খুবই সচেতন ছিলেন। এই আলোচনা বৈঠক থেকেই হয়ত একদিন নূতন এশিয়া জন্ম নেবে—এইরকম একটা স্বপ্ন এঁদের মনে ছিল। হায়াশিদার কাছে শুনেছি টোকিওর পথে নেতাজী আর অন্য এশীয় নেতারাও ফুকুওকাতে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। সে সময় পুরোপুরি এক জাপানী কায়দায় ওঁদের সরাইখানায় তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য, ওঁরা জাপানী আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

এই জাপানী সরাইখানার মালিক করানারি তার ভিজিটরদের খাতায় সব নেতাদের দিয়ে বাণী লিখিয়ে নিয়েছিলেন। বার্মার প্রধানমন্ত্রী বা ম একটু নাটকীয়ভাবে লিখে দেন—'One blood, one voice, one leader'। নেতাজী কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যা খুবই বাস্তবসম্মত কথা তাই লেখেন। উনি লিখলেন—

"The world is in the throes of a revolutionary change. Now is the golden opportunity for the peoples of Asia to build a new Asia."

হায়াশিদা বলেন সরাইখানার মালিক খুব গর্ব করেন যে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আমরা বান্দুং সম্মেলনে 'পঞ্চশীল'-এর কথা শুনলাম।

এই গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেন্স যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছিল, তাতেও কিন্তু আমরা পঞ্চশীল-এর দেখা পাই। যে পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—

(১) এশিয়ার দেশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল দেশের সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য কাজ করবে।

(২) এই সব দেশ পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) নিজস্ব ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এরা এশিয়ার সামগ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

(৪) এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই সব দেশ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে কাজ করবে।

(৫) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলি অবশ্যই যোগাযোগ রাখবে ও সাংস্কৃতিক বিনিময় করবে। পৃথিবীর কোথাও যাতে জাতি ও বর্ণবৈষম্য না থাকে তার জন্যও এরা সচেষ্ট হবে।

নেতাজী বলেছিলেন, আমরা একটা নতুন ধরনের সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। কারণ সাধারণত বিভিন্ন দেশ মিলিত হয় কখন? একটা বড় যুদ্ধের শেষে বিজেতা দেশগুলি মিলিত হয় যুদ্ধে জিতে নেওয়া ধনসম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে। এই এশীয় সম্মেলনের চরিত্র কিন্তু একেবারে আলাদা।

যে কথা বলছিলাম, এশিয়া সম্মেলন নিশ্চয় নেতাজীর সফরের প্রধান ঘটনা। কিন্তু তার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোটখাট আরো কত বিচিত্র টুকরো কাহিনী। যত বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছিল, ততই নেতাজীর সেই সব দিনগুলির অনেক অজানা দিক আমাদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠছিল। যেমন ধরা যাক, শিবুসাওয়া পরিবারের সঙ্গে নেতাজীর অন্তরঙ্গতার কথা।

সেবার যে-সব এশীয় নেতারা টোকিওতে জড়ো হন, তাঁদের এক জায়গায় বা একটা বড় হোটেলে না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা

হয়েছিল। বিশিষ্ট সব জাপানী পরিবার এক একজন বিদেশী নেতাকে তাঁদের পরিবারের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে জাপানের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাবার সুযোগ এঁদের হয়েছিল।

এই জাপানী পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বিশেষ ঘটনা। কারণ আজও পর্যন্ত জাপানীরা সহজে কোন বিদেশীকে নিজের পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করে না। এরা খুবই বন্ধুবৎসল জাতি, বিদেশী বন্ধুকে খুবই দেখাশুনো করবে, খাওয়াবে দাওয়াবে কিন্তু সহজে বাড়িতে নেবে না। যেদিন কোন বিদেশীকে এরা বাড়িতে নিয়ে নিজেদের সঙ্গে খেতে বসাবে, সেদিন বুঝতে হবে এরা তাকে একেবারে আপন করে গ্রহণ করেছে। তাই এশীয় নেতাদের জাপানী পরিবারে রাখার এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে এদের আন্তরিকতার পরিচয়।

শিবুসাওয়া পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন নেতাজী। শিবুসাওয়ারা জাপানের খুব অভিজাত পরিবার। মিঃ শিবুসাওয়া সে সময় জাপানের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। জাপানের অর্থনীতিতে শিবুসাওয়া পরিবারের বরাবরই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

একদিন ইন্টারন্যাশনেল হাউজের লাউঞ্জে বসে গল্প করছি সকলে মিলে —ইয়াশিরো আছেন, ইয়োকোবরি আছেন, হাচিয়া পরিবারের অনেকে এসেছেন—এমন সময় এক জাপানী ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। দেখি তিনি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ইয়াকোবরি উঠে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন।

'তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মিঃ শিবুসাওয়া'—শুনে প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম। এঁর তো বয়েস বেশী মনে হচ্ছে না। অবশ্য জাপানীদের বয়স বোঝা বেশ মুশকিল। তবুও নেতাজী যদি এঁর অতিথি হয়ে থাকেন—। ইয়োকোবরি তখনি বুঝিয়ে দিলেন ইনি শিবুসাওয়া জুনিয়র। এঁর বাবা শাকুরো কো শিবুসাওয়া ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। এঁদের বাড়িতেই নেতাজী অতিথি হন। শিবুসাওয়া জুনিয়র তখন ছেলেমানুষ। ওঁর ঠাকুর্দাও ছিলেন জাপানী ফিনান্সের ব্যাপারে

প্রতিপত্তিশালী। এমন কি এক সময় জাপানের কোন একটি কারেন্সি নোটে ওঁর মুখের ছবি ছাপার প্রস্তাবও উঠেছিল। আর শাকুরো শিবুসাওয়া যুদ্ধের পর জাপানী ক্যাবিনেটে অর্থমন্ত্রী ছিলেন কিছুদিন।

ছোট শিবুসাওয়া বেশ হাসিখুসি, মিশুকে। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল।

'বাঃ, নেতাজীর কথা মনে নেই? কী যে বলো! সেটা তো আমাদের পরিবারের একটি স্মরণীয় ঘটনা'। উনি বলে চললেন—

'একটু হঠাৎ করেই জানতে পারা গেল, আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্র-প্রধান নেতাজী চন্দ্র বোস উঠবেন আমাদের বাড়ি। বেশ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমাদের পরিবারে থাকলেও উনি তো রাষ্ট্রীয় অতিথি। একটুও যেন ত্রুটি না হয় আয়োজনে। কার্পেট, খাট, সোফা অনেক নূতন ফার্নিচার এল। আমার বাবা-মা তাঁদের শোবার ঘর ছেড়ে দিলেন অতিথির জন্য। সেই ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হল। আমরা ছোটরা খুব উত্তেজিত। সারা বাড়িতেই নানারকম ওলট-পালট হল। আমার বয়স বছর ষোল হবে।

'দেখতে দেখতে সেই বিশেষ দিন এসে পড়ল। নেতাজী এসে পৌঁছলেন। বাড়ির কর্তা, গিন্নী, ছেলেমেয়ে, পরিচারক-পরিচারিকার দল, মায় সিকিউরিটি গার্ড-এর লোকজন পর্যন্ত সকলের হৃদয় তিনি নিমেষে জয় করে নিলেন। যেন কোন যাদুবলে মোহিত করে ফেললেন সকলকে। আমার তো ষোলো বছর, তার পর আমার পরের বোন। আর একটি ছোট বোন ছিল। সে এমনিতে অপরিচিত লোকের কাছে সহজে ঘেঁষতে চাইত না। কিন্তু নেতাজী যতদিন রইলেন নেতাজীর কোলের কাছে বসে থাকত সর্বক্ষণ। নেতাজী গাড়িতে করে বাইরে যাবেন, সেও গাড়িতে চড়ে সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরত।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, মিঃ শিবুসাওয়া, আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন। জাপানীদের মধ্যে এত ঝরঝরে ইংরেজি বলা সহজে শুনতে পাওয়া যায় না। যাঁরা জানেন তাঁরাও ঠেকে ঠেকে

আর অস্পষ্ট উচ্চারণে বলেন।

উনি বললেন, 'ইংরেজি তো প্রথম বলতে শিখি সেই '৪৩ সালের নভেম্বরে। মিঃ হাসানের কাছে হাতেখড়ি। আচ্ছা, কেমন আছেন মিঃ হাসান?'

মিঃ হাসান! তিনি কে? ওহো, আবিদ হাসানের কথা বলছেন উনি, একটু পরে বুঝতে পারলাম।

'মিঃ হাসান তো নেতাজীর সেক্রেটারি। উনিও নেতাজীর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। উনি প্রথম ইংরেজি শেখালেন, পরে অবশ্য আমি চর্চা রেখেছি। মিঃ হাসানের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতুম সব জায়গায়। তখন আমি ইস্কুলের পড়া শেষ করেছি। মিলিটারি একাডেমিতে ভরতি হব তার তোড়জোড় চলছে। আমি নেভিতে ট্রেনিং নেব অনেক দিন থেকে মন স্থির করে রেখেছি। কিন্তু মিঃ হাসান সব গোলমাল করে দিলেন। উনি বললেন, তুমি ইনফ্যানট্রিতে ট্রেনিং নাও। আমার ওপর ওঁর খুব প্রভাব তখন। উনি নিজে তো জার্মানীতে আর্মিতে ট্রেনিং নিয়েছেন। এমন বোঝালেন যে আমি বুঝে গেলাম এবং নেভিতে না গিয়ে আর্মি ট্রেনিং-এ ভরতি হলাম।'

শিবুসাওয়ার বাড়ির এই দিনগুলোতে নেতাজী স্বাভাবিকভাবেই খুব ব্যস্ত থাকতেন। কনফারেন্স-এর কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ থাকত। হিবিয়া পার্কে সেই বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিলেন। রেডিও বক্তৃতা করলেন, সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। শিবুসাওয়া ছেলেমেয়েরা দেখত ওঁর ব্যস্ত আনাগোনা।

সন্ধ্যাবেলার দিকে কোন-না-কোন রিসেপশন, ডিনার এসব লেগেই থাকত। অবশ্যই পানাহার করা এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোমেটিক আলোচনা এই সব ডিনার টেবিলে হত। কনফারেন্স প্রতি-নিধিদের সঙ্গে ছাড়াও জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর, এয়ারফোর্স, নেভির অফিসারবৃন্দ এঁদের সঙ্গে নেতাজীর এই ধরনের আলাদা আলাদা রিসেপশন, ডিনার, বৈঠক ইত্যাদি হয়েছিল। নেতাজীর সব সময় চিন্তা ছিল, কীভাবে আজাদ হিন্দ সরকার বা আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সব রকম সুযোগ-

সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়। জাপানী অফিসাররা বলছেন, নেতাজী বেশ ভাল 'বারগেন' করতে পারতেন। সে সময় উনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরো বাড়িয়ে তোলার কথা ভাবছিলেন। জাপান বলছে, তিরিশ হাজারের বেশী সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া ওদের পক্ষে কষ্টকর। নেতাজী বলছেন, না, পঞ্চাশ হাজার রেগুলার আর্মিতে থাকবে, তা ছাড়া সিভিলিয়ানদের মধ্যে থেকে কুড়ি হাজার থাকবে ভলান্টিয়ার বাহিনীতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আই. এন. এ-র 'এক্সপ্যানশন' বা বড় করা নিয়ে যখন আলোচনা করছেন তখন উনি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কথাও তুলছেন। আমরা তো জানি আজাদ হিন্দ ফৌজের এয়ারফোর্স বা নেভি ছিল না। কিন্তু করতে যে হবে সে বিষয়ে তখনি নেতাজী গুরুত্বপূর্ণ নেগোসিয়েশন করছিলেন। এই সব ডিপ্লোমেটিক ডিনার ও রিসেপশন তাই ছিল নিতান্ত জরুরী।

ইতিমধ্যেই নেতাজী টোকিওর মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষালাভ করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাছাই করা কিছু ছেলে। তাদের মধ্যে দশজন এয়ারফোর্স ট্রেনিং-এ আছে। পঁয়ত্রিশজন আর্মির ট্রেনিং-এ। এই সব ছেলেরা নেতাজীর প্রাণাধিক প্রিয়। জাপানী ডকুমেণ্ট বলছে, নেতাজী ছিলেন ওদের কাছে 'লাইক এ মাদার'—মায়ের মত।

নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেকে দেখা করতে আসতেন নেতাজীর সঙ্গে। কত লোকে আনতেন কত রকম উপহার। শিবুসাওয়ারের বাড়িতে উপহার স্তূপ হতে লাগল। নানা রকম উপহারের মধ্যে একটি ছিল তরবারি। এক দিকে নাম খোদাই করা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অন্য দিকে কাঠের বাক্সে লেখা 'দুষ্টের দমন করো, শিষ্টের পালন করো।' এই কথাগুলো জাপানী ভাষায় লেখা 'হাজা কেনশো'। হাতের লেখা জাপানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মিতসুরু তোয়ামার। জাপান-ভারত বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তোয়ামা এই তরবারি আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দিয়েছিলেন। ফুকুওকার দুই কারুশিল্পী এই তরবারি বানিয়েছিলেন। শুনেছি, সব চাইতে ভাল তরবারি নাকি বানানো হয় ফুকুওকাতে। দুই শিল্পীর নামও লেখা

আছে। আরো লেখা আছে—ফুকুওকার শিচিহেই ইসোনো এটি দিলেন। যোদ্ধার তরবারিকে জাপানীরা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে।

দেখতে দেখতে নেতাজীর বিদায়ের দিন এসে পড়ল। শিবুসাওয়া পরিবারের সকলকে ডেকে নেতাজী বিদায় চাইলেন। ওঁর যা কিছু উপহার-সামগ্রী বিশেষ করে এই তরবারি, নেতাজী বললেন, শিবুসাওয়া পরিবারের কাছেই থাকবে। নেতাজী বললেন, 'আমি আবার আসব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমি আবার তোমাদের কাছে আসব, তখন আমি এই সব গ্রহণ করতে পারব। ততদিন এ সব তোমাদের কাছেই থাকবে।' শিবু-সাওয়ার বাড়ির সকলে নেতাজীকে বিদায় জানাতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। উনি ওঁদের একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছিলেন। যাবার আগের দিন নেতাজী নিজের একটি ছবিতে সই করে বাড়ির কাউকে কাউকে দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু উনি কাকে ফেলে কাকে দেবেন। ছোট শিবুসাওয়া গল্প করলেন ওদের বাড়ির রাঁধুনী, বেয়ারা, মালি, যে যেখানে আছে সবাই চায় ওঁর একটা ছবি। সিকিউরিটি গার্ডদের লাইন পড়ে গেল, তাদেরও একই দাবি। অনেক ভি আই পিকে তো ওরা দেখাশুনো করেছে কিন্তু এ রকম চমৎকার মানুষ ওরা আর দেখেনি। শিবুসাওয়ারের মনে আছে আরো অনেক ছবি আনাতে হলো আর চলে আসার আগের রাতে ল্যাম্প জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে নেতাজী কেবলই ছবিতে সই করে চললেন।

'দেশ স্বাধীন হলে আবার আসব' বলেছিলেন নেতাজী। তখনি নিয়ে যাবেন তরবারি ও অন্যান্য উপহার। সে সুযোগ তো আর হল না। এদিকে জাপানের পরাজয়ের পর সারা দেশে একটা বিপর্যয়ের ছায়া নেমে এল, শিবুসাওয়া পরিবারও বাদ গেলেন না। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কোথায় চলে গেল নেতাজীর ফেলে আসা সব জিনিস।

প্রায় কুড়ি বছর পর একদিন এক জাপানী হঠাৎ দেখতে পেলেন টোকিওর এক কিউরিওর দোকানে এক তরবারি। তার গায়ে লেখা জাপানী ভাষায়—হিজ একসেলেনসি সুভাষচন্দ্র বোস। তখনি তিনি জাপানের ওয়ার ভেটেরান বা যুদ্ধ-ফেরত অফিসারদের খবর দিলেন। খবর পেয়ে এসে হাজির

হলেন প্রবীণ জাপানী অফিসাররা। যোদ্ধার তরবারি ওঁদের কাছে পরম শ্রদ্ধার জিনিস। একে তো হেলাফেলা করা যায় না। অফিসাররা নিজেরা পরামর্শ করে দোকান থেকে প্রথমে সেই তরবারি সংগ্রহ করলেন। ওঁরা অনেকেই এই তরবারির কথা জানতেন। অনেক সময় ভেবেছেন গেল কোথায় সেটা! তরবারি উদ্ধার করার পর ওঁরা জাপানে ভারতের তখনকার রাষ্ট্রদূত বদরুদ্দিন তায়েবজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও দূতাবাসের মাধ্যমে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে খবর দেন।

এর পর জেনারেল ফুজিয়ারা টোকিও থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন সেই তরবারি। নেতাজী ভবনে তরবারি অনুষ্ঠান নামে এক অভূতপূর্ব উৎসব হল। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেদিন। তখন মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, বেঙ্গল এরিয়া কম্যাণ্ডার সকলের উপস্থিতিতে জেনারেল ফুজিয়ারা ফিরিয়ে দিলেন নেতাজীর তরবারি। মিলিটারি ব্যাণ্ডে এক দিকে তখন মার্চিং টিউন বাজছিল, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও' গাইছিল ছেলেমেয়ের দল। কিছুকাল পরে দিল্লীর লাল কেল্লায় ভারতের রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন এই তরবারিকে।

টোকিও থেকে সেবার নেতাজী কিন্তু সোজা সিঙ্গাপুরে ফিরে যাননি। উনি চীন সফরে গেলেন। এশিয়া সম্মেলনের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। নানকিং সরকারের পক্ষ থেকে উনি নেতাজীকে চীনে আমন্ত্রণ জানান। ওঁর নিজের দল থেকে উনি প্রচার-মন্ত্রীকে আগে থাকতে নানকিং পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, নেতাজীর অভ্যর্থনার প্রস্তুতির প্রয়োজন।

নেতাজীর এই চীন সফর নানা কারণে বিশেষ কৌতূহলজনক। কলকাতায় থাকার সময় ১৯৩৯-এ উনি একবার চীন যাবার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু যেতে পারেন নি। ব্রিটিশ সরকার ওঁকে চীন যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। অথচ তার অল্প দিন আগেই পণ্ডিত নেহরু যখন চীনে গেলেন তখন কোন আপত্তি কর্তৃপক্ষ তোলেননি।

সে সময় কলকাতায় চীনের কনসাল জেনারেল ছিলেন মিঃ হুয়াং।

উনি বলেন, নেতাজী ওঁকে একদিন ফোনে এলগিন রোডের বাড়িতে ডেকে পাঠান। দু'জনে নিভৃতে কথা হয়। নেতাজী বলেন, ব্রিটিশ সরকার ওঁকে যে-কোন মুহূর্তে অ্যারেস্ট করে জেলে পুরে দেবে। উনি ধরা পড়তে চান না। যদি উনি চীনে বেড়াতে গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তবে চীনের চুংকিং সরকার তা দেবেন কি? মিঃ হুয়াং বলেন, যদি সুভাষচন্দ্র বেড়াতে যেতে চান তবে এখনি সাদরে অভ্যর্থনা করা হবে এ বিষয়ে উনি নিশ্চিত। তবে পলিটিক্যাল আশ্রয়দান অনিশ্চিত। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুংকিং সরকারের যে রকম বন্ধুত্ব তাতে এটা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

এদিকে সুভাষচন্দ্র চীন যাবার খোলাখুলি অনুমতি চেয়েছেন। বাংলা সরকারের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দিল্লী থেকে ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বড়কর্তা তুমুল আপত্তি জানালেন। ওঁর মতে সুভাষ বোস জার্মান সাহায্য চাইবে। চীন যাবার নাম করে পথে যখন ব্যাংককে থামবে, সেখানেই নানা রকম ষড়যন্ত্র হওয়া সম্ভব। তার চাইতে ওঁকে দেশেই রাখো। প্রয়োজনমত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে আটক করা যাবে।

আর একজন নোট দিলেন, বেঙ্গলকে তা হলে বলো ওঁকে 'না' বলে দিক। অবশ্য আমাদের এই সিদ্ধান্তের খুবই সমালোচনা হবে, কারণ নেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি এর ওপর নোট দিলেন—আমার মনে হয় জার্মানী নয়, ও রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তা হলে ওঁর লেফট কনসলিডেশন কমিটির বন্ধুরা খুশী হবে। এই সময় ঐ রকম একজন বিপজ্জনক বিপ্লবীকে সেণ্ট্রাল এশিয়াতে ছেড়ে দেওয়া খুব ভুল হবে। ইণ্ডিয়াতেই থাক, দরকার পড়লেই 'নেট' করা যাবে। এই প্রসঙ্গে উনি মন্তব্য করছেন—'নেহরুর আর যা-ই দোষ থাক, সুভাষচন্দ্র বোসের চাইতে একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। আমার মনে হয় না ওঁকে যেতে দেওয়া হয়েছিল বলে অন্যজনকেও দিতে হবে এমন কোন কথা আছে। তা ছাড়া নেহরু যখন গিয়েছিলেন তার চাইতে পরিস্থিতি এখন একেবারে পাল্টে গেছে।

চুংকিং সরকারের কাছে তাই আর নেতাজীর যাওয়া হয়নি। এখন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানকিং সরকারের আমন্ত্রণে এলেন। খুবই সাদর অভ্যর্থনা পেলেন উনি। ওঁকে রাখা হল রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। ওঁদের জাতীয় এসেম্বলির বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল। উনি আই এন এ-র সুপ্রিম কম্যাণ্ডার। ওঁকে ওদের মিলিটারি একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হল। আদর-আপ্যায়নের জবাবে নেতাজী ফিরতি ডিনার দিলেন। সেখানে জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়েলম্যান, জাপানী সেনাপতি হাতা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

চুংকিং সরকারের উদ্দেশ্যে নেতাজী পর পর দুটি বেতার-বক্তৃতা করেছিলেন। প্রথমটি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। উনি বারবার সান ইয়াৎ-সেনের প্রতি ওঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করলেন। এ কথাও মনে করিয়ে দিলেন যে উনি যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন উনিই চীনে একটি মেডিকেল মিশন পাঠিয়েছিলেন। উনি আবেদন করেন যে, এশিয়ার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে চীন-জাপান বোঝাপড়া হওয়া দরকার ও চীনের নিজেদের অনৈক্য দূর করা প্রয়োজন। সান ইয়াৎ-সেনের স্বপ্ন সফল করতে হলে চাই এশিয়ার মুক্তি, এশিয়ার ঐক্য।

দ্বিতীয় বেতার-বক্তৃতার সুর একটু ভিন্ন। ভারত-বর্মা সীমান্তে চীনা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এতে নেতাজী বিরক্ত ও দুঃখিত। এইভাবে ব্রিটিশদের সাহায্য করলে কোন জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চিয়াং কাইশেককে ক্ষমা করতে পারবে না।

নানকিং থেকে নেতাজী সাংহাই গেলেন। সেখানে অনেক ভারতীয়ের বসতি। তারপর এলেন ম্যানিলা। প্রেসিডেন্ট জোসে লরেনের সঙ্গে আবার দেখা হল। সিঙ্গাপুরে ফিরে এসেই আবার উনি বেরিয়ে পড়লেন। এবার জাকার্তা, সুমাত্রা ও বোর্নিও। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র উনি পৌঁছে দিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের বার্তা, আর পূর্ব এশিয়ার যত প্রবাসী ভারতীয় ওঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল তাদের ‘নেতাজী’ রূপে।

॥ ৯ ॥

সেদিন আমরা মিসেস কাৎসুকো তোজোর সঙ্গে দেখা করতে যাব। জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজোর স্ত্রী শ্রীমতী কাৎসুকো এখন নব্বুই বছরের বৃদ্ধা। টোকিও শহরের উপকণ্ঠে তোজোর বাড়ী। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উনি যে সরকারী বাসভবনে থাকতেন তা হল শহরের একেবারে কেন্দ্রে। নেতাজীর সঙ্গে তোজোর দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা বেশীর ভাগ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে নেতাজী যখন শেষবার টোকিও এলেন, তখন তোজো আর প্রধানমন্ত্রী নেই। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কয়সো। তোজো চলে গেছেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। হাজার রকম কাজের মধ্যেও নেতাজী ঠিক সময় করে তোজো পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন সে-বাড়ীতে। আজও মিসেস তোজো সেখানেই থাকেন।

আমাদের গাড়ী যখন দ্রুতবেগে টোকিওর উপকণ্ঠে মিসেস তোজোর বাড়ীর দিকে চলেছে, গাড়ীর মধ্যে জেনারেল ফুজিয়ারা একটি সুদৃশ্য উপহারের প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, প্রথমেই মিসেস তোজোর হাতে এটি দেবে। আমি একটু অবাক হলাম। কারণ সামান্য কিছু ভারতীয় উপহার আমি তো নিয়ে এসেছি ওঁর জন্য। মিসেস তোজোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ আলাপ না থাকলেও, গত পনেরো বছর ধরে মাঝে মধ্যে ওঁর কাছ থেকে দু-এক ছত্র চিঠি আমি পেয়ে এসেছি। আর পেয়ে খুব বিপদেও পড়তাম, কারণ, উনি লিখতেন জাপানী ভাষায়। যা হোক, টোকিও আসার আগে আমি ওঁর জন্য সামান্য উপহার নিয়ে এসেছি দেশ থেকে। ফুজিয়ারা বললেন—না, না, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি বাড়ীতে পৌঁছে প্রথম ওঁকে অভিবাদন করার পরই বলবে, আমি প্রধানমন্ত্রী

তোজোর স্বর্গত আত্মার জন্য এটি এনেছি।

এবার বুঝতে পারলাম। আগেই তো ইয়াসুকুনি মন্দিরে গিয়েছি; তাই স্বর্গত আত্মা বা স্পিরিটের উদ্দেশে জাপানীদের করণীয় আচার-অনুষ্ঠান কিছু না কিছু থাকেই তা বুঝে গিয়েছি। আমার মনে পড়ল, মিসেস তোজোর বাড়ীতে আছে একটি প্রাইভেট শ্রাইন বা নিজস্ব মন্দির। সেখানে রক্ষিত আছে তোজোর ভস্মাবশেষ।

যুদ্ধের পর ওয়ার ক্রিমিনালদের বিচার হল। বিচারে তোজো যুদ্ধ-অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। এ রকমই হয় যে, কোন মহাযুদ্ধের পর জয়ী যাঁরা হন তাঁরা হিরো বলে চিহ্নিত হন। আর যাঁরা হেরে যান যুদ্ধে তাঁরা হয়ে যান যুদ্ধ-অপরাধী। টোকিওর সুগামো বন্দীশালায় ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন তোজো।

কিন্তু তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করা হল ইয়োকোহামার এক ক্রিমে-টোরিয়ামে। আর জেনারেল ম্যাকআর্থার বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন, তোজোর ভস্মাবশেষ যেন সমুদ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ জাপানীদের কথা বলা যায় না, হয়ত ঐ ছাই থেকে তখুনি সৃষ্টি করে ফেলবে দেবতা। এদিকে সেই ক্রিমেটোরিয়ামে কাজ করছিল যে সব জাপানী কর্মী, তারা গোপনে বেশ কিছু ভস্মাবশেষ একটি আধারে করে সরিয়ে ফেলল। তারপর সেই ভস্মপূর্ণ আধার ওরা মিসেস তোজোর হাতে তুলে দেয়। আমেরিকান ফৌজ যতদিন জাপানে ঘাঁটি গেড়ে রইল, ততদিন এই পুরো ব্যাপারটা একান্তভাবে গোপন রাখা হয়। নিজের বাড়ীতেই একটি পূজার ঘর করে এই স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রেখে দেন মিসেস তোজো।

অতি সম্প্রতি ম্যাকআর্থারের আশঙ্কা সত্যে পরিণত করে তোজোকে দেবতায় রূপান্তরিত করেছে তাঁর দেশবাসী। মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর ইয়াসুকুনি মন্দিরে স্থান পেয়েছেন একদা যুদ্ধ-অপরাধী প্রধানমন্ত্রী তোজো। এ কাজটাও মোটের উপর গোপনে করে ফেলেছেন জাপানীরা। পরে এ নিয়ে অল্পবিস্তর বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে।

বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকে দিগ্‌ভ্রম হল। গাড়ী থেকে নেমে ফুজিয়ারা

ঠিকানা মিলিয়ে খুঁজতে লাগলেন। নেতাজী যেদিন এসেছিলেন এ-বাড়ী ১৯৪৪ সালে, সেদিনও বাড়ী খুঁজতে হয়েছিল। কাকিৎসুবো বলেছেন, গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতের পাশের রাস্তা ধরে হেঁটে নেতাজী পৌঁছলেন। আগের দিন বৃষ্টি হওয়াতে পথঘাটে কাদা ছিল খুব। বাড়ীতে পৌঁছে নেতাজী দেখলেন, তোজোর মেয়েরা ওঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দরজার কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু খুঁজতেই বাগানের মধ্যে ছোট মত একটি বাড়ী পেয়ে গেলাম আমরা। আমাদের গাড়ী গেট পার হয়ে বাগানের পথ দিয়ে একেবারে দরজার সামনে থামল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কিমনো পরা, ছোটখাট, জাপানী পুতুল-পুতুল চেহারার এক বৃদ্ধা মহিলা। বয়স অনেক হলেও মুখে এক ধরনের মিষ্টত্ব ও লাবণ্য। বোঝা যায় এককালে সুন্দরী ছিলেন।

সিঁড়ির কাছে জুতো খুলে বাড়ীতে পরার জাপানী চটি পরে আমরা বসবার ঘরে ঢুকলাম। মিসেস তোজো আমার হাত ধরে জাপানী ভাষায় অনেক কথা মৃদুগলায় গুনগুন করে বলে চললেন। অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না, তবে খুব আবেগের সঙ্গে কিছু বলছেন এইটুকু বুঝতে পারছি। উনি থামতে ফুজিয়ারা বুঝিয়ে দিলেন, মিসেস তোজো বলছেন, আজ আমার স্বামীর আত্মা কত সুখী হয়েছেন, ইণ্ডিয়া থেকে এসেছে বন্ধুরা—ওঁর কথা মনে করে ওরা এ-বাড়ীতে এসেছে—আজ কী আনন্দের দিন, কী আনন্দের দিন!

ঘরে ঢুকতে চোখে পড়ল, একদিকে দেওয়াল জোড়া তোজোর বিরাট তৈলচিত্র। ইউনিফর্ম পরা, হাতে সিগারেট, ফুল সাইজ ছবি। খুব জীবন্ত। মনে হল যেন ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। ঘরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ যুদ্ধের সময় তোজোর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জেনারেল আরিস্যুয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, রয়েছেন জেনারেল ফুজিয়ারা, ক্যাপ্টেন নিশিদা নীরবে ছবি তুলে চলেছেন। ঘরে এলেন আর এক জাপানী মহিলা। ইনিও বৃদ্ধা তবে মিসেস তোজোর চেয়ে শক্ত সমর্থ। ইনি মিসেস কিমুরা। এঁর স্বামী জেনারেল কিমুরা বার্মা এরিয়া কম্যাণ্ডার ছিলেন। জেনারেল কাওয়াবে ফিরে যাবার পর ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর

থেকে কিমুরা ভার নেন বার্মা এরিয়ার। যুদ্ধের শেষে তোজোর মত ওঁরও বিচার হয় আর যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে ফাঁসী হয়ে যায়।

তোজোর ছবির নীচে যে বড় সোফা সেখানেই আমাদের নিয়ে বসালেন মিসেস তোজো। বসামাত্রই আমার ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। মনে পড়ে গেল সাংবাদিক বন্ধু ইয়োকোবরি বলেছিলেন, দেখবে ছবির নীচে যে সোফা তাতে আজও লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। আমি অবশ্য কোন দিকে তাকালাম না, আড়ষ্ট হয়ে রইলাম একটু।

যুদ্ধের পর অ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনীর অফিসাররা এসেছিলেন তোজোকে গ্রেপ্তার করতে। গ্রেপ্তারের জন্য অফিসার যত না ছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল আন্তর্জাতিক প্রেসের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের দল। এই বসার ঘরের সামনের দরজায় 'নক' করলেন ওঁরা। পিয়ানোর ওপাশে যে জানলা, এইমাত্র ছবি তোলার আলো আর একটু বাড়বে বলে ক্যাপ্টেন নিশিদা যে জানলা খুলে দিলেন, সেদিন তোজো এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঐ জানলায়। বাইরে সমাগত অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে উনি শান্তভাবে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

ঘরে এসে তোজো স্ত্রীকে অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি শীগগির চলে যাও পাশের বাড়ীর বাগানে। যেন বাগানে কোন কাজ করছ এই রকম ভান করবে।' অবশ্য পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীরা সেদিন মিসেস তোজোকে আশ্রয় দিতে চাননি। দোষ দেওয়া যায় না। কে নিতে চায় বিপদের ঝুঁকি। তবু দুই বাড়ীর বাগানের মাঝখানে খুরপি হাতে দাঁড়িয়ে মিসেস তোজো কী করবেন চিন্তা করছেন, এমন সময় বাড়ীর দিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। সব ভয়-ভাবনা ভুলে খুরপি ফেলে দিয়ে ছুটে বাড়ীতে ফিরে এলেন মিসেস তোজো।

তোজো সেদিন 'আমি আসছি' বলেও দরজা খুলে দেননি। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়ে বসবার ঘরের এই সোফায় বসে নিজেকে গুলি করেন। গুলির আওয়াজ হতে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন সকলে। আহত তোজোকে তখুনি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের সামনে

ঘটনাটা ঘটে বলে অল্প সময়ের মধ্যে তোজোর আত্মহত্যার চেষ্টার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়।

জাপানেও তোজো সে সময় বিশেষ পপুলার ছিলেন না। পরাজিত, লাঞ্ছিত জাপানী জাতি তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য স্বাভাবিকভাবেই জাপানের যুদ্ধের সময়ের নেতৃবৃন্দকে দায়ী মনে করছিল। অনেক জাপানী বিরক্ত হয়ে বলেন, ঠিকমত আত্মহত্যাও কী করতে পারেন না উনি! ওদিকে মিত্রবাহিনী অনেক চেষ্টায় তোজোকে সারিয়ে তুললেন যাতে তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানো যায়!

একটি অপেক্ষাকৃত কমবয়সী জাপানী মহিলা ট্রেতে চা ও কেক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের দিকে চেয়ে হাসতেই ওঁর সরু চোখ দুটো একেবারে মিলিয়ে গেল। পরিচয় হল, ইনি তোজোর এক মেয়ে, মায়ের কাছে এসে রয়েছেন এখন। আমরা যেন অনেকক্ষণ অতীতের এক গণ্ডীর মধ্যে আটকে গিয়েছিলাম। মেয়েটি এসে ঢোকার পর চা খেতে খেতে স্বাভাবিক ভাবে গল্পসল্প শুরু হল। এর মধ্যে আমি তোজোর স্বর্গত আত্মার জন্য আনা উপহার দিয়ে দিয়েছি মিসেস তোজোর হাতে। উনি অনেকবার নীচু হয়ে 'বাও' করেছেন। তারপর সেটা হাতে করে বোধহয় পুজোর ঘরে রেখে এলেন।

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তোজোর মেয়ে আবার তাঁর সরু চোখ একদম মিলিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, হ্যাঁ, নেতাজীর এ-বাড়ীতে আসার কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। অন্য বোনদের সঙ্গে উনি দরজায় নেতাজীকে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

"ঐ যে আপনারা যেখানে জুতো খুললেন, ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে নেতাজী পা থেকে বুটটা খুলবার জন্য টানাটানি করছিলেন। মিলিটারি টপ-বুট খোলা বেশ শক্ত। আমরা বলে উঠলাম, নেতাজী, বুট খুলবেন না। আপনি জুতো পায়ে ভেতরে আসুন। উনি হেসে বললেন, তাই কখনো হয়! বুট খুলে চটি পায়ে ঘরে এলেন।"

মিসেস তোজো বললেন, সে সময় নেতাজীর আমাদের বাড়ীতে না

এলেও তো চলত। আমার স্বামী তো ক্ষমতায় ছিলেন না তখন। ওঁর মত মহৎ মানুষেরই থাকে এই সৌজন্যবোধ। আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

আরিস্যুয়ে সে কথায় সায় দিলেন। মিসেস তোজো সৌজন্যর কথা বলছিলেন। আরিস্যুয়ে বললেন, আর ছিল গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। উনি একটুও ভুলে যাননি, তোজোই জাপানের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন করবে জাপান। সিঙ্গাপুরে এসে নেতাজীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আই এন এ-র কুচকাওয়াজ দেখে-ছিলেন। এশিয়া সম্মেলনের সময় আন্দামান ও নিকোবর হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারকে। ইম্ফল যুদ্ধ, মিলিটারি ইতিহাসে যা 'অপারেশন U' বলে পরিচিত, তাও সম্ভব হত না তোজোর সম্মতি ছাড়া।

তোজোর মেয়ে পুরোন অ্যালবাম খুলে ওঁদের পারিবারিক ছবি দেখালেন। মিসেস তোজো সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। আরিস্যুয়ে বললেন, শুধু সুন্দরী নন, বুদ্ধিমতী এই মহিলা তোজোর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন। একদিনের গল্প বললেন আরিস্যুয়ে। তোজোর সঙ্গে ওঁরা কনফারেন্স-এ বসেছেন। যুদ্ধের খবর ভাল নয়। তোজোর মেজাজ বেশ খারাপ। সব অফিসাররা বুঝতে পারছেন আজ বকুনি খাওয়া আছে কপালে। এমন সময় হঠাৎ ঘরে মিসেস তোজোর প্রবেশ। হাতে ট্রে, তাতে কয়েক মগ গরম কফি। কফি খেতে ভালবাসতেন তোজো আর যুদ্ধের সময় ভাল কফি পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার ছিল। কফি দেখেই তোজোর মুড ভাল হয়ে গেল। আমাদের আর বকুনি খেতে হল না সেদিন।

মিসেস তোজো সুগৃহিনী, খাওয়াতে ভালবাসেন। নেতাজী আর তোজো গত এক বছরের যুদ্ধের পরিস্থিতি আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন আলোচনা করতে ব্যস্ত, মিসেস তোজো বাড়ীর বাগানের মিষ্টি আলু দিয়ে খাবার বানিয়ে নিয়ে এলেন ওঁদের জন্য। কাকিৎসুবো ভাগ পেলেন তার। আমাদেরও বার বার বলে যত্ন করে চা খাওয়ালেন উনি, হাতে ধরিয়ে দিলেন ফরাসী চকোলেটের বাক্স।

মিসেস তোজো বেশ কয়েকবার উল্লেখ করলেন 'জাজ পাল'-এর নাম।

রাধাবিনোদ পালের কথা বলছিলেন উনি। বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল সত্যি আমাদের মুখরক্ষা করে গিয়েছেন। বিজিত দেশের নেতাদের অন্যান্য সব দেশ যখন যুদ্ধ অপরাধী বলে রায় দিল, ভারতবর্ষের বিচারপতি পাল একমত হতে পারলেন না, ডিসেন্টিং জাজমেণ্ট দিলেন উনি। যদিও তাতে প্রাণদণ্ড ঠেকানো গেল না তবুও জাপানীরা 'জাজ পাল'-এর কাছে এবং ওঁর মাধ্যমে সকল ভারতবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

যুদ্ধের প্রোপাগাণ্ডা এক জিনিস আর ন্যায়বিচার আর এক কথা। প্রোপাগাণ্ডার খাতিরে একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে যায়। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে যুদ্ধ অপরাধী নয় কে? আজও যুদ্ধের এত বছর পরেও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় 'হিটলারের জার্মানী এই রকম অত্যাচার করেছিল' বা 'তোজোর জাপান এই অন্যায় করেছিল।' সবই তো ঠিক। কিন্তু চার্চিলের ব্রিটেন বা রুজভেল্ট-ট্রুম্যানের আমেরিকা কি কোন অত্যাচার কোনদিন করেনি? আমাদের দেশের বিপ্লবীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকা বেশী কিছু করেনি শুধু অ্যাটম বোমা ফেলে দিয়েছিল জাপানের ওপর। রাশিয়া নিজে যেমন অত্যাচারিত হয়েছে, ফিরে কিছু কম করেনি। ভিয়েনা শহরে রাশিয়ান জোন-এ যাঁরা পড়েছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন তার।

তোজোকে 'মিলিটারিস্ট' বলা হয়। এ বিষয়ে বার্মার বা ম বলেছেন, সে যাই হোক না কেন, আমাকে, নেতাজীকে আর পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য নেতাকে তোজো বেশ মুগ্ধ করেছিলেন। আমাদের বিশেষ সমস্যাগুলো উনি বুঝতেন আর দরকার মত অন্যান্য 'মিলিটারিস্ট' অফিসারদের ডিঙিয়ে আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করতেন না।

তোজোর বাড়ীতে নেতাজীর সঙ্গে এই দেখাই ওঁদের দু'জনের শেষ সাক্ষাৎ। তোজো নেতাজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু উদ্বেগ প্রকাশ করে-ছিলেন। নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছিলেন। আরিসূয়ে আমাদের বলেন, ওঁরও মনে হয়েছিল সেবার নেতাজীর শরীর ভাল

যাচ্ছে না। এমন নয় যে ওঁকে দেখামাত্রই কিছু বোঝা যাচ্ছিল। উনি তো অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছিলেন। কিন্তু নজর করে দেখলে মনে হচ্ছিল স্ট্রেইন হচ্ছে ওঁর খুব। যুদ্ধের অবস্থা যে ওঁদের অনুকূলে নয় সে কথা তো সকলেই বুঝতে পারছিলেন। জাপানের পরাজয়ের পর ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম কীভাবে কোথা থেকে চালাবেন চিন্তা করছেন নেতাজী। আরিস্যুয়েকে বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব কিনা। আরিস্যুয়ে শিগোমিৎসুর সঙ্গে কথা বললেন। পররাষ্ট্র দপ্তর ব্যাপারটা আলোচনা করে 'সম্ভব নয়' বলে জানিয়ে দিলেন। নেতাজী তখন সরাসরি যোগাযোগ করার একটা চেষ্টা করলেন। জাপানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত জেকব মালিককে উনি একখানা চিঠি লিখে দূতাবাসে পাঠালেন। কিন্তু সে চিঠি না খুলেই ফেরত পাঠিয়ে দেন রাষ্ট্রদূত।

নেতাজীর তৃতীয়বার টোকিও সফরের সময় অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে এটাই ছিল নেতাজীর একমাত্র ব্যর্থতা। আর যে সব দৌত্যে উনি এসেছিলেন তার সবই সফল হয়েছিল। তোজোর জায়গায় কয়সো প্রধান-মন্ত্রী হলেও নেতাজী ও আজাদ হিন্দ আন্দোলনে জাপানের সমর্থনের কোন হেরফের হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কয়সো প্রধানমন্ত্রী হবার পর নেতাজীকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে ওঁদের সমর্থন যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তবুও একবার মুখোমুখি কথা বলতে এলেন নেতাজী।

তোজোর সঙ্গে এই মুখোমুখি কথা বলার ফলেই তো তোজো নেতাজীর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বার্লিন থেকে প্রথম যখন এসে পৌঁছলেন, শোনা যায় তোজো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে খুব একটা ঔৎসুক্য দেখান নি। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ১০ই জুন যখন দেখা হল তখন কি হল? একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক-গবেষক একটি বাক্যে বলে দিয়েছেন—The Magic of Bose enchanted Tojo immediately। এই ম্যাজিকের ছোঁয়া আগেই লেগেছিল চীফ অব স্টাফ স্গিয়ামা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগোমিৎসুর গায়ে। সেই ঐতিহাসিকই বলেছেন, নেতাজীর মুখে, চোখে, কণ্ঠস্বরে এমন কিছু

ছিল যা সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করে নিত। ১৯৪৩ সালের জুনে সেই প্রথম দেখা আর ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত তোজোর সংগে সেই শেষ দেখা। এর মধ্যে আছে তোজোর সিঙ্গাপুরে যাওয়া আর নেতাজীর এশিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে টৌকিও আসা। অল্পদিনের, কিন্তু সুদৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

আমাদের বিদায় নেবার সময় হয়ে এল। মিসেস তোজো বললেন, যাবার আগে তোজোর শ্রাইনে একবার ঘুরে যেতে। আমাদের যেমন ঘরের এককোণে অনেক সময় পুজোর আসন থাকে তেমনি দেখলাম মিসেস তোজোর ঘরের একপাশে সাজানো তোজোর ছবি। এখানেই আছে সেই ভস্মাধার। ইয়োকোহামা ক্রিমেটোরিয়ামের জাপানী কর্মীরা গোপনে যে আধার এনে দিয়েছিল মিসেস তোজোকে। সামনে ফুল ও ফল সাজানো, তারই মধ্যে দেখলাম আমার আনা প্যাকেটও ঠাঁই পেয়েছে। একপাশে প্রদীপ জ্বলছে।

আমরা সবাই একে একে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসলাম। মোটের উপর জানা হয়ে গেছে এই আচারানুষ্ঠান কীভাবে করতে হয়। ধূপকাঠি জ্বেলে দিলাম। দু'বার নীচু হয়ে অভিবাদন। আর দু'বার হাতে তালি দেওয়া। একটা ঘণ্টা রাখা আছে, পাশে রাখা আছে দণ্ড। দণ্ড দিয়ে ঘা দিয়ে দু'বার বাজিয়ে দিলাম ঢং ঢং। একে একে সকলে এই অনুষ্ঠানের নিয়ম পালন করছি আর ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছেন মিসেস তোজো। মিসেস কিমুরা ওঁকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁদছেন, আবার নিজের ভাষায় মৃদু গুনগুন করে কী যেন বলে চলেছেন।

আরিস্যুয়ে বললেন, উনি আবারও বলছেন, আজ আমার স্বামীর আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হল, দূরদেশ থেকে এসেছে বন্ধুরা, প্রার্থনা করেছে ওঁর জন্য।

চলে আসার আগে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার হাতের ওপর ওঁর গালটা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। আমি টের পেলাম আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। যদি উনি আমার ভাষা বুঝতেন, তবে আমি ওঁকে শোনাতাম আমাদের পরিচিত গানের কয়েক ছত্র—

সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

আমি জানতাম না, ওঁরও কবিতায় কিছু বলার ইচ্ছা হয়েছিল। কলকাতা ফিরে এসে ওঁর চিঠি পেলাম। চিঠিটা ইংরেজিতে জেনারেল আরিস্যুয়কে দিয়ে লিখিয়েছেন। বলছেন, সেদিন তোমরা এখানে আসাতে কী গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি বোঝাতে পারবো না। আমার মনের ভাব বোঝাবার জন্য তিনটি জাপানী কবিতা লিখে দিলাম। কবিতাগুলো অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। যদি পারো কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিও।

সঙ্গের ছবি আঁকা তুলোট কাগজে তিন-চার লাইনের 'হাইকু' জাপানী ছোট কবিতা লেখা। কবিতার মর্মোদ্ধার এখনো করতে পারিনি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের না দেখা ইয়ারো নদীর মত জমিয়ে রেখেছি—কোন একদিন বুঝে নেব কী লেখা আছে তাতে।

॥ ১০ ॥

টোকিও শহরের একপাশে সুগিনামিকু এলাকাতে একটি ছোট বৌদ্ধ মন্দির আছে। সাধারণত বৌদ্ধ মন্দির যেমন হয় কাঠের স্থাপত্য, চারপাশে বাগান, নিরিবিলি শান্ত আশ্রমের পরিবেশ। একদিন এই মন্দিরের দরজায় আমরা এসে দাঁড়ালাম। আমাদের নিয়ে এলেন নেতাজীর একদা সহযোগী বৃদ্ধ জেনারেলরা এবং টোকিও সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। জেনারেল টাডাশি কাটাকুরা আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। পিছনে এলেন জেনারেল ফুজিয়ারা, জেনারেল আরিস্যুয়ে, হায়াশিদা, হামাদা, ইয়াশিরো প্রভৃতি। মন্দিরের ভিতরের দরজায় আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এক নবীন বৌদ্ধ ভিক্ষু। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা,

গায়ে কালো জোব্বা। কাটাকুরা পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ইনি রেভারেণ্ড মোচিজুকি জুনিয়র। এই রেনকোজি মন্দিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে পবিত্র দেহাবশেষ রাখা আছে, ওঁর পিতার মৃত্যুর পর তার দেখাশুনোর ভার এখন ওঁর ওপর।"

সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হয়েছে ওঁর একথা আমরা আগেই শুনেছিলাম। ওঁকে প্রথমেই সমবেদনা জানালাম। বিশেষ করে ডাঃ বসু আগে যখন এসেছিলেন ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বৃদ্ধ পুরোহিতের, সে কথা উনি বললেন। "১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে তিন দশকেরও কিছু বেশী সময় বৃদ্ধ মোচিজুকির ওপর যে পবিত্র দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছেন"—বললেন কাটাকুরা। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে অন্ত্যেষ্টিতে এসেছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অবতার সিং।

ভিতরের ঘরে ঢুকে আমরা বসলাম। নীচু টেবিল, তার চারদিকে আসন পাতা। আমরা জাপানী প্রথায় হাঁটু মুড়ে বসলাম। ঘরে এলেন এক বৃদ্ধা। ইনি প্রয়াত পুরোহিতের স্ত্রী। সঙ্গে এল ফুলকাটা পোর্সেলিনের বাটিতে সবুজ "ওচা" অর্থাৎ চা আর সাদা বাতাসা জাতীয় প্রসাদ। হায়াশিদার পুত্রবধূ ছিলেন আমাদের সঙ্গে, উঠে গিয়ে বৃদ্ধাকে সাহায্য করলেন।

চায়ের বাটি নিয়ে সবাই টেবিল ঘিরে মাটিতে বসতে একটা আলোচনা বৈঠক আপনা থেকেই শুরু হয়ে গেল। রেনকোজি প্রসঙ্গে জাপানীদের দিক থেকে যা বক্তব্য তা ওঁরা খোলাখুলি বলতে চাইলেন। প্রথমেই বৃদ্ধ মোচিজুকির নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সপ্রশংস উল্লেখ করলেন সকলে। দৈবাৎ যে কাজের ভার ওঁর ওপর এসে পড়েছিল, যে কাজের ভার উনি মাত্র অল্পদিনের জন্য নিচ্ছেন ভেবেছিলেন, ঘটনাচক্রে আজীবন তাঁকে বইতে হয়েছিল সে দায়িত্ব।

যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। জাপান, বিশেষ করে টোকিও শহর বোমায় বিধ্বস্ত। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর। একদিন মাইহোজি মন্দিরের পূজারী মোচিজুকির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উনি মোচিজুকিকে এসে বলেন,

আজাদ হিন্দ সরকারের সুপ্রিম কম্যাণ্ডার, ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্য তিনি একটি ফিউনারেল অনুষ্ঠান করতে রাজী হবেন কিনা। তখন আমেরিকান অকুপেশন ফোর্স ল্যাণ্ড করে গিয়েছে। বড় কোন মন্দিরে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, কেউ রাজীও হবে না। একেবারে গোপন না হলেও খুব বেশী আড়ম্বর না করে একটু চুপচাপ এই অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। মোচিজুকি নিজে লিখেছেন—

"I felt that there was no boundaries for the dead and moreover, it was a duty of the Buddhist priest to perform services." উনি রাজী হয়ে গেলেন।

মোচিজুকির কথামত দিনটা ছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। প্রায় একশ জন উপস্থিত হন ছোট এই রেনকোজি মন্দিরে। সেপ্টেম্বরের আট তারিখ থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি মিঃ রামমূর্তির বাড়ীতে ছিল এই ভস্মাধার। ওঁর বাড়ীতেই সে সময় লীগের আপিসের কাজও চলত। আনন্দমোহন সহায়ের স্ত্রীর অনুরোধে একদিনের জন্য ওঁদের বাড়িতেও নিয়ে রাখা হয় এই আধার। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার সচিব আয়ার তখন রয়েছেন সে বাড়ীতে।

সেপ্টেম্বরের আট তারিখ থেকে আঠারই পর্যন্ত দশ দিন টোকিও ক্যাডেটের দল এই আধারের অতন্দ্র প্রহরায় থেকেছে। টোকিও মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্র এইসব কিশোর ছিল নেতাজীর একান্ত স্নেহভাজন। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, রেঙ্গুনে এরা যখন ইস্কুলের শেষ ধাপে, কেউ কেউ সবে ইস্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে, তখন নেতাজী নিজে এদের বাছাই করে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠান। দশ জন এয়ারফোর্স ট্রেনিং আর পঁয়ত্রিশ জন আর্মি ট্রেনিং। "টোকিও বয়েজ" নামে এরা পরিচিত। নেতাজী ওদের একবার চিঠি লিখেছিলেন—"আমার নিজের কোন ছেলে নেই, তোমরা আমার ছেলের মত।" এই সব ছেলেরা পালা করে রাত্রিদিন পাহারায় থেকেছে।

তারপর আঠারই সকালে মিসেস সহায়ের বাড়ী থেকে শোভাযাত্রা

রওনা হল রেনকোজি মন্দিরের দিকে। বয়সে সব চেয়ে ছোট ক্যাডেট ভিরিককে বেছে নেওরা হয়। তার গলা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কাঠের আধার। সঙ্গে হেঁটে চলে বাকী সব টোকিও ক্যাডেট, মিসেস সহায়, মিঃ রামমূর্তি, মিঃ আয়ার ও অন্যান্যরা। হবিবুর রহমানের সেইদিনই ডাক পড়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমেরিকান হেড কোয়ার্টারস-এ। তাই উনি থাকতে পারেন নি। দশ পনেরো জন জাপানী পদস্থ অফিসার ছিলেন। জাপান সরকারের পক্ষে ছিলেন লেঃ জেনারেল টাকাকুরা। প্রায় দু-মাইল হেঁটে মিছিল এসে পৌঁছয় রেনকোজিতে।

আরো পাঁচ জন পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে মোচিজুকি অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। ঘন্টাখানেক ধরে পূজাপাঠ চলে। রামমূর্তি পুরোহিতদের পূজাশেষে দক্ষিণা দেন। কাগজের মোড়কে মোড়া ছিল সেই ইয়েন বা জাপানী মুদ্রা।

সাধারণত এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর আত্মীয়-পরিজনরা নিয়ে চলে যান আধার। এক্ষেত্রে মিসেস সহায়, মিঃ রামমূর্তি ও একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে এসে মোচিজুকির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। যতদিন অন্য ব্যবস্থা করা না যাচ্ছে, উনি যদি এই ভার বহন করেন বড় ভাল হয়।

এই হল এই আধারের মন্দিরে অধিষ্ঠিত হবার ইতিহাস। এর আগে আছে তাইপে থেকে টোকিও পৌঁছবার কাহিনী। সে কাহিনী আগেও শুনেছি। তবুও সেদিন রেনকোজি মন্দিরে বসে আবার বললেন হায়াশিদা।

"'তাইপে'—তখন বলা হত তাইহোকু। সেখানে যুদ্ধের সময় জাপানী আর্মিতে জুনিয়র অফিসার ছিলাম আমি। একদিন হেডকোয়ার্টারস থেকে ডেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল ভারতীয় অফিসার কর্নেল হবিবুর রহমানের সঙ্গে টোকিও যেতে হবে আমাকে। আমি সোজা এসে হাজির হলাম এয়ারপোর্টে। যে এয়ারপোর্টে ক্র্যাশ হয়েছিল এটা কিন্তু সে এয়ার-পোর্ট নয়। তাইহোকু শহর থেকে একটু বাইরে ছোট একটি এয়ারপোর্ট। সেখানে এলেন হবিবুর রহমান আর সঙ্গে লেঃ কর্নেল সাকাই, ক্র্যাশ করা এরোপ্লেনের আর এক যাত্রী। একটি বোমারু বিমান দাঁড়িয়েছিল বিমান বন্দরে, তার গায়ে বড় করে সবুজ রঙের ক্রস আঁকা। সে দিনটি ছিল পাঁচই

সেপ্টেম্বর। হবিবুর ও সাকাই দু'জনেই বিমান দুর্ঘটনায় আহত। সম্পূর্ণ সুস্থ নন, হাতে ও মুখে ব্যাণ্ডেজ। গলা থেকে উত্তরীয় ঝুলিয়ে তাতে আমি বহন করলাম পবিত্র আধার।' আমাদের সঙ্গে দুটি কাঠের বাক্স ছিল। আমাকে বলা হয় ছোট বাক্সতে আছে ভস্মাধার। আর বড় বাক্সতে আছে নেতাজীর "ট্রেজার"। বিমান দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরে কুড়িয়ে পাওয়া আধপোড়া স্বর্ণ অলংকার, হীরে জহরৎ। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মেয়েরা একদা এ সব দান করেছিলেন নেতাজীর 'যুদ্ধ ভাণ্ডারে'।"

হবিবুর, হায়াশিদা, সাকাই সকলকে নিয়ে বিমান এসে নামল ফুকুওকার গানোসু এয়ারপোর্টে। বাক্স দুটি সেখানকার ওয়েস্টার্ন আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সে গচ্ছিত রেখে সে রাতটা ওঁরা ইচিগাওয়া কাইকোশা বা আর্মি ক্লাবে কাটালেন।

পরদিন হায়াশিদা বাক্স দুটি নিয়ে ট্রেনে চড়লেন। যুদ্ধের পর অস্বাভাবিক অবস্থা চারিদিকে। অকুপেশন আর্মি ল্যাণ্ড করছে। স্টেশনে স্টেশনে ভীত, সন্ত্রস্ত লোকের ঠেলাঠেলি, ভীড়। হায়াশিদার মনে হল, জাপানীরা যেন তাদের মজ্জাগত শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। যা হোক, ওঁর সঙ্গে ফুকুওকা থেকে তিনজন জাপানী সৈনিক দেওয়া হয়েছিল। কোন বিপদ হলে তারা রক্ষা করবে বাক্স দুটি। ট্রেজারের বড় বাক্সটা হায়াশিদা পায়ের কাছে বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। অন্যটি কোলের ওপর আঁকড়ে ধরে রইলেন সারা পথ।

পরদিন অর্থাৎ সাত তারিখে সন্ধ্যার সময় ওঁরা টোকিও পৌঁছলেন। ইম্পেরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছতে হায়াশিদার প্রায় রাত এগারোটা হয়ে যায়। অত রাত্রে বড় অফিসার কেউ ছিলেন না। ডিউটি অফিসার মেজর কিনোশিটাকে বাক্স দুটি বুঝিয়ে দিলেন হায়াশিদা।

পরদিন সকালে লেঃ জেনারেল টাকাকুরা অফিসে আসতেই মেজর কিনোশিটা বাক্স দুটি ওঁর হাতে সঁপে দেন। খবরটা শুনেই টাকাকুরা অন্য অন্য অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। ওঁরা সকলে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নেতাজীর উদ্দেশে। ইতিমধ্যে লেঃ কর্নেল সাকাই এসেছেন। ওঁরা

একসঙ্গে পরামর্শ করে ডেকে পাঠালেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি রামমূর্তিকে।

এই নিদারুণ দিনগুলির কথা আয়ার সাহেবের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। সায়গন থেকে টোকিও এসে পৌঁছলেন আয়ার বাইশে আগস্ট। সায়গন এয়ারপোর্টে যখন প্লেনে চড়তে যাচ্ছেন, প্রপেলরের গর্জনের মধ্যেই খুব আচমকা ওঁকে বিমান দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তেই তাইহোকু যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন উনি। ওঁর ধারণাও হয়েছিল জাপানীরা ওঁকে নিশ্চয় সেখানেই নিয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। এরোপ্লেন নামল তাইচু বলে এক জায়গায়। আয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্গী জাপানী অফিসারদের উনি বারবার বললেন—"আমাকে দেখতে দাও নেতাজীকে, আমাকে হবিবুরের সঙ্গে কথা বলতে দাও। নয়ত তোমাদের এই দুর্ঘটনার কথা কে বিশ্বাস করবে?"

অফিসাররা খুবই কাঁচুমাচু মুখ করে রইলেন। সেদিন ছিল বিশ আগস্ট। ওঁরা বললেন, এরোপ্লেন কোন পথে যাবে তার ওপর ওঁদের কোন হাত নেই। তাইচুতে নামতে নির্দেশ এল তাই ওঁরা এখানে নামলেন। এমনি করে বাইশে তারিখে আয়ার এলেন টোকিও। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টারস। এসেই জানতে চাইলেন, তাইহোকুর খবর আছে কোন? হবিব কেমন আছে? অফিসাররা বললেন, সরি, দু'দিন হল তাইহোকুর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের। মরীয়া হয়ে আয়ার আবার ওঁদের বললেন, তোমরা আমাকে তাইহোকু নিয়ে গেলে না, তোমরা এখন বলছ কোন খবর নেই, তোমাদের আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি, সারা পূর্ব এশিয়াতে বা ইণ্ডিয়াতে কেউ তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। শুনে ওঁরা অসহায় মুখ করে চেয়ে রইলেন। আর বারবার বললেন, আমরা খবর পাবার চেষ্টা করছি, কোন খবর এলেই আপনাদের জানাব।

ওঁদের পাওয়া খবর অনুসারে আঠারোই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে। আয়ার ওঁদের বললেন, তোমরা এখনো সেই খবর প্রকাশ করোনি কেন? তখন ওঁরা বললেন, আপনি ড্রাফট করে দিন কীভাবে এই নিউজ দেওয়া

হবে। সেখানে বসে নিউজ ডিকটেট করলেন আয়ার। পরদিন তেইশে আগস্ট জাপানের কাগজে ছাপা হল সেই খবর।

সেদিন থেকে রামমূর্তি ও আয়ারের কাজ দাঁড়ালো, রোজ একবার হেডকোয়ার্টারস-এ যাওয়া আর জিজ্ঞাসা করা, কোন খবর এল? রোজই হতাশ হতে হয়। হঠাৎ সেপ্টেম্বরের আট তারিখে ডাক পড়ল, খবর আছে, চলে আসুন।

সেদিন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী আয়ারের গলায় সাদা উত্তরীয় বেঁধে তার থেকে ঝুলিয়ে দিলেন কাঠের আধার জাপানী অফিসাররা। বাইরে একটি সেডান গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। সেই গাড়ীতে ওঁরা এলেন রামমূর্তির বাড়ী। একটা টেবিলের ওপর ধূপ জ্বেলে ফুল দিয়ে সেই আধার স্থাপন করা হল, তার ওপর রইল নেতাজীর ছোট একটি ছবি। টোকিও বয়েজরা ভার নিল সব কিছুর। আগেই একদিন ছেলেদের কাছে আয়ার ধীরে ধীরে দুঃসংবাদ বলেছিলেন। মিসেস সহায়ের বাড়ীর মেঝেতে ওরা বসেছিল। ওদের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন আয়ার। ওরা সব ছেলে-মানুষ। কেঁদে ফেলেছিল। আরো কয়েকটি ছেলে ছিল, তাদের ওঁরা বলতেন প্রোপাগাণ্ডা বয়েজ। টোকিও থেকে আজাদ হিন্দ রেডিওর যে ব্রডকাস্ট হত তার ভার ছিল এদের ওপর। এই প্রোপাগাণ্ডা বয়েজরাও আয়ারের কাছে শুনেছিল খবর।

আয়ার বলেছেন, যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন উনি। জাপানীরা বলে দিল হবিব এসে গেছে। রাত্রে যাবে আয়ারের কাছে। আয়ার ভাবতে বসলেন, একি! হবিব কি আমার কাছে ওয়েলকাম না আন্-ওয়েলকাম! যেটুকু ক্ষীণ আশা এখনো রয়েছে হবিব এসে সব কথা যখন বলবে তখন কি তা আর থাকবে! অনেক রাত্রে হবিব এল। মুখে ব্যাণ্ডেজ হাতে ব্যাণ্ডেজ। মিসেস সহায় আর আয়ার ঘটনার বিবরণ শুনলেন হবিবের কাছে। ওঁদের আর আশা করার কিছু রইল না।

রেনকোজি মন্দিরে 'ওচা'তে চুমুক দিয়ে জেনারেল কাটাকুরা হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরে গমগম ক'রে বলে উঠলেন, একটা কথা তোমাদের

জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি। কী কথা তা উনি জিজ্ঞাসা করার আগেই আমি বুঝে গেলাম। কারণ এই একই কথা জাপানে অনেকবার অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের। তাই দোভাষী যখন তুর্জমা করে বুঝিয়ে দিলেন কাটাকুরার প্রশ্ন তখন একটুও অবাক হলাম না। উনি বলছিলেন, 'তোমরা কি এর কোন ব্যবস্থাই করবে না?' তোমাদের এত বড় নেতা, এত বড় স্বাধীনতা যোদ্ধা, তাঁর এই শেষ স্মৃতি তোমরা কি উপযুক্ত মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না ভারতবর্ষে? দূর বিদেশের এক মন্দিরে ফেলে রেখে দেবে চিরদিনের মত? আশ্চর্য তোমাদের বিচার।'

ওঁর কথার মধ্যে একটা অধৈর্যের সুর ছিল। ফুজিয়ারা আমাকে নীচু গলায় বললেন, 'প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড। ইউ নো হি ইজ এ সোলজার।' উনি একজন পোড়-খাওয়া সৈনিক, সেন্টিমেন্টের ধার ধারেন না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলা পছন্দ করেন। সত্যিই এই তিন জেনারেলের মধ্যে ফুজিয়ারা হলেন সোলজার আর ডিপ্লোমেট মেশানো। জেনারেল আরিস্যুয়েকে আমরা বলতাম 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান'। সৈনিকের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাসিখুসি, আমুদে চরিত্র। কিন্তু কাটাকুরার চরিত্রে আছে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। গোলমুখ, টাকমাথা মিলিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণের মত চেহারা। কিন্তু ভেতরে আছে লৌহ-কঠিন সৈনিক। কাটাকুরা ইম্ফল যুদ্ধের সময় ছিলেন জাপানের 33rd Army চীফ। তার আগে বর্মা এরিয়াতে চীফ অব জেনারেল স্টাফ। রেঙ্গুনে ১৯৪০ সালের জুলাই-এর শেষে নেতাজীর সঙ্গে ওঁর প্রথম দেখা। উনি খুব আবেগপ্রবণ। নিজেই বলেছেন, নেতাজী যখন ওঁর দেশের বিপ্লবের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ওঁদের কাছে বলছিলেন, তখন কাটাকুরার রক্ত গরম হয়ে উঠছিল আর চোখ থেকে জল পড়ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় কাটাকুরাকে ধরে আনা হয় লাল-কেল্লায়। আই এন এ অফিসাররা যখন মুক্তি পেলেন, ভারতবাসী কেমন আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিল কাটাকুরার মনে গেঁথে আছে সে দৃশ্য।

কাটাকুরা আবারও বললেন, ভারতবর্ষ থেকে যাঁরাই এসেছেন, ঘুরে গেছেন এই মন্দিরে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

নেহরু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কিছুকাল আগে এসেছিলেন সে সময়ের বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। সকলেই আসেন যান কিন্তু কিছু আর ঘটে না। অনির্দিষ্ট কাল কি এইভাবে চলবে ?

ফুজিয়ারা তাড়াতাড়ি বললেন, ভারতবর্ষে এই ব্যাপারে কিছু অসুবিধা আছে। আমি অনেকবার গিয়েছি ভারতবর্ষে, তাই ওঁদের মানসিকতা জানি। এখনো এমন অনেকে আছেন ওদেশে, যাঁরা বিশ্বাস করেন না উনি আর নেই। সাধারণ মানুষেরা অনেকে আশা নিয়ে আছেন, উনি একদিন ফিরে আসবেন, সেদিন দুঃখদুর্দশা ঘুচে যাবে ওঁদের।

কাটাকুরা এ কথায় কিছু বিরক্তি আর উষ্মা প্রকাশ করলেন। কী আশ্চর্য। তবে তো ভারত সরকারের আর নেতৃস্থানীয়দের সাধারণ মানুষকে আরোই বোঝানো উচিত। একটা মিথ্যা আশায় রেখে দেবেন নাকি ওঁদের। মানুষ তো অমর নয়। আরো দশ বছর, পনেরো বছর ওঁরা কী একই কথা বলে চলবেন। ঘটনার পর পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেছে, এখন ভারত সরকারের ও ভারতবাসীর উচিত মন শক্ত করে দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসা।

এইসব কথার ফাঁকে নবীন পুরোহিত ও তাঁর মা ডাঃ বসুর আগের বার মন্দিরে আসা সম্পর্কে কী যেন বললেন। কাটাকুরা আজ যে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি কিছুই করবে না—পনেরো বছর আগে বৃদ্ধ পুরোহিত মোচিজুকি সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন ডাঃ বসুকে। বলেছিলেন, চেয়ে ছাখো, আমি বুড়ো হয়েছি, আর কতদিন আগলাবো ? বৃদ্ধের কথায় বিচলিত হয়ে উনি বলেছিলেন, আপনি যদি বলেন আমি ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলব। যতদিন আমার দেশবাসী আর আমার সরকার কোন সিদ্ধান্তে না আসতে পারছেন, এই আধার দূতাবাসে রাখতে পারা যায় কিনা।

এর জবাবে বৃদ্ধ পুরোহিত সোজা ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তোমার দূতাবাস কি নিত্য পূজা করবে আমি যেমন করি ? তারা কি নিষ্ঠাভরে প্রার্থনা করবে প্রতিদিন ?

এর উত্তর ওঁর জানা ছিল না। পুরোহিত বললেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আমি তো চিরদিন থাকব না। তোমরা দ্রুত

সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করো।

বৃদ্ধ পুরোহিত আগেই জানতে চেয়েছিলেন, এই আধার খুলে উনি দেখতে চান কিনা। উনি জানিয়েছিলেন দেখতে চান। আগে না জানা থাকলে এর ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ আধার খুলতে হলে সারাদিন ধরে পূজা, উপাসনা করতে হয়। মোচিজুকি সব আচার পালন করে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেদিন ওঁর সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক বন্ধু ইয়োকোবরি। ইয়োকোবরির পরামর্শমত পথ থেকে কিনে নিয়েছিলেন কিছু ফুল ও ফল। একটি সুন্দর, ছোট কাঠের প্যাগোডা বসানো আছে বেদীতে। তার মধ্যে একটি বড় আধার। আবার তার ভেতরে আর একটি ছোট আধার। এই ছোট আধার সাদা কাপড়ে মুড়ে রাখা, তার গায়ে ইংরেজী ব্লকলেটারে লেখা আছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।

সাদা কাপড়ের মোড়ক খুলতে খুলতে বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, তুমি হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আমি এই আধার খুলে দেখালাম। প্রথম জন ছিলেন তোমাদের আগেকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

মন্ত্রোচ্চারণ করে পুরোহিত ঢাকা খুলে দিলেন আধারের।

রেনকোজি মন্দিরে আমাদের আলোচনা বৈঠকও শেষ হয়ে আসছিল। বাইরে তখনো বিকেলের আলো। কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। নবীন পুরোহিত উঠে আলো জ্বেলে দিলেন। আমাদের ডাক দিলেন, ভিতরের ঘরে আসুন। একটা বড় হলঘর পার হয়ে পাশে ছোট একটি ঘর। উঁচু একটি কাঠের বেদীর উপর সেই ছোট প্যাগোডা, তার মধ্যে কাঠের আধার। দু'পাশে নেতাজীর দুটি ছবি। দুদিকে ফুলদানীতে রঙীন ফুল। সামনে দীপদানের ওপর মোমবাতি জ্বলছে, আর একটা গোল কাঠের বাটিতে গুঁজে রাখা একগুচ্ছ ধূপ। আর আছে ভিজিটরদের নাম সই করার খাতা। ঘরের অন্য কোণের তাকে কয়েকটি বই, বোধ হয় ধর্মগ্রন্থ রাখা আছে। ধূপধুনো, মোমবাতি, ফুল সবকিছু মিলে আমাদের পুজোর ঘরের মতই পরিবেশ। মোচিজুকির হাতে জড়ানো একটি জপমালা, মনে হল উনি জপ করছেন।

মন্দিরের ঠিক বাইরে চত্বরে একটি কালো পাথরের স্তম্ভ বসানো হয়েছে, তার ওপর খোদাই করা আছে নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—অবশ্য জাপানী ভাষায়। এই স্মারক স্তম্ভটি নতুন হয়েছে, আমাদের দেখালেন পুরোহিত।

কোন এক সময় জেনারেল আরিসূয়ে কোমল গলায় বললেন, আজ এই যে 'অ্যাশেজ' নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা, এতে তোমরা মনে দুঃখ পেও না যেন। আমাদের দিকটাও একবার বুঝতে চেষ্টা করো। আজ এত বছর ধরে একটা মনগড়া কাহিনী বলে গিয়ে জাপানের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে ? তা ছাড়া আমরা যারা নেতাজীর সহযোগী ছিলাম, তারা চাই আমরা বেঁচে থাকতে এই হস্তান্তর হয়। একবার ভেবে দেখো এখন কতজন আর নেই—তোজো নেই, শিগোমিৎসু নেই, কাওয়াবে নেই, মুতাগুচি নেই। এমন কি শিবুসাওয়া বা মিসেস এমোরিও নেই। হাচিয়া চলে গেলেন অল্পদিন আগে। থাকার মধ্যে পড়ে আছি আমরা তিন বৃদ্ধ আর রোগ-শয্যায় ইসোডা। আমাদের মধ্যেও কে কখন চলে যাব কে জানে! আমরা নেতাজীকে যত ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, পরের জেনারেশন তা করবে কিনা কে জানে। তারা তো দেখেনি কত বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন উনি!

ফুজিয়ারাও যোগ দিলেন—তোমাদেরও একটা জেনারেশন চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া যা কিছু করতে হবে তা হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। জাপান সরকার কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতে প্রস্তুত। এখন তোমাদের সরকার এগিয়ে আসবেন কিনা তারই প্রতীক্ষা।

বৃদ্ধ মোচিজুকির স্ত্রীকে আর নবীন পুরোহিতকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রেনকোজি মন্দির তার স্মৃতিভার নিয়ে পিছনে পড়ে রইল।

॥ ১১ ॥

ফুজিয়ারা কয়েকদিন থেকেই বলছিলেন, চলো, এবার তোমাদের দেখাব —সোলজার অব এ ডিফিটেড কান্ট্রি—যুদ্ধে হেরে যাওয়া দেশের সৈনিক কেমনভাবে থাকে। জাপানের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার অপমান আর গ্লানির কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না জাপানীরা। আর ফুজিয়ারার মত প্রবীণ, দেশপ্রেমিক অফিসাররা তো নয়ই। জাপানের আত্ম-সমর্পণের খবর যখন এল, ফুজিয়ারা তখন অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন ফুকুওকার হাসপাতালে। নার্সের কাছ থেকে চেয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড কাছে রাখলেন। শত্রুর হাতে অপমান হবার সম্ভাবনা দেখলেই ওটাকে কাজে লাগাবেন। কিছু-কাল পরে সমন এল ওঁর নামে। দেখা গেল দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারে সাক্ষ্য দিতে হবে ওঁকে। আমেরিকান এরোপ্লেনে চড়ে দিল্লির পথে রওনা হবার আগে পটাসিয়াম সায়নাইডের প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উনি। থাক, ভাগ্যে যা আছে তার মুখোমুখি হবেন, পালিয়ে যাবেন না।

আমরা যতদিন জাপানে রইলাম, ভোর থেকে গভীর রাত অবধি ফুজিয়ারা আমাদের সঙ্গী, মিসেস ফুজিয়ারাও যাওয়া-আসা করছেন সব সময়। কিন্তু টোকিও শহরের এক প্রান্তে ওঁদের বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের তখনো। সে কথা বলতে গিয়েই ফুজিয়ারা পরাজিত দেশের সৈনিকের প্রসঙ্গ তুললেন।

আমি বললাম, কী এত ডিফিটেড কান্ট্রি বলছেন বার বার। পরাজিত দেশ জাপানের অর্থনীতিক সমৃদ্ধি আজ পৃথিবীর অনেক দেশের ঈর্ষার বস্তু। বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যায় কোথায় এগিয়ে গিয়েছে জাপান। সত্যি, কীভাবে যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশকে আবার গড়ে তুলেছে এরা, দেখলে এ জাতকে

শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। যা হোক, তখনি ঠিক হল একদিন ফুজিয়ারা পরিবারের সঙ্গে বসে জাপানী ডিনার খাব আমরা।

তার আগে একদিন সকালবেলা ঝকঝকে কাচে মোড়া, খুব চমকপ্রদ স্থাপত্য, জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রাসাদে এসে নামলাম আমরা। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন কাকিৎসুবো আর আরিসুয়ে। মনে মনে বেশ আশ্চর্য লাগছিল। জাপানের ফরেন অফিস বা 'গাইমোশু'র সঙ্গে নেতাজীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। অবশ্য আজকের এই ঝলমলে বাড়ি সেদিনকার সে বাড়ি নয়। তবুও চারদিকে চেয়ে দেখলাম সেকালের মানুষ তো রয়েছেন কেউ কেউ। আরিসুয়ে সেদিন ছিলেন চীফ অব নাম্বার টু সেকশন। ইনফরমেশন বিভাগ ছিল ওঁর। নেতাজী এসে পৌঁছনো মাত্র ইম্পিরিয়াল হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন। ফরেন অফিসের সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগের ভার আরিসুয়ের ওপরেই পড়েছিল। আর কাকিৎসুবোকে পররাষ্ট্র দপ্তর দিয়েছিলেন নেতাজীর দোভাষীর কাজ। ওঁর কেম্ব্রিজের ইংরেজী নিশ্চয় কাজে লাগল। পরে আবার উনি হলেন আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে যুক্ত জাপানী দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি। ফুজিয়ারা তো সেই ১৯৪২ সাল থেকে ইন্দো-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানারকম ডেলিকেট নিগোশিয়েশন করে চলেছেন। ফুজিয়ারা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, জেনারেল কাটাকুরা এসে যোগ দিলেন।

লিফটে করে উপরে উঠে এলাম সদলবলে। পররাষ্ট্র দপ্তরের এশিয়া বিভাগ। এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স-এর ডিরেক্টর-জেনারেল কেনসুকে ইয়ানাগিয়ার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে। এশিয়া বিভাগের দরজায় কোজি ওয়াটানাবে ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কোরিয়া নিয়ে একটা কনফারেন্স চলছিল। ইয়ানাগিয়া সামান্য দেরী করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলেন। ইণ্ডিয়া ডেস্ক-এর সুজুকি এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। সবাই চেয়ার টেনে বসামাত্র 'ওচা' এসে গেল।

প্রথমেই একপ্রস্থ আনুষ্ঠানিক সৌজন্য বিনিময় হল। যুদ্ধের দিনগুলিতে ভারতবর্ষ ও জাপানের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কথা ওঁরা উল্লেখ করলেন।

স্মরণ করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কাক্কার (হিজ এক্সেলেনসি) ব্যক্তিত্বের কথা। আমাদের এই সফরের ফলে ইন্দো-জাপান বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে এমন আশাও ব্যক্ত করলেন। আমরা যথাযোগ্য উত্তর দিলাম। বললাম, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওঁদের সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আমরা।

এরপর সাধারণভাবে তু' দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু কথা হল। ঘটনাচক্রে আমরা এমন এক সময়ে জাপানে ছিলাম যখন তু'দেশেই বেশ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে, আবার এই অনিশ্চয়তা দূর হবে এমন আশাও দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে তখন সামনে ইলেকশন।

"সো মিসেস গান্ধী ইজ কামিং ব্যাক ?"—ওঁরা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন। এদিকে ওদের শাসক দলের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে তখন নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ চলছিল। তাই আমরাও হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের কী অবস্থা ?

ফরেন অফিসের জন্য আমরা একটি নেতাজীর চিত্রজীবনী নিয়েছিলাম। সেটা টেবিলে রাখা মাত্র অন্য ঘরের সকলে যার যার ডেস্ক ছেড়ে এসে ভিড় করলেন, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বইয়ের ওপর।

ইতিমধ্যে ইয়ানাগিয়া একটু গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন—একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। ব্যস, আর কিছু বলার আগেই বুঝে গেলাম প্রসঙ্গটা কী ? উনি বললেন, তোমাদের কী মনে হয় না এখন সময় হয়েছে—নেতাজীর জন্য একটা হিরোর মত হোম-কামিং-এর কথা চিন্তা করা উচিত ? জাপান পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তোমাদের হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে এই আধার, এখন তোমাদের দেশবাসী এগিয়ে এলে আমরা পরিপূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদায় ফিরিয়ে দিতে পারি তোমাদের জিনিস। আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, জাপান গভর্নমেন্ট তোমরা যেমনভাবে চাইবে তেমনভাবে সব ব্যবস্থা করবে। নেতাজীর স্মৃতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেবে জাপান।

ফুজিয়ারা ধীরে ধীরে আবার বোঝালেন অসুবিধা কোথায়। ওঁর ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে উনি যা বুঝেছেন বললেন। জাপানীরা

কিছুতেই বুঝতে পারে না এই নিয়ে কিসের এত দ্বিধা, কিসের সংশয়, বরং ভাবে যে, আমরা নেহাৎ-ই হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ। জেনারেল কাটাকুরা আবার দৃঢ়ভাবে ওঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। ওঁর মতে একটা উইশফুল থিংকিং আর অলীক স্বপ্নকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভারতবাসীকে বোঝানো উচিত যাতে ওঁরা সাহসের সঙ্গে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারেন। ভারতবাসীকে পথ দেখাবার জন্য আছে নেতাজীর আদর্শ, তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাতে নবীন নেতৃত্ব নিজে থেকেই দেখা দেবে।

আমাদের লাঞ্চও হল ফরেন অফিসের কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে। আগেই কথা হয়েছিল, 'সেভেনথ্ হেভেন' নামে চীনা রেস্তোরাঁতে খাওয়া হবে। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে 'সেভেনথ্ হেভেন' খুব দূর নয়। আবার আমরা যেখানে আছি সেই ইন্টারন্যাশনাল হাউজ অব জাপান থেকে বেশ কাছে। আমরা হেঁটে চলে গেলাম। জাপানীদের মত আলোর সিগন্যাল দেখে খুব সুশৃঙ্খলভাবে রাস্তা পার হলাম। এপারে এসেই দেখি ফুজিতা আসছেন দৌড়তে দৌড়তে।

'অসুবিধা হয়নি তো কোন? পথ চিনতে পারলে?' অবশ্যই বাংলাতে কথাবার্তা শুরু হল। 'এস্রাজ বাজানো আর রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা কেমন চলছে?' জানতে চাইলাম আমরা। কলকাতার জন্য খুবই 'হোম সিক্' হয়ে আছেন ফুজিতা। আমাদের কলকাতা শহরকে সকলেই তো দূরছাই করে, তাই বিদেশীর কলকাতা প্রেম দেখলে আমাদের খুব ভাল লাগে। কলকাতা কনস্যুলেট থেকে বদলি হয়ে আসার পর ফুজিতা এখানে পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশ ডেস্কে আছেন।

সেভেনথ্ হেভেনে ঢুকে দেখলাম টাকাসু অপেক্ষা করছেন। টাকাসু কলকাতায় কনসাল জেনারেল ছিলেন বেশ কিছুকাল। এখন এখানে ফরেন অফিস আর্কাইভস্-এর ডিরেক্টর। শুনে খুব খুশি হলাম। কারণ ওঁদের আর্কাইভস-এর দিকে আমাদের সব সময় নজর। টাকাসু হেসে বললেন, কোন অসুবিধা নেই, যা চাইবে বলবে। ইণ্ডিয়া ডেসক্-এর সুজুকিও আছে দেখলাম, ফরেন অফিসের ভীড়ে ভাল করে আলাপ হয়নি, এখন হল।

আমরা গোল খাবার টেবিলের চারপাশে বসলাম। মাঝখানে টার্ন টেবিলে খাবারদাবার একের পর এক রেখে যাচ্ছে আর সবাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। রোজই জাপানী লাঞ্চ ডিনার খাচ্ছিলাম, তাই মুখ বদল ভালই লাগল। এবারের এই ভ্রমণের সময় নানারকম চীনে খাবার খেলাম বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়। হংকং-এ একরকম, জাপানে আর এক রকম, পরে ফরমোসাতে আবার অন্য একরকম। সব জায়গাতেই কিন্তু দেখলাম এদের পদ অগুণতি থাকে। সতেরো আঠারো রকম পদ খাইয়ে এরা খুবই বিনয় করে বলে খাওয়া-দাওয়া বড় কম হল। অন্তত একুশ-বাইশ পদ না হলে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

ডিপ্লোমেটদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নেতাজীর কথা উঠে পড়ছিল। বিশেষত আর্কাইভস্-এর কাগজপত্র থেকে আমরা নেতাজীর তিনবার টোকিও সফর সম্পর্কে কী জানতে পারি সে কথা হল।

তৃতীয়বার টোকিও সফরের সময় নেতাজী জাপানের সম্রাটের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে দেখা করেছিলেন। ৬ নভেম্বর ১৯৪৪ ছিল গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেনসের প্রথম বার্ষিকী। কাগজপত্রে দেখছি, সেদিনই নেতাজীর সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাৎকার। এর কোন ছবি নেই। যতদূর মনে হল সম্রাটের সঙ্গে ছবি থাকা বোধ হয় রীতিসম্মত নয়। কারণ ছবিতে দেখতে পাচ্ছি নেতাজী মোটর গাড়িতে বসে আছেন—গোয়িং টু মীট দি এমপেরর—নাম সে ছবির। ডোমেই নিউজ এজেন্সি খবর দিচ্ছে 'ইমপিরিয়াল অডিয়েন্স' হয়ে যাবার পর নেতাজী বলছেন :

"This is an honour not only to myself but also to all freedom loving Indians who are fighting for the liberation of their motherland."

সেবার নেতাজী টোকিও এসে পৌঁছলেন ১লা নভেম্বর। কাগজপত্রে দেখতে পাচ্ছি, হানেডা বিমানবন্দরে ওঁকে অভ্যর্থনা করতে উপস্থিত আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেমিৎসু। ভারতীয়দের মধ্যে চুয়াল্লিশ জন টোকিও ক্যাডেট রয়েছে, হাতে তাদের তেরঙা পতাকা।

পরদিন থেকেই কাজে নেমে পড়েছেন নেতাজী। জেনারেল স্থগিয়ামা তখন যুদ্ধমন্ত্রী আর জেনারেল উমেজু চীফ অব আর্মি। এই দুই জেনারেল একসঙ্গে হয়ে পরদিন লাঞ্চ দিলেন নেতাজীর সম্মানে। ডিপ্লোমেটিক খানা-পিনার খবর আরো পাওয়া যাচ্ছে কাগজপত্রে। নূতন প্রধানমন্ত্রী কয়মো ব্যাংকোয়েটের আয়োজন করলেন নেতাজীর জন্য। সেই ব্যাংকোয়েটে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তোজো। উনি ইউনিফর্ম পরে

NETAJI GRANTED IMPERIAL AUDIENCE YESTERDAY

Tokyo, November 6 (Domei)—TENNO HEIKA graciously granted audience to Netaji Subhas Chandra Bose, Head of the Provisional Government of Free India, at 10.30 a.m. today at the Imperial Palace.

Netaji Bose, who is now visiting here for the purpose of consolidating collaboration between Nippon and Free India, during the audience voiced his heartfelt gratitude toward Nippon's unstinted assistance for the emancipation of the British-oppressed Indian people.

'আজাদ হিন্দ' পত্রিকায় নেতাজী ও জাপানের সম্রাটের সাক্ষাৎকারের খবর

ছিলেন না, উনি আসেন 'ইন মুফটি'। নেতাজী গ্রেটার ইস্ট এশিয়া পরিকল্পনায় তোজোর কাজের কথা উল্লেখ করতে ভুললেন না।

আর একটি ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেমিৎস্থ। এই ডিনারেও সব হোমরাচোমরা ব্যক্তি উপস্থিত। অন্যান্যদের মধ্যে দেখছি ব্যাংক অফ জাপানের গভর্নর শিবুসাওয়া আছেন, আছেন জাপান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ওকুমা। নেতাজী টি-পার্টি দিলেন একদিন, তাতে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সবাই এলেন। তোজোও উপস্থিত ছিলেন।

এইসব ডিপ্লোমেটিক রিসেপশনের ফাঁকে ফাঁকে নেতাজী কাজ আদায় করে নিলেন অনেক। একটা ভালমত লোন এগ্রিমেন্ট—ঋণ চুক্তি সই

করলেন। উনি চাইতেন এসব ব্যাপার ফর্ম্যাল হবে। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুহূর্তে জাপান যেন এই ঋণ দেওয়া নিয়ে কোন গোলমাল সৃষ্টি করতে না পারে। একথা জাপানীরা তাদের নিজেদের ডকুমেণ্টেই বলছে।

সবচেয়ে নেতাজীর বড় জয় হল যখন জাপান গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করবে স্থির করল। এতদিন হিকারি কিকানের মারফত কাজ চলত। কিকানের চীফ তখন ইসোডা। এখন ঠিক হল ইসোডা থাকবেন কিন্তু রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারে জাপানের রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবেন হাচিয়া।

নেতাজী টোকিওতে থাকার সময় দুটি দুঃখের ঘটনা ঘটল। সেনডা মারা গেলেন। সেনডা ছিলেন আর্মিতে চীফ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। নেতাজীর সঙ্গে সেই প্রথম পদার্পণের সময় থেকে পরিচয়। সেনডার অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত রইলেন নেতাজী। চীনের প্রেসিডেণ্ট ওয়াং মারা গেলেন এই সময়। ওয়াং সেই গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেনসের সময় থেকে নেতাজীর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁর নিমন্ত্রণেই চীন সফরে গেলেন নেতাজী। ওয়াং-এর মৃত্যুর খবরে নেতাজী মাদাম ওয়াংকে শোকবার্তা পাঠালেন। ওঁদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে কাগজে বিবৃতি দিলেন।

হিবিয়া হল-এ বিখ্যাত বক্তৃতা হয়ে গেল ৩রা নভেম্বর। নেতাজী বক্তৃতায় উল্লেখ করতে ভুললেন না এটি একটি শুভদিন, সম্রাট মেইজির জন্মদিবস।

জাপানী ডকুমেণ্ট বলছে, যত কাজই থাকুক না কেন নেতাজী কিছুতেই ভুলবেন না টোকিও বয়েজদের কথা। ঠিক সময় করে ওদের হোস্টেলে গিয়ে হাজির। এরা যে ওঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এদের উনি তৈরী করছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য। এই সংগ্রামে ওদের জড়িত হবার দরকার নেই। এ হল ওদের প্রস্তুতি পর্ব। এক এক করে ডেকে খোঁজ নিলেন সব ছেলেদের। নিজেদের পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূর বিদেশে রয়েছে অল্পবয়সী ছেলের দল। কঠিন মিলিটারি ট্রেনিং চলছে ওদের। জাপানী ডকুমেণ্ট সাধে কী বলেছে, নেতাজী ছিলেন ওদের মায়ের মত।

অবশ্য কার যে মায়ের মত ছিলেন না তাই ভাবি। কর্নেল সায়গল গল্প

করছিলেন ওঁর ফ্রন্টে যাবার দিনের কথা। উনি ছিলেন রেঙ্গুনে নেতাজীর মিলিটারি সেক্রেটারি, নিত্যদিন ঘনিষ্ঠ যোগ। তারপর সময় হল—যুদ্ধে যেতে হবে। মেহবুব আহমেদ এলেন ওঁর জায়গায় মিলিটারি সেক্রেটারি হয়ে। ফ্রন্টে যাবার আগে গুডবাই বলতে গেছেন ওঁর স্যুপ্রিম কম্যাণ্ডারকে। গুডবাই বলবেন কী! নেতাজী তো কেঁদে আকুল। সায়গল বলছেন, আমি তো সৈনিক, সেন্টিমেণ্ট থাকতে নেই, তবুও কেমন যেন হয়ে গেলাম। খানিক পরে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমি ওঁর পিঠে হাত রেখে বলছি—আপনি কাঁদবেন না, প্লিজ স্যার, আপনি কাঁদবেন না।

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করতে ভুললেন না নেতাজী। সেটাই হল শেষ দেখা।

নেতাজী এই শেষবার জাপান সফরে আসবার আগেই সম্রাট প্রস্তাব পাঠান ওঁকে 'অর্ডার অব দি রাইজিং সান' উপাধি দিতে চেয়ে। এ গল্পের একটা দিক কর্নেল সায়গলের কাছে শুনেছিলাম। রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তরে একদিন টেলিফোন বাজছে। মিলিটারি সেক্রেটারি সায়গল ফোন ধরলেন। জাপানী সদর দপ্তর থেকে ফোন করছেন ওদিককার অফিসার। টোকিও থেকে খবর এসেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে 'অর্ডার অব দি রাইজিং সান' উপাধি দেওয়া হবে। ফোনটা ধরিয়ে রেখে কর্নেল সায়গল নেতাজীকে খবরটা দিতে গেলেন। খবরটা শুনে এক কথায় নাকচ করে দিলেন নেতাজী। উনি দৃঢ়ভাবে বললেন, আগে দেশ স্বাধীন হোক, আমরা নিজেদের খেতাব সৃষ্টি করি, যে খেতাব ভারতবাসী এবং কখনো কখনো বিদেশীকেও আমরা দিতে পারব। তার আগে আমি এই সম্মান নিতে পারব না।

কর্নেল সায়গল হাসতে হাসতে বললেন, আমি তো এই মেসেজ টেলিফোনে ওদিকে আমার কাউণ্টারপার্টকে দিলাম। সে তো শুনে আঁতকে উঠল। কী সর্বনাশ! তোমরা রিফিউজ করবে নাকি? তাহলে এসো তুমিও হারাকিরি করো, আমিও করি। সায়গল বললেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি করো, আমি ওর মধ্যে নেই।

অবশ্য নেতাজী যখন এই সম্মান গ্রহণ করার অক্ষমতার কথা জানালেন তখন বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে আর ভালভাবে বুঝিয়ে সব লিখলেন।

টোকিও শহর থেকে ফুজিয়ারার বাড়ী লম্বা ড্রাইভ। গাড়ীতে যেতে যেতে ইসোডার খোঁজ নিচ্ছিলাম। উনি থাকেন টোকিও শহরের বাইরে। খুব অসুস্থ খবর পেয়েছি। এবার বোধ হয় ওঁর সঙ্গে দেখা হল না। কলকাতায় যখন এসেছিলেন তখনি খুব বৃদ্ধ আর অসুস্থ মনে হয়েছিল। মিসেস ইসোডাও ছিলেন সঙ্গে। বেশ মনে পড়ে, কলকাতায় সেবার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম উদ্বোধন হল। নেতাজীর নামে স্টেডিয়াম শুনে ওঁরা খুব খুশি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে মিঃ ও মিসেস ইসোডা উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২, ইসোডা ওয়াশিংটনে জাপানী দূতাবাসে মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলেন। কলকাতায় নেতাজীর কথা বলতে গিয়ে উনি নেতাজীকে জাপানের পৌরাণিক রণদেবতা 'আকারা'র সঙ্গে তুলনা করছিলেন। ১৯৪৪ সালের গোড়ায় 'হিকারি কিকান'-এর ভার নেবার পর থেকে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট সায়গন বিমানবন্দরে গুডবাই বলা পর্যন্ত ইসোডার সঙ্গে নেতাজীর যোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

ফুজিয়ায়া বললেন, বাড়ীতে পৌঁছে ওঁকে ফোন করা যাক। অন্তত ফোনে কথা হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে।

একটা নিরিবিলি জাপানী পাড়ায় ছোট দোতলা কাঠের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। জাপানী বাড়ী দেখলে মনে হয় যেন ডলস্ হাউস। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ফুজিয়ারা, সঙ্গে দুই মেয়ে নোবুকো আর মিউকি। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ী খুব দূরে নয়। আমরা আসব বলে আজ এসে রয়েছে বাপের বাড়ীতে। ছোট মেয়ে ইতসুকোর শ্বশুর-বাড়ী দূরে, সে আসতে পারেনি। ফুজিয়ারার ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ আছে, মৃত্যুশোক আছে। উনি যখন ফ্রন্টে যুদ্ধ করছেন দুই মেয়ে নোবুকো আর মিউকিকে রেখে, প্রথমা স্ত্রী মারা যান। অনেকদিন পর, যুদ্ধ থেমে যাবার

বেশ কিছুকাল বাদে বর্তমান মিসেস ফুজিয়ারাকে বিয়ে করেন উনি। ওদের মেয়ে ইতসুকো। না জানলে একটুও বোঝার উপায় নেই বড় দুটি মেয়ে ওঁর নিজের নয়। বাবা, মা ও মেয়েরা মিলে সুখের সংসার।

জুতো খুলে চটি পরে বসার ঘরে ঢুকলাম। একটা সোফা, গোটা দুই চেয়ার, একপাশে কাঁচের আলমারী। এই একটি ঘরে একটু পাশ্চাত্য প্রথায় সাজানোর ছাপ। অন্য সব ঘর পুরোপুরি জাপানী অর্থাৎ ফার্নিচার বর্জিত, একেবারে খালি। দুই মেয়ে খুব মিশুকে, হাসিখুসি। ইংরেজিও বলতে পারে। তবে লজ্জা পাচ্ছিল, 'ব্রোকেন ইংলিশ' জানে শুধু। হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল নাতনীরা, ছোট ছোট জাপানী পুতুল। ওদের চার জনের নাম চিকা, কানা, চিহারু আর ইয়োকো। একটা করে আসন নিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে গেল ওরা। ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেই ওরা হেসে কুটিপাটি। আর যত হাসে, চোখ সরু হতে হতে হারিয়ে যায়।

মেয়েরা চা নিয়ে এল। না, জাপানী চা নয়। ভারতীয় চা, খাঁটি দার্জিলিং চায়ের গন্ধে মনটা খুশি হয়ে উঠল। ফুজিয়ারাকে বলা যায় তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয়। আমরা চায়ে চুমুক দিলাম, ফুজিয়ারা তখন পাশের ঘর থেকে ইসোডার টেলিফোন লাইন পাবার চেষ্টা করছেন। আমি ফুজিয়ারার বাড়ী ঘুরে দেখতে চাই শুনে ওরা হেসেই অস্থির। দেখার আবার কী আছে। যা হোক, কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এলাম। সিঁড়িটা অনেকটা কাশ্মীরের হাউস-বোটের সিঁড়ির মত। ওপরে ওদের শোবার ঘর। খাঁ খাঁ করছে খালি ঘর। কাঠের মেঝেতে মাদুর বা পাটির মত বিছিয়ে রাখা। ঘরের এককোণে মাটিতে বসানো টেলিভিশন।

হাতের তেলোয় মাথা কাত করে রেখে ইঙ্গিতে মিসেস ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমোন কোথায়? উনি একগাল হেসে একদিকের দেওয়ালে হাত দিয়ে কাঠের স্লাইডিং দরজা সরিয়ে দিলেন, ভেতরে ধপধপে সাদা লেপের মত কী রয়েছে। শোবার আগে পেতে নেওয়া হয়। অনুমান করলাম জামাকাপড়ও নিশ্চয় লুকনো আছে অন্যদিকের দেওয়ালের আড়ালে। কী অনাড়ম্বর আর নিরাভরণ সব ঘর। দেখে খুব

ভাল লাগল। মনে মনে তখন ঠিক করে ফেললাম, কলকাতায় গিয়েই ফেলে দেব সব জঞ্জাল—বইয়ের স্তূপ, কাপড়চোপড়ের রাশি আর তিন জেনারেশনের তিন রকম ফার্নিচারের জগাখিচুড়ি। সব খালি ঘর থাকবে, তাতে মাদুর বা পাটি পেতে রাখো—ব্যস।

রান্নাঘরে ঢুকলাম। সেখানে অবশ্য আধুনিক গ্যাজেট আছে সব। বাথরুমেও উঁকি দিলাম। ঘরে পরার চটি পরে বাথরুমে যাওয়া যাবে না। দরজার কাছে 'টয়লেট' লেখা আলাদা চটি।

ফুজিয়ারা হতাশ মুখ করে ঘরে এলেন। নাঃ, কিছুতেই পাওয়া গেল না ইসোডার লাইন।

খাবার নীচু টেবিল ঘিরে মাটিতে বসলাম আমরা। খেতে খেতে গল্প-সল্প জমে উঠল খুব। তবে গল্পের দিকে পুরো মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তখন সতর্কভাবে চপস্টিক ব্যবহার করছি। নতুন গাড়ী চালাতে শিখলে যেমন শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল ধরে থাকে তেমনি অবস্থা। ফুজিয়ারার নাতনীরা আমার কাণ্ডকারখানা সকৌতুকে দেখছে। কাঁটা-চামচে দিতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু কাঁটা-চামচে দিয়ে খেলে নাকি জাপানী খাওয়ার স্বাদই পাওয়া যায় না।

টেবিলের ওপর দুদিকে দুটো স্টোভ জ্বলছে। তার ওপর গামলা বসানো, তাতে ফুটছে স্যুপের মত কিছু। তার মধ্যে যাবতীয় তরকারি আর মাংস ফেলে দেওয়া হয়েছে। কী একটা সস্ ঢেলে দেওয়া হল। সব কিছু ফুটছে একসঙ্গে। আমাদের সামনে ছোট ছোট তিন-চার রকম বাটি। সবাই যার যার চপস্টিক দিয়েই গামলা থেকে তুলে নিচ্ছে খাবার। মাঝে মাঝেই আরো তরকারী ও মাংস ঢেলে দেওয়া হচ্ছে গামলাতে। এই মাংস-তরকারী স্যুপ যা একসঙ্গে ফুটছে তাকে বলা হয় 'সাবু-সাবু'। টেবিলের মাঝখানে পাথরের কুঁজোর মত পাত্রে আছে 'সাকে'। ফুজিয়ারা আমাদের সঙ্গে কলকাতায় খেয়েছেন বাঙালী রান্না, খেয়েছেন মোগলাই। ওঁর সব চাইতে প্রিয় অবশ্য বিশেষ এক রেস্তোরাঁর তন্দুর। আজ ওঁর সঙ্গে বসে আমরা ট্র্যাডিশনাল জাপানী খাওয়া খাচ্ছি, এতে ওঁর আনন্দ আর ধরে না।

সেদিন বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হল। সারাদিনের ক্লান্তির পর সবে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, ঝন্‌ঝন্‌ টেলিফোনের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। হাত বাড়িয়ে আমিই ধরলাম টেলিফোন। ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, হ্যালো। ওদিকে ফুজিয়ারার গলা। একটু চমকে গেলাম।

ফুজিয়ারা বলছেন—একটা স্যাড নিউজ আছে, ভেরি স্যাড নিউজ। একটু আগে খবর এল জেনারেল ইসোডা মারা গেছেন। একটু থেমে বললেন, আমরা কনডোলেন্স মেসেজ পাঠাচ্ছি মিসেস ইসোডাকে, সবাই নাম সই করছি, তোমাদের নামটাও দিয়ে দিই ঐ সঙ্গে ?

॥ ১২ ॥

প্রবীণ জাপানী জেনারেলরা আমাদের মাঝে-মাঝেই বলছিলেন, ওঁরা নেতাজী সম্বন্ধে যত জানেন, পরের জেনারেশন তার কিছুই জানে না। নেতাজীকে ঘিরে ওঁদের মনে যে উদ্দীপনা তরুণ জাপানীদের মধ্যে স্বভাবতই তা আশা করা যায় না। কথাটা সত্যি, সন্দেহ নেই। তবুও নেতাজী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নতুন জেনারেশনের কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই, একথা বললেও ভুল বলা হবে। আমরা যেদিন টোকিও ইউনিভার্সিটিতে গেলাম সেদিন অনেক তরুণ ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল। নেতাজী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের পড়াশুনো যথেষ্ট আর জানবার ইচ্ছেও অপরিসীম।

টোকিও ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের আমন্ত্রণে আমরা একদিন সেখানে উপস্থিত হলাম। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে নেতাজী টোকিও ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। দোভাষীর কাজ করেছিলেন কাকিৎস্থবো। ওঁর কাছে গল্প শুনেছি খুব বিদগ্ধ সমাবেশ হয়েছিল। বক্তৃতার প্রথম দিকে উনি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস আলোচনা করে-

ছিলেন। ইংরেজরা দাবী করে ওরাই প্রথম ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। নেতাজী একথা অস্বীকার করেন। উনি সম্রাট অশোকের ভারতবর্ষের কথা বললেন। তারপর গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ যে সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জন করেছিল তার উল্লেখ করলেন। তারপর এল মুঘল আমলের গৌরবময় অধ্যায়। এসব কথা জাপানীদের কাছে খুবই নূতন লেগেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে উনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কথা যেমন বললেন, তেমনি বললেন অসহযোগ আন্দোলনের কথা। একটা জিনিসই বাকী ছিল আমাদের, তা হল একটা নিজস্ব সেনাবাহিনী, ন্যাশনেল আর্মি। চূড়ান্ত সংগ্রামে সেই আর্মি গঠন করেও দেখিয়ে দিল ভারতবাসী।

নেতাজীর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতার শেষের দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার বিশদ আলোচনা আছে এই বক্তৃতায়। আজও সেই সব সমস্যার অনেকগুলির সঙ্গেই অবিরত যুদ্ধ করে চলেছি আমরা। দেশ স্বাধীন হবার পরই প্রথম সমস্যা হবে ডিফেন্স—বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারা চাই। তারপর সবচেয়ে বড় সমস্যা দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করা। তারপর আসবে শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বাহন ভাষা নিয়েও অনেক চিন্তা করছেন নেতাজী। ওঁর মতে রোমান হরফে হিন্দুস্থানী আমাদের ভাষা সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই দূর বিদেশে বসে উনি ভারতবর্ষের কৃষকদের কথা ভাবছিলেন। উনি বললেন, সোভিয়েট রাশিয়া শ্রমিকদের সমস্যা খুব বড় করে দেখেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ হল কৃষকদের দেশ, আমাদের তাই শ্রমিকদের সমস্যার চাইতেও কৃষকদের সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষ বাঁচে 'নট বাই ব্রেড এলোন' একথাও উনি উপলব্ধি করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা নিঃসন্দেহে একটা গুরুতর সমস্যা, কিন্তু তা হল মানুষের জীবনের একটি দিক মাত্র। সুখী, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন উনি কিন্তু পরিষ্কার বলছেন—অন্যান্য দেশে

কী ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা আমরা অবশ্যই দেখব কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যা আমরা সমাধান করব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে একান্ত ভাবে ভারতীয় পদ্ধতিতে। এই বক্তৃতাতেই উনি বলেছিলেন আমরা যদি আমাদের আর্থনীতিক প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে চাই, সমাজে আনতে চাই আর্থনীতিক পরিবর্তন, তবে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল সিস্টেম অবশ্যই হতে হবে—'অফ অ্যান অথোরিটারিয়ান ক্যারেকটার।' এই মন্তব্যের জন্য পরবর্তীকালে ওঁর ভাগ্যে নিন্দা, প্রশংসা, দুই-ই জুটেছে।

যাহোক, সেসব বহুদিনের কথা। আজকের টোকিও ইউনিভার্সিটিতে যাঁদের সঙ্গে দেখা হল তাঁরা বেশীর ভাগ বয়সে নবীন। অধ্যাপকদের কথা বাদ দিলে তরুণ গবেষক ও ছাত্ররা সকলেই জন্মেছেন যুদ্ধের পরে। এঁদের অনেকের বিষয় হল এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স। কারো কারো সোজাসুজি ভারতবর্ষের ইতিহাস। অনেকে পড়াশুনো করেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কাজ করেছেন কেউ কেউ। আমাদের ভবানী দত্ত লেনের আর্কাইভস্‌ও অপরিচিত নয় এঁদের কাছে। ইতিহাসের অধ্যাপিকা নোবুকো নাগাসাকি এখন পুরোপুরি নেতাজীকে নিয়ে কাজ করছেন। পুরোন পরিচিতদের মধ্যে উস্সুদাকে দেখতে পেলাম। এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স-এর ছাত্র শিবুয়া বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান। আর ছিলেন অধ্যাপক টাকাহাসি।

ঠিক যুদ্ধের পর পর জাপানীরা ওদের মিলিটারি নেতাদের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে ঐ সময়ের ইতিহাসেও ওদের এক ধরনের বিরাগ জন্মেছিল। একই কারণে নেতাজীও কিঞ্চিৎ অবহেলিত ছিলেন। কিন্তু এখন দৃষ্টিভঙ্গী পালটেছে। নিরপেক্ষভাবে পিছনের দিনগুলির বিচার করছেন ওঁরা। জাপানী টেলিভিশনের লোকেরাও একই কথা বলেছিলেন আমাদের। ওঁরা যখন 'নেতাজী' ডকুমেন্টারি ছবিটি টেলিভিশনে প্রচার করলেন, তখন দর্শকদের কাছ থেকে যত চিঠিপত্র পেয়েছিলেন তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, জাপানীরা আর তাদের যুদ্ধের দিনের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভয় পাচ্ছে না।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাঃ বসুকে বক্তৃতায় বিষয়বস্তু বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, 'নেতাজী ও নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'। ভাবা গিয়েছিল ঘণ্টা খানেকের বেশী হয়ত লাগবে না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, তিন ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল তবু বক্তৃতার জের টেনে আলোচনা শেষ হতে চায় না। উৎসুক শ্রোতা, তাদের অনেক প্রশ্ন। প্রশ্নোত্তরের গোড়ায় একটু সঙ্কোচের ভাব ছিল। ভাষার বাধা তার একটা কারণ হতে পারে। যদিও এঁদের সকলেই মোটের উপর ইংরেজি বুঝতে পারেন, বলতেও পারেন। একবার প্রশ্ন শুরু হতে তখন সকলেই এগিয়ে এলেন। নেতাজীর জীবন নিয়ে যেমন আলোচনা হল, তেমনি নেতাজীর জীবন ও কর্মধারা সংরক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে চান ওঁরা। আর সবশেষে মোক্ষম প্রশ্ন, আজকের ভারতবর্ষে নেতাজীর ভাবধারার উপযোগিতা বা গ্রহণযোগ্যতা কতখানি! একটি মেয়ে গান্ধী-বসু বিরোধের ওপর বেশ ভাল প্রশ্ন করছিল। পরে জানলাম তার সাবজেক্ট 'নেহরু'।

মাঝে মাঝেই এক রাউণ্ড চা দিয়ে যাচ্ছিল। আলোচনার শেষে অধ্যাপিকা নাগাসাকি ও অধ্যাপক টাকাহাসি আমাদের হাতে একটি জাপানী বই ধরিয়ে দিলেন। বইটার নাম 'ইণ্ডিয়া ও জাপান।' উল্টো দিক থেকে পাতা উল্টে বইটি দেখলাম। ছবি চোখে পড়ল তিনটি। একটি নেতাজী বক্তৃতা করছেন, আর একটি রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন কয়েকজন জাপানীর সঙ্গে, তৃতীয় ছবিটি দিল্লীর লালকেল্লা। শুনলাম, বইটিতে নেতাজীর ওপর একটি পুরো অধ্যায় আছে আর সেটি লিখেছেন অধ্যাপিকা নাগাসাকি।

অধ্যাপিকা নাগাসাকি খুব কোমল স্বভাবের মহিলা। চট করে বোঝাই যায় না আসলে ওর পাণ্ডিত্য কতখানি। আলোচনা যা ভাবা গিয়েছিল তার থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাওয়াতে সেদিনের প্রোগ্রাম একটু ওলটপালট হল। এতে মিসেস নাগাসাকি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। উনি বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়লেন যে আমাদের 'ভোজন'-এর সময় পার হয়ে গেল। পরে আমরা একসঙ্গে বসে সাপার খেলাম।

সেই একই দিনে আমরা একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছিলাম।

টোকিওর 'ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটি'। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রাচীন, ট্র্যাডিশনাল। আর এই ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটি হল এক বহুতল বাড়ীর একটা ফ্লোর জুড়ে। এটা মূলত রিসার্চ-এর জন্য প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর নানান সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্কলাররা একসঙ্গে কাজ করছেন। আমাদের সঙ্গে ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেমন ছিল ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার (world hunger)—পৃথিবীর ক্ষুধা দূর করার মহৎ কার্যে এঁরা ব্রতী হয়েছেন। তার জন্য প্রথমেই চাই ডাটা কালেকশন। তা এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর যা সংগ্রহ করেছেন, দেখে তাক লেগে যাবার মত। ওঁদের প্রোগ্রাম অফিসার এক মহিলা; নাম রোজান শর্লটন। রোজান আমাদের ওঁদের কাজের ধারা বুঝিয়ে দিলেন, উনত্রিশ তলার ফ্লোর জুড়ে আপিস ঘুরিয়ে দেখালেন। রোজান যেমনি চটপটে প্রাণোচ্ছল, আমাদের সঙ্গী মিসেস নাগাসাকি তেমনি ধীর, স্থির, শান্ত।

ছুটো ইউনিভার্সিটি দেখার শেষে সেদিন মাটিতে হাঁটু মুড়ে যখন খেতে বসলাম তখনো শিবুয়া ইয়াশিরো, মিসেস নাগাসাকি সকলের সঙ্গে আলোচনার জের চলতে লাগল। সেদিন খাওয়া হল কাঁচা মাছের নানা-রকম প্রিপারেশন। কোন কোন মাছের টুকরো লালচে আর কোনটা সাদা। তার সঙ্গে বিভিন্ন সস, তরকারী ও ভাত।

ইতিমধ্যে আমাদের কিওটো যাবার তোড়জোড় চলছিল। কারণ ফুজিয়ারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, ইতিহাসের আলোচনা অনেক হয়েছে—এবার আমরা কয়েকদিন বিশ্রাম করতে পারি। আর প্রাচীন জাপানের পরিবেশ, রাজপ্রাসাদ, মন্দির, গীশা অঞ্চল এইসব জানতে বুঝতে হলে, কিওটোর চাইতে ভাল জায়গা আর কী হবে। তবে আগেও দেখেছি, এই ধরনের ইতিহাসের খোঁজে অভিযানে বার হলে আমরা ইতিহাস ছাড়তে চাইলেও কম্‌লি নেহি ছোড়তা—ইতিহাস আমাদের ছাড়তে চায় না। তাই কিওটো ভ্রমণও একেবারে ইতিহাস বিবর্জিত হওয়া সম্ভব হল না।

তবে টোকিও ছেড়ে যাবার আগে আর দু-একটা কাজ বাকী। যেমন

ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। আরো আগেই করা হয়ত ভাল হত কিন্তু হয়ে ওঠেনি। এদিকে রাষ্ট্রদূত অবতার সিং-এর কার্যকাল শেষ হয়ে আসছে, যে কোনদিন চলে যাবেন। পরবর্তী রাষ্ট্রদূতের নামও এসে গেছে, তবে তাঁর এসে পৌঁছতে দেরী হবে। মাঝখানে একজন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কাজ চালিয়ে দেবেন।

অতএব একদিন অবতার সিং-এর সঙ্গে বসে চা খাওয়া হল, ভাল ভারতীয় চা। সঙ্গে ছিলেন সব নেতাজীর যুদ্ধের সাথী, প্রবীণ সেনাপতির দল। ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগছিল আজ আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের দূতাবাসে বসে আছি, এঁরা সব বসে আছেন আমাদের সঙ্গে। অবতার সিং-কে অভিজ্ঞ কূটনীতিক বলেই বোধ হল। দেখলাম এইসব জাপানী জেনারেলরা ওঁকে বেশ পছন্দই করেন। উনিও সকলের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রেখে চলেন। ভারতীয় দূতাবাসের অনেক অনুষ্ঠানেই এঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। আবার এইসব ভারতপ্রেমিক জাপানীরা যখন কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, অবতার সিং আসেন এবং ওঁদের সাহায্য করেন। টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির তরফ থেকে তাঁর সহযোগীরা প্রতিবছর তেইশে জানুয়ারী উৎসব করেন। 'ভারতীয় দূতাবাস' যোগ দেন তাতে। রেনকোজি মন্দিরেও ১৮ই আগস্ট ওঁরা স্মরণসভা করেন প্রতিবছর। এই সভা প্রথম আয়োজিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তখনো জেনারেল কাওয়াবে, জেনারেল মুতাগুচি জীবিত। ওঁরা খুব বড় করে অনুষ্ঠান করেছিলেন। মিসেস তোজো, জেনারেল নাকামুরা, জেনারেল কাটাকুরা সকলে যোগ দিয়েছিলেন।

অবতার সিং-এর সঙ্গে বৈঠকের সময় অবধারিত ভাবে 'অ্যাশেজ' প্রসঙ্গ আবার উঠল। রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। তাঁকেই ওরা ওঁদের বক্তব্য বললেন। ওঁরা তো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু করা হোক তাই চাইছেন। আমরা নীরবে চা-পান করছিলাম। অবতার সিং ডিপ্লোমেটসুলভ দক্ষতায় আলোচনা পরিচালনা করে চলেছেন দেখলাম। একবার একান্তে আমাদের বললেন, জানি তোমাদেরও এই প্রশ্নের সামনে বারবার পড়তে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের নীরবতা বা নিষ্ক্রিয়তা জাপানে ব্যাখ্যা করে বোঝানো

খুব কঠিন। বৃদ্ধ পুরোহিত মোচিজুকি মারা যাবার পর আমাদের চিন্তা হয়েছিল এবার কী হবে। সুখের বিষয়, ওঁর ছেলে বয়স কম হলেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

জেনারেলরা বলছিলেন ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ এই পাঁচ বছর কোন ভারতীয় খোঁজ করেনি মোচিজুকি বা রেনকোজি মন্দির সম্বন্ধে। অবশ্য রামমূর্তি ব্যতিক্রম। তিনি মাঝে-মধ্যে এসেছেন। তারপর ১৯৫০ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে. কে. চেট্টুর প্রথম এলেন রেনকোজিতে। সেই থেকে অবশ্য ভারতীয় অতিথিদের আনাগোনা চলছে। জওহরলাল এসেছিলেন ১৯৫৭ সালে আর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫৮-তে।

অবতার সিং জাপানে আমাদের কাজকর্ম ও ভ্রমণ কেমন হচ্ছে জানতে চাইলেন। সম্ভব হলে উনি কিছু করতে চান। বারবার বললেন, কোন দরকার হলে আমাকে নিশ্চয় বলো। মিসেস বোস, প্লীজ রিমেমবার দিস ইজ ইয়োর এমব্যাসি। অবতার সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম, জাপানে এসে অবধি আমি যে বিদেশে এসেছি সেকথা আমার একবারও মনে পড়েনি। আজ দূতাবাসে বসে প্রথম মনে হল, তাই তো, এটা তো বিদেশ!

তার কারণ আর কিছুই নয়, জাপানের বন্ধুরা ভালবাসা ও শুভেচ্ছায় আমাদের ঘিরে রেখেছেন। মনেই হয়নি প্রবাসে আছি। আবার এর পিছনে আছে ইতিহাস। নেতাজী ভারত-জাপান বন্ধুত্বের যে শক্ত জমি তৈরি করে রেখে গেছেন, আমরা তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয় নেতাজী যে বিরাট গুড উইল-এর ভাণ্ডার গড়ে রেখে গেছেন, এখনো আমরা ভারতবাসীরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। জাপানে অনেকে বলছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে অনেক সময় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি, মন্ত্রী, আমলা—তাদের মধ্যে বাঙালীও আছেন—বিভিন্ন কাজে জাপানে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাদের মিটিং, কনফারেন্স, সফর শেষ করে চলে যান, একবারও নেতাজীর নাম করেন না। এতে জাপানীরা খুব অবাক হয়ে যায়।

যা হোক, অবতার সিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, এইসব প্রবীণ

জাপানী জেনারেলরা এত আদর-আপ্যায়ন করছেন যে কোনই অসুবিধা হচ্ছে না।

হাতব্যাগে অল্প জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে একদিন সকালবেলা ফুজিয়ারার সঙ্গে টোকিও স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সকাল নটার সময় টোকিও থেকে বুলেট ট্রেন বা হিকারি ছাড়ল। হিকারি মানে আলো। বুলেটের মত অথবা আলোর মত তীব্র গতিতে ছুটে চলে এই ট্রেন। জাপানীদের এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, কারিগরি দক্ষতার চূড়ান্ত। অন্যদিকে তার সঙ্গে আর্টিস্টিক সেন্স সুন্দর মিলিয়ে দেয়। এই বিদ্যুৎগতি ট্রেনের বাইরের ছিমছাম, সুন্দর চেহারা আর ভিতরে পারিপাট্য দুই-ই দৃষ্টিনন্দন।

ফুজিয়ারা ঠিক করেছেন এখন আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে, রিল্যাক্স করতে হবে। এর ওপর আর তর্ক চলে না। আমরা তাই বুলেট ট্রেনের কামরায় ঢুকে নরম গদিওয়ালা চেয়ারে আরাম করে বসলাম। পায়ের কাছে আছে পা-দানী বা ফুটরেস্ট। আমার 'হাঁ হাঁ কী করেন' প্রতিবাদের মধ্যে ফুজিয়ারা নীচু হয়ে ফুটরেস্ট টেনে দিয়েছেন পায়ের নীচে। ম্যাগাজিনের তাক থেকে পেড়ে আনলেন গোটা কতক পছন্দ মত বই।

ট্রেনের দীর্ঘ কামরা, তার দু'দিকে দুটি করে সীট। অনেকটা প্লেনের সিটের মত, অবশ্য নড়চড়া করার পরিসর ঢের বেশী। এটা হল গ্রীনকার অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস। আমার হাতে ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিয়ে ফুজিয়ারা আমার উল্টোদিকের সীটে-বসা জাপানী দম্পতির সঙ্গে কী সব জাপানী ভাষায় আলোচনা করছিলেন। একটু পরেই এসে বললেন, উঠে পড়ো, শীগগির উঠে পড়ো। কী ব্যাপার! জাপানী দম্পতির সঙ্গে আমাদের সীট বদল করতে হবে। ফুজিয়ারা বললেন, ট্রেনে যেতে ডানদিকে পড়বে মাউণ্ট ফুজি। ওদিক থেকে তোমরা ভাল দেখতে পাবে না, তাই ওদের সঙ্গে কথা বলে সীট বদল করলাম। ওদের তো আর মাউণ্ট ফুজি দেখার শখ নেই।

জাপানের কথা বললেই সবাই বলে ছবির মত দেশ। কেন বলে ট্রেনের কামরার জানলায় চোখ রেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম। প্রথমে অবশ্য

টোকিও শহরের উপকণ্ঠের ঘরবাড়ী দেখতে দেখতে গেলাম। তারপর শহর মিলিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ শুরু হল। পাহাড়, ঝরনা, খেত-খামার, জাপানী গ্রাম বা ছোট শহর। মাঝে মাঝেই ট্রেন দীর্ঘ টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার টানেলের বাইরে বার হলেই যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি।

মাঝে মাঝে কামরার ভিতরের দৃশ্য দেখছিলাম। ভেতরে বসে ট্রেন যে এত দ্রুতগতিতে চলছে তা বোঝার উপায় নেই। মাঝে মাঝেই ট্রলিতে করে খাবার-দাবার ফিরি করতে আসছে। বেশীর ভাগই মেয়ে। ছেলেও অবশ্য আছে। মেয়েরা সুর করে কী সব বলতে বলতে চলেছে। নিশ্চয় ওদের খাবার-দাবারের তালিকা বা তার গুণাগুণ। বেশ মজা লাগছিল। আমাদের দেশেও তো ট্রেনে এমনি করে ফিরি করে বেড়ায়। আমার ওপাশের সেই জাপানী দম্পতি খাবারের বাক্স নিলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম। বেশ পরিষ্কার সাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স, তাতে ভাত, সমুদ্রের তলার শাক পাতা আর মাছের টুকরো, সঙ্গে চপষ্টিক। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফুজিয়ারা ছুটে এলেন—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়, খাবে কিছু, কি নেব—এই সব বলে মহা অস্থির। অনেক কষ্টে বোঝালাম খিদে পায়নি—এমনি কৌতূহলবশে দেখছিলাম।

দেখতে দেখতে নাগোয়া স্টেশন এসে পড়ল। প্রকৃতি আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাই মাউন্ট ফুজি দেখা দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। সহযাত্রীরা বলছিলেন, সব সময় কিন্তু মাউন্ট ফুজি এমন দেখা যায় না। প্রায়ই কুয়াশার একটা পাতলা আস্তরণ থাকে, তার ভেতর দিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখতে পাওয়া যায়। আজ আমাদের ভাগ্য ভাল।

নাগোয়া স্টেশনে ফুজিয়ারা এদিক ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। শুনলাম নাগোয়া থেকে অধ্যাপক ইওজি আকাশি আমাদের কামরায় উঠতে পারেন এমন একটা কথা ছিল। আকাশি আসেননি দেখে ফুজিয়ারা বললেন, তা হলে উনি নিশ্চয় আগেই কিওটো গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আকাশিকে আমরা অনেকে চিনি। নাগোয়াতে আছে নানজান

ইউনিভার্সিটি। নানজানের ফ্যাকাল্‌টি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ ইতিহাস পড়ান আকাশি। নেতাজী নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। চমৎকার ইংরেজি জানেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিক নেতাজী সেমিনারে কলকাতায় এসেছিলেন। ফুজিয়ারার স্মৃতিকথা উনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। আমাদের নাগোয়া যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এবার তা সম্ভব হচ্ছে না। তাই উনি নিজেই কিওটো আসবেন জেনে খুব খুশি হলাম।

নাগোয়া থেকে কিওটো পথ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হল। কারণ মাঝে কিছু সময় ডাইনিং কারে ঘুরে এলাম। বাইরে পাহাড়, নদী, আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে একটা গানের কলি আমার মাথার মধ্যে কেবলি গুনগুন করছিল। ট্রেনে উঠলে এ রকম হয়। কিন্তু পরে দেখলাম, এবার পুরো ভ্রমণের সময় গানটা যেন থীম্ সঙের মত লেগে রইল মনের মধ্যে সর্বক্ষণ আর যখন-তখন গুনগুন করে ভেসে আসতে লাগল গানের প্রথম কলি— গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী, যমুনা ঐ বহিয়া চলেছে আগের মত, কই রে আগের মানুষ কই?

কিওটো স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে ঢুকতে প্ল্যাটফর্মে কিছু চেনা মানুষের মুখ নজরে এল। আকাশি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ফুজিয়ারা কিকানের এক সময়ের সদস্য জেণ্টো ইয়ামাগুচি। সিঙ্গাপুরে ও টোকিওতে ইনি নেতাজীকে কাছ থেকে দেখেছেন। ওঁদের সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন তরুণ জাপানী। আমাদের দেখতে পেয়ে ওঁরা এগিয়ে এলেন সদলবলে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে উভয়পক্ষে নীচু হয়ে অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন চলল।

॥ ১৩ ॥

অনাদিকাল থেকে কিওটো শহর দেখে বিদেশী আগন্তুকেরা মুগ্ধ হয়ে আসছেন। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। এক গ্রীক সাহিত্যিক কিওটো

এসে মন্তব্য করেছিলেন—Every city has its sex, male or female. This one is all female। কিওটোর সৌন্দর্য আর তার সঙ্গে জড়িত ঐশ্বর্য ও বিলাসের কাহিনী সব মিলে এই শহর ওঁর কাছে মোহিনী নারীর মত মনে হয়েছিল। কিওটো যে আশ্চর্য লাবণ্যময় শহর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চারিদিকে পাহাড়ঘেরা অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আর তার মধ্যে কোন জাপানী চিত্রকরের আঁকা ছবির মত প্রাচীন এক শহর। বৌদ্ধ মন্দির, রাজপ্রাসাদ, সরু গলির দু'ধারে ছোট ছোট কাঠের দোতলা বাড়ি। গাড়িতে যেতে যেতে মনে হল, কেউ যেন একটা সিল্কের স্ক্রোল ধীরে ধীরে চোখের সামনে খুলে ধরছে। আধুনিক সভ্যতা যে এ শহরে তার ছাপ ফেলেনি এমন নয়, তবুও কী করে যেন আর পাঁচটা আধুনিক শহরের মত চরিত্রহীন হয়ে যায়নি কিওটো। তার বিশিষ্ট জাপানী চরিত্র অটুট রয়েছে।

কিওটো স্টেশন থেকে আমরা বেশ একটা লঙ ড্রাইভে চলেছি মনে হল। ইয়ামাগুচি বললেন, কিওটোর প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত হোটেল মিয়াকোতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন হোটেলে থামব না। কিওটোর উপকণ্ঠে আরাশিয়ামা অঞ্চলে একটি ছোটখাট বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে অনেকে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। আরাশিয়ামা অঞ্চল তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কিওটোর প্রথম আলোচনার আসরের জন্য আরাশিয়ামাকে বেছে নিয়েছেন ওঁরা।

অবশ্য কিওটোতে আমরা প্রধানত বেড়াতে এসেছি, সে কথা মনে করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ফুজিয়ারা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়েছেন। মাঝে মাঝেই ছবি তুলছেন আর নিজেকে 'ভেরি পুওর ফটোগ্রাফার' বলছেন। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা যেখানে শেষ হল সেখানে একটা তোরণ, তার গায়ে লেখা 'রান টাই'। রান টাই নদীর ধারে একটি জাপানী সরাইখানা। গেটের পাশে একটা বোর্ড, কাছে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের উদ্দেশে 'ওয়েলকাম' লেখা রয়েছে।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে সবুজ মাঠ, তাতে লাল বড় বড় ছাতার নীচে লাল কাপড়ে ঢাকা বসার চৌকি, একপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে নদী বয়ে

চলেছে। সেই বাগানে লাল ছাতার নীচে বসে 'ওচা'তে চুমুক দিয়ে সমাগত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ হল। ইয়ামাজাকি নামে এক ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হল। যুদ্ধের সময় ইনি ছিলেন সিঙ্গাপুরে। সেখানে নিউজ ফিল্ম প্রডিউস করা ছিল ওঁর কাজ। অবশ্যই সে সময় উনি নেতাজীকে অনেক দেখেছেন। সিঙ্গাপুর ও টোকিওর সে সময়ের অনেক নিউজ রীল আমরা পেয়েছি, সে বিষয়ে আলোচনা হল। ইয়ামাজাকির ধারণা, খুঁজলে আরো কিছু নিউজ ফিল্ম পেয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। ইয়াজাওয়া বলে আর এক ভদ্রলোক নিজে থেকে এসে আলাপ করলেন। কিওটোতে খুব ভাল মন্দিরের ঘণ্টা তৈরী হয়। ইয়াজাওয়ার আছে ঘণ্টা তৈরীর বিরাট কারখানা। বেশীর ভাগ বৌদ্ধ মন্দিরে মন্দির-সংলগ্ন ঘণ্টাঘর থাকে। তাতে মানুষ-সমান উঁচু বা তার চাইতেও বড় ঘণ্টা ঝোলানো থাকে, পাশে থাকে দণ্ড। সেই দণ্ড দিয়ে ঘা দিলে 'গম্ভীর ঢং ঢং করে বেজে ওঠে ঘণ্টা। ইয়াজাওয়া তাঁর নিজের কারখানায় তৈরী ঘণ্টা দিয়ে এসেছেন সারনাথে আর বুদ্ধগয়াতে।

আমাদের বললেন, তোমাদের জন্য ঘণ্টা ছাঁচে বসিয়ে এসেছি। হতে একটু সময় লাগে। আশা করি তোমরা যাবার আগে তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। গায়ে একটু কারুকাজ আছে আর তোমাদের নাম লিখে দিয়েছি তাতে জাপানী ভাষায়।

ঘণ্টা উপহার পেতে চলেছি জেনে পুলকিত হলাম, তবে সেই সঙ্গে চিন্তিতও হলাম। অবশ্য ইয়াজাওয়া আশ্বস্ত করলেন এটা মোটেই মানুষ-সমান নয়, নেহাতই ছোট। তবুও ওজন নিশ্চয় কম হবে না। প্লেনে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে। ইয়াজাওয়া যে একজন বড় ঘণ্টা-শিল্পী সে কথা পরে আরো জানতে পারলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা মিয়াকো হোটেলে টি ভি দেখছি, তখন দেখি, আরে, এ যে আমাদের পরিচিত বন্ধুর চেহারা। কিওটোতে ঘণ্টা তৈরীর শিল্প সম্বন্ধে প্রোগ্রাম হচ্ছে, তাতে প্রধান অতিথি ইয়াজাওয়া।

সেদিন আরাশিয়ামার লাঞ্চ বৈঠকের সব ব্যবস্থা করছিলেন ফুজিয়ারার ভাই ইয়োকোটা। ইয়োকোটা পরিবার কিওটোতে থাকেন। ফুজিয়ারার

ভাই কেমন করে ইয়োকোটা হলেন, আমার এই প্রশ্নের জবাবে উনি বললেন, যদিও ওঁরা দু'জন আপন ভাই, জন্মের পরই ওঁর পিসী ওঁকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাই ওঁর পদবী পাল্টে হয়ে গেছে ইয়োকোটা। আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল যে ছেলেটি সে ওঁর ছেলে—ইয়োকোটা জুনিয়র। অপর একটি গাড়ি চালিয়ে এল যে তরুণ জাপানী সে হল জেণ্টো ইয়ামা-গুচির ছেলে। প্রফেসর আকাশি দোভাষীর কাজ করতে লাগলেন।

'রান টাই'-এ খাবার জায়গা হল নদীর ধারে কাঠের কুটির। স্লাইডিং জানলা ঠেলে দিতেই বাইরে সূর্যের আলোয় নদীর জল ঝলমল করে উঠল। নীচু টেবিলে খাবার আয়োজন, টেবিল ঘিরে মাটিতে আসন পাতা। সবাই বসলে পর ইয়োকোটা একটা স্বাগত সম্ভাষণ করে বক্তৃতা করলেন। অবশ্যই জাপানী ভাষায়। অধ্যাপক আকাশি অনুবাদ করে দিলেন ওঁর বক্তব্য। তারপর আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা। জাপানীরা সব কিছু আনুষ্ঠানিক ভাবে করা পছন্দ করে। খাওয়া-দাওয়া শুরু হলে পর অন্যান্য অভ্যাগতরা ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের বক্তব্য বলতে থাকলেন। সিঙ্গাপুরের ফিল্ম জার্নালিস্ট যুদ্ধের সময় তাঁর সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা কিছু বললেন।

মেজর ইয়ামাগুচিকে আমরা ধরলাম, ওঁর কথা কিছু বলতে হবে। উনি এক বর্ণও ইংরেজি বলেন না। ধীরে ধীরে কিছু বললেন, আকাশির মাধ্যমে আমরা বুঝে নিলাম। উনি বললেন, 'আমি প্রথম নেতাজীকে দেখি ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে। সে কি ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ওঁর কথা বলা, হাঁটা-চলা সব কিছু দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এর কয়েক দিন পর উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। অনেকের সঙ্গেই উনি দেখা করছিলেন এক এক করে, আমিও তাঁদের একজন। আমি জাপানী আর্মির একজন ইণ্টেলিজেন্স অফিসার। সে সময়ে 'ফুজিয়ারা কিকান' বা সংক্ষেপে 'এফ্-কিকানে'র একজন সদস্য। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যে সব ব্রডকাস্ট হত, আমি সেসব দেখতাম। এই সব ব্রডকাস্ট কতখানি পাওয়ার-ফুল, কতদূর পৌঁছয় এসব খুঁটিনাটি নেতাজী আমাকে প্রশ্ন করেন। অবশ্য আজাদ হিন্দ সরকার গঠন হবার পর এই সব বক্তৃতা ওঁরা নিজেরাই

দেখাশুনো করতেন। ওঁরা স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা বলতে পারতেন, কোন সেন্সর করা হত না। আমার কাজের সূত্রে আজাদ হিন্দ সরকারের আয়ার সাহেবের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। উনি তো ইনফর্মেশন মিনিস্টার ছিলেন। আর নেতাজী যখন নিজে বক্তৃতা করতে আসতেন তখন তো আমরা ওঁকে দেখবার জন্য, ওঁর কথা শোনার জন্য ভীড় করতাম।'

আমি জানতাম না, ইয়ামাগুচির সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্ক বেশ দীর্ঘ দিনের। প্রকৃতপক্ষে উনি সেই ১৯৪১ সালেই ফুজিয়ারার সঙ্গে ব্যাংককে প্রীতম সিং প্রভৃতি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। মোহন সিং-এর নেতৃত্বে প্রথম আই. এন. এ. গঠন উনি দেখে-ছিলেন। 'এফ-কিকান' যখন 'ইয়াকুরো-কিকান' নামে পুনর্গঠিত হল তখনো উনি তাতে আছেন। ১৯৪৪ সালে টোকিওতে বদলি হয়ে এলেন। তখন টোকিও রেডিও স্টেশন থেকে কিছু সময় দেওয়া হত আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারের জন্য। ইয়ামাগুচি এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নেতাজীর চরিত্রের কোন দিকটি ওঁর বিশেষভাবে মনে পড়ে—এর জবাবে ইয়ামাগুচি বললেন, ওঁর মাথার ব্যবহার। আমি ভাবলাম, ব্রিটিশরা তো ওঁকে 'অ্যারোগেণ্ট' বা উদ্ধত বলেন। আর জাপানী দলিলপত্রে দেখেছি ওঁকে 'অবস্টিনেট' বা একগুঁয়ে বলা হয়েছে। একটা কিছু ধরলে সহজে ছাড়েন না, কোন আলোচনায় মতদ্বৈত হলে শেষ পর্যন্ত ওঁর মতই মেনে নিতে হয়। ইয়ামাগুচি বললেন, না, সেই প্রথম ইণ্টারভিউতেও উনি জাপানের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। আর পরে যুদ্ধের সময় যখন নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হত, সব সময় উনি উৎসাহ দিতেন, আশার কথা শোনাতেন।

লাঞ্চের পর ওঁরা বললেন, নদীতে নৌকো চড়বে? কুইন এলিজাবেথ যখন এসেছিলেন, তখন নৌকাবিহার করেছিলেন। ভাবলাম রানী যখন নৌকাবিহার করেছিলেন, তখন আমরাও না-হয় করি। নৌকোতে আমাদের সঙ্গে এলেন ফুজিয়ারা আর ইয়ামাগুচি। নদীর নাম 'অয়ি'। চারদিকে পাহাড়, মাঝে জল, হঠাৎ ভ্রম হয় যেন কাশ্মীরে শিকারা চড়ে বেড়াচ্ছি।

নৌকাবিহারের পর ইয়ামাগুচির প্রস্তাব মত কাছেই টেনরিউ-জি মন্দির দেখতে যাওয়া হল। কিওটোতে মন্দির আছে অগুণতি। টেনরিউ-জি মন্দির মুসো নামে এক পুরোহিত স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরে পরিণত হবার আগে এটি ছিল সম্রাট গডাইগোর প্রাসাদ। এই মন্দিরের স্থাপত্যের ধরনকে ওরা বলে শাক্কাই বা borrowed scenery। অর্থাৎ এই মন্দিরকে দেখতে হবে পিছনের পাহাড় ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে। পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এর সৌন্দর্য বোঝা যাবে না। এমনিতে সব জাপানী মন্দিরের মতই টেনরিউ-জিতে আছে বিস্তৃত ফুলের বাগান, হ্রদ-এ রঙীন মাছ, প্রধান মন্দির ছাড়াও ছোটখাট সংলগ্ন মন্দির, ঘণ্টাঘর প্রভৃতি।

সেই যে সকালে টোকিও থেকে বেরিয়েছিলাম, তারপর সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যায় আমাদের আস্তানা মিয়াকো হোটেলে ফিরে এলাম। মিয়াকো সত্যিই খুব সুন্দর হোটেল। এখানে আধুনিক সভ্যতার সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি জাপানী পরিবেশ ও চরিত্র বজায় রাখার একটা চেষ্টা আছে। আমাদের ন'তলার ঘরের পথে চোখে পড়ত একটা লম্বা করিডর জুড়ে জাপানী কায়দার বাগান।

মিয়াকোর লাউঞ্জে ঢুকতে পাশের একটা কাঁচের ঘর থেকে এক জাপানী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ইনি মিয়াকোর রেসিডেণ্ট-ম্যানেজার ইয়োশিমটো। উনি আমাদের বললেন, হিজ একসেলেনসি সুভাষচন্দ্র বোসকে ওঁরা কত শ্রদ্ধা করেন। ওঁর পরিবারের কেউ কেউ নেতাজীকে দেখেছেন হিবিয়া পার্কে। তা ছাড়া এমনি যাঁরা দেখেননি, তাঁরা যুদ্ধের সময় খবরকাগজে রোজ ওঁর খবর পড়েছেন, ছবি দেখেছেন। উনি একজন ভারতীয় দেশপ্রেমিক নেতা, নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন—এ সব খবরই ওঁদের জানা। বেশ ভাল লাগল ওঁর সঙ্গে কথা বলে। নেতাজীর নাম জাপানে 'হাউসহোল্ড ওয়ার্ড' একথা অনেকবার শুনেছি। জাপানে এসে এ-কথা কতখানি সত্য প্রতি পদে প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় মিয়াকো হোটেলে ঘরে বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময়

দরজায় কে নক্ করল। খুলে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হোটেলের বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে মস্ত কাঠের পরাত, তার ওপর রূপোর ট্রে, ট্রে ভরতি আপেল, আঙুর, কলা, পার্সিমন যাবতীয় ফল। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন মিয়াকোর ম্যানেজার।

কিওটো ইউনিভার্সিটির তরুণ অধ্যাপক ও রিসার্চ ফেলো ইয়োকোয়ামা আমাদের পুরোন বন্ধু। কলকাতার নেতাজী সেমিনারে সে একাধিকবার এসেছে। মাঝে বেশ কিছুকাল ছিল অক্সফোর্ডে, সম্প্রতি কিওটো ফিরেছে। দেখলাম ওঁর ইংরেজী আগের চাইতে অনেক ভাল হয়েছে। ফুজিয়ারা সম্পর্কে ওঁর মামা হন। ইয়োকোয়ামা বলছিলেন, কিওটোর ইতিহাস পড়লে দেখা যায় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সেখানে এক বনেদী ও মহা শক্তিশালী ফুজিয়ারা পরিবার ছিল। সম্রাটেরা তাঁদের কথায় উঠতেন-বসতেন। কিওটোর কাছে যে বিওডো-ইন মন্দির রয়েছে সেটা এই ফুজিয়ারা পরিবারের কীর্তি। কালক্রমে রাজপরিবারের ওপর এঁদের প্রভাব কমে যায়।

কিওটোর টুকিটাকি ইতিহাসের খবর ইয়োকোয়ামা প্রায়ই দিতেন। কিন্তু একদিন তিনি একেবারে অন্য ধরনের একটা খবর নিয়ে এলেন। বললেন, কাল মিঃ শিডেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কে মিঃ শিডেই! প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে বুঝলাম ইনি লেঃ-জেনারেল স্যুনুমাসা শিডেইর ভাই। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ১৭ই অগাস্ট সায়গন থেকে যে বিমানে নেতাজী ও হবিবুর রহমান উঠেছিলেন সেই একই বিমানে যাত্রী ছিলেন জেনারেল শিডেই। এখন মনে পড়ল শিডেই পরিবার কিওটোর বাসিন্দা। তবে এঁদের কেউ এখানে আছেন সে খবর জানা ছিল না। ইয়োকোয়ামা ফোনে খবর দিয়েছেন আমরা এসেছি, তাই মিঃ শিডেই আসছেন দেখা করতে।

পরদিন সকালে তৈরি হয়েছি-কি-হইনি, লাউঞ্জ থেকে ফুজিয়ারার ফোন —শীগগির এসো, শিডেই এসে গেছেন। নীচে নেমে দেখি লাউঞ্জে একটা গোল টেবিল ঘিরে অনেকে বসেছেন। ফুজিয়ারা, ইয়ামাগুচি, ইয়োকোটা জুনিয়র, ইয়ামাগুচি জুনিয়র সকলে আছেন। ইয়োকোয়ামা তো আছেনই,

তাঁর সঙ্গে এক অপরিচিত ভদ্রলোক। বয়সে প্রবীণ, চেহারা যেন একটু ভেঙেছে, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। আলাপ হল, ইনিই মিঃ শিডেই। ইনি একজন বটানিস্ট বা উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ।

লেঃ জেনারেল শিডেইর মিলিটারি কেরিয়ার ছিল খুবই উজ্জ্বল, ভাইয়ের সম্পর্কে গর্ব করে বললেন ছোট মিঃ শিডেই। ধাপে ধাপে উঠে উনি যুদ্ধের সময় বার্মা এরিয়া আর্মির চীফ অফ স্টাফ হয়েছিলেন। যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে উনি বদলি হলেন মাঞ্চুরিয়াতে। সায়গন থেকে উনি যে প্লেনে উঠলেন তাতে ওঁর মাঞ্চুরিয়ার ডাইরেন শহরে যাবার কথা।

সায়গনে নেতাজীর দোভাষীর কাজ করছিলেন নিগেশি। উনি বলেন নেতাজীরও প্ল্যান ছিল শিডেইর সঙ্গে ডাইরেন পর্যন্ত যাবার। প্লেনের অন্য সহযাত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ একই কথা বলেন। জেনারেল শিডেই রাশিয়ান অ্যাফেয়ার্স-এ একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাই ওঁকে চীফ অব স্টাফ করে মাঞ্চুরিয়া পাঠানো হচ্ছিল।

প্লেন যখন তাইহোকু বিমান বন্দরে টেক অফ করার অল্প পরেই ভেঙে পড়ল, জেনারেল শিডেই সেই প্লেনের ভিতরে তৎক্ষণাৎ মারা যান। উনি আর প্লেনের বাইরে আসার কোন সুযোগ পাননি। শিডেইর দেহাবশেষ জেনারেল টানাকার হাতে টোকিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিডেইর পর বার্মাতে চীফ অব স্টাফ হয়েছিলেন টানাকা। উনি দৈবাৎ এসে হাজির হয়েছিলেন তাইহোকু বিমান বন্দরে। বার্মার নেতা বা ম-কে সঙ্গে নিয়ে উনি টোকিও যাচ্ছিলেন। ২২শে আগস্ট ওঁদের প্লেন দাঁড়িয়ে ছিল তাইহোকুতে। সে সময় ওঁরা নেতাজীর দুর্ঘটনার কথা শোনেন। এমন কি এয়ারপোর্ট অফিসাররা জানতে চান পথ খুব বিপদসঙ্কুল সে কথা জেনেও বা ম আর এগোতে চান কিনা। বা ম জবাবে চীৎকার করে বলে ওঠেন—

"Certainly, let's go at once and end the whole damn show if it has got to end that way".

বা ম অবশ্য নিরাপদে টোকিও পৌছন, সেই সঙ্গে টানাকার হাতে শিডেইর ভস্মাবশেষও পৌছে গেল।

ছোট শিডেই খুব গর্ব করে বললেন, 'আমার ভাই ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। জার্মান ভাষা ও ইতিহাস উনি খুব ভাল জানতেন। মিসেস শিডেই অর্থাৎ আমার ভাইয়ের স্ত্রী পরে অন্য সহযাত্রীদের কাছে শুনেছিলেন, নেতাজী ও জেনারেল শিডেই পরস্পর এরোপ্লেনে জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। জেনারেল শিডেই নেতাজীর চাইতে দু' বছরের বড় ছিলেন। ওঁদের জন্মদিন খুবই কাছাকাছি, শিডেইর জন্মদিন ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৯৫।'

ভারতবর্ষে এই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে মতভেদ আছে শুনে ছোট শিডেই বললেন, 'তবে তো আমার ভাইয়ের খবরটাও আমাকে অবিশ্বাস করতে হয়। এর আর প্রমাণ কী আছে। আমি তো যুদ্ধে ছিলাম। তখন চীন দেশে ক্যাণ্টনের কাছে পোস্টেড। একদিন টেলিগ্রাম পেলাম হেড-কোয়ার্টার্স থেকে—জেনারেল শিডেই মারা গেছেন। এর কিছুকাল পর ওঁর ব্যবহৃত সামান্য দু' একটা জিনিস ওঁর পরিবারকে পাঠিয়ে দেয় ওরা। অবশ্য আমার ভাইয়ের স্ত্রী পরে অনেক খবর সহযাত্রীদের কাছে শোনেন।'

শিডেই বসেছিলেন কো-পাইলটের আসনে। সীট তো কোন ছিল না। সকলে নীচে বসেছিলেন, নেতাজীকে একটা কুশন দেওয়া হয়েছিল। সব চাইতে ভাল তিনটি জায়গা নেতাজীকে, শিডেইকে আর হবিবুর রহমানকে বসতে দিয়েছিল ওরা। ঠিক এরোপ্লেন ভেঙে পড়ার মুহূর্তে মেজর কোনো নামে এক সহযাত্রী জেনারেল শিডেইকে দেখেছিলেন। ওঁর মাথার পিছন ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। মেজর কোনো নেতাজীকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলেন না, কারণ পেট্রল ট্যাংকটা ছিটকে পড়ে যায় ওঁর আর নেতাজীর মাঝখানে। নেতাজী যখন প্লেনে ওঠেন তখন জেনারেল শিডেই ওঁর নিজের সীট অর্থাৎ কো-পাইলটের সীটটি নেতাজীর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানে জায়গা অপরিসর হওয়াতে নেতাজী ওদিকে বসেননি।

এই এরোপ্লেন সায়গন ছাড়ার পর টুরেন-এ এক রাতের জন্য থেমেছিল। শিডেই পরিবার এই রাত সম্পর্কে কিছু জানেন কি? ছোট শিডেই বললেন, না, বেশী কিছু ওঁরা জানেন না। মিসেস শিডেই শুনেছিলেন, নেতাজী ও জেনারেল দু'জনে একটি হোটেলে রাত কাটান। সম্ভবত হোটেল মরিন।

সেখানেও ছ'জনে জার্মান-এ আলোচনা করছিলেন এইটুকু শোনা গেছে।

জেনারেল শিডেইর একটি ছেলে আছে, সে থাকে টোকিওতে। কাকা বললেন, আমি আমার ভাইপোকে খবর দিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা এসেছ।

সাধারণত যে-কোন বিমান ছুর্ঘটনা হলে একটা রুটিন তদন্ত হয়। অথবা জেনারেল শিডেইর মত উচ্চপদস্থ অফিসারের ছুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়েও কোন তদন্ত হতে পারত। সে সব কিছু হয়নি। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তখন মাত্র দিন তিনেক হয়েছে। ওঁরা বলেন, এক বৃহত্তর বিপর্যয়ের মধ্যে আর সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল।

জেনারেল শিডেইর মিলিটারি সার্ভিস রেকর্ড আছে। তার প্রতিলিপি অবশ্যই অনেকে দেখেছেন। তাতে পরিষ্কার লেখা আছে—শিডেইর মৃত্যু হয়েছিল তাইহোকু এয়ারপোর্টে, মৃত্যুর তারিখ ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫, আর মৃত্যুর কারণ 'ডেথ বাই ওয়ার'—যুদ্ধে মৃত্যু।

সেদিন আমরা একটু পরে কিওটো শহর ঘুরে-ফিরে দেখতে বার হলাম। শিডেইর ভাই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

॥ ১৪ ॥

কিওটোর পণ্টো চো এলাকা হল প্রাচীন গেইশা অঞ্চল। কামো নদীর ধারে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই গেইশা বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সময় এই এলাকায় ডাচদের আনাগোনা ছিল, কিছু ডাচ এখানে বসবাসও করছিলেন। শোনা যায় পণ্টো নাম তাদেরি দেওয়া। সেই সময় থেকে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলে গেইশারা তাদের ঐতিহ্যময় মনোরঞ্জনের আর্ট অনুশীলন করে চলেছে।

পণ্টো চো-তে সরু গলি, তার ছ'ধারে ছোট ছোট দোতলা কাঠের বাড়ী। কোথাও রেলিঙে ভর দিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে

জাপানী সুন্দরী। বাড়ীগুলি বাইরে থেকে দেখতে যত ছোট আসলে তত ছোট নয়। ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় লম্বা ধরনের বাড়ী, মাঝখানে উঠোন। সন্ধ্যা নামলে অনেক বাড়ীর সামনে বাঁশের ডগায় ঝোলানো রঙীন জাপানী লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। তখন কিওটোকে সত্যিই মনে হয় মায়াপুরী।

সরু গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, গেইশাদের করণীয় ঠিক কি। ওঁরা বললেন, "এণ্টারটেন" করা। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে ওদের শিখতে হয় নাচ-গান, আদব কায়দা। আজকাল নাকি সেকালের মত পারদর্শিনী গেইশা আর দেখা যায় না। আজকাল-কার মেয়েরা পড়াশুনো করছে, তার ফাঁকে ফাঁকে গেইশা আর্ট আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃত গেইশা হতে হলে দিনের আঠারো ঘণ্টা অনুশীলন নিয়ে থাকতে হয়।

ইয়ামাগুচি ও ফুজিয়ারা ঠিক করলেন, প্রাচীন কিওটো শহরের স্বাদ একটু পেতে হলে পণ্টো-চো এলাকাতে ঘুরে-ফিরে দেখতে হয়। আমার মনে হয় তরুণ বন্ধু ইয়োকায়ামা ব্যাপারটা খুব পছন্দ করছিল না। ও আমাকে বারবার বলল, "এ সব আজকাল উঠে-টুঠে গেছে, বুঝেছ। সেকালের সংস্কারের সামান্য কিছু পড়ে আছে এই যা।"

তা হবে। তবে কিওটোকে বলা হয়—

'A vast open air archive of Japanese art and architecture'.

তাই এই আর্কাইভস্-এ চিত্রকলা ও স্থাপত্যর সঙ্গে প্রাচীন গেইশা সংস্কৃতিও যদি টিকে থেকে থাকে তার জন্য কিন্তু-কিন্তু বোধ করার দরকার নেই নিশ্চয়।

সেদিন ওঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন গেইশা নৃত্য দেখাতে, তার নাম "কামোগাওয়া ওদোরি", কামো নদীর তীরের নাচগান। পণ্টো চো-তে কাবুরেনজো নামে জায়গায় বছরে মাত্র হপ্তা তিনেক এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের গোড়া। প্রথমে সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে সেখানে একটি ঘরে চা-পান অনুষ্ঠান বা টী-সেরেমনি। ঝলমলে কিমনো-পরা গেইশারা ঘুরছে ফিরছে, তদারক করছে টী সেরেমনির।

তাদের মুখ সব সাদা চুনকাম করা, সামনের দিকে চুল উঁচু করে তুলে পিছনে মস্ত খোঁপা, কোমরে চওড়া ব্রোকেডের বেল্ট, পিছন দিকে মস্ত করে "বাও" বাঁধা। সকলেরই পুতুল-পুতুল চেহারা। আমাদের ভারতীয়দের নাচে-গানে অভিব্যক্তি একটা বড় জিনিস। এদের চুনকাম-করা মুখ যেন ভাবলেশহীন।

টী-সেরেমনিটা এতদিনে রপ্ত হয়ে গেছে। তাই ফুজিয়ারাকে আর ফিসফিস করে নানা রকম নির্দেশ দিতে হল না। জাপানী সুন্দরী যখন লোহার কেটলি থেকে সবুজ চা সামনের ফুলের ডিজাইন তোলা বাটিতে ঢেলে দিলে তখন ঠিকমত বাঁ হাতের তেলোতে বাটি রেখে ফুলের ডিজাইন উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। কারণ ওদিকে ঠোঁট স্পর্শ করবে না। তারপর চা খাওয়া হয়ে গেলে ফুলের নকশা নিজের দিকে ফিরিয়ে একটু মুগ্ধ চোখে তাকালাম, সেই রকমই নিয়ম। যেখানে ঠোঁট লেগেছিল, দু' আঙুলে সে জায়গা মুছে বাটি সামনে রাখলাম। আর চা গ্রহণ করার সময় দু'বার মাথা নীচু করে "বাও" করলাম। একবার সুন্দরীকে আর একবার ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে। আমাদের তো হুস হুস করে চা খেয়ে দুদ্দাড় করে কাজে দৌড় দেওয়া অভ্যাস। জাপানে ক্রমাগত টী-সেরেমনিতে যোগ দিতে দিতে বেশ সংযতভাবে চা খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

আমরা সরু সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে নীচে একটা প্রশস্ত হলঘরে পৌঁছলাম। একদিকে স্টেজ, তার পাশে ব্যালকনিতে গানাদাররা বসে আছে। গায়িকা বলা উচিত, সকলেই মেয়ে। হয় গেইশা নয়ত "মাইকো"। যারা এখনো শিক্ষানবিশ আছে, পুরোপুরি গেইশা হয়ে ওঠেনি, তাদের বলা হয় মাইকো।

"কামোগাওয়া ওদোরি"র নাচ-গান-অভিনয়, বিশেষ করে এদের চমকপ্রদ স্টেজ-ক্র্যাফট নাকি বিশ্বের সব দেশের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রথমে একক, দ্বৈত, সমবেত নানা রকম নৃত্য পরিবেশিত হল। আমাদের দেশের লোকনৃত্যের মত। কোন নাচের নাম "গ্রামের পরব", কোনোটার নাম "চন্দ্রমল্লিকা নৃত্য"। "জাপানী ব্রোকেড নৃত্য" নামে ফুলে ভরা ঠেলাগাড়ী

নিয়ে সমবেত নাচ বেশ নূতন রকম মনে হল। এছাড়া শরৎ ঋতুর নাচ ও বর্ষাকালের নাচও ছিল।

বিরতির পর শুরু হল গেইশাদের অপেরা "সাউণ্ড অব দি লেক"। লেক বিওয়া নামে সরোবরকে ঘিরে এক প্রেমিক যুগলের ট্র্যাজেডি এর উপাখ্যান। সুজুমি হল এক ধরনের জাপানী ড্রাম, অনেকটা মৃদঙ্গের মত আকৃতি। এই অপেরার নায়ক রাজ-দরবারে ড্রাম-বাদক টাকেনোজো। রাজনর্তকী সাজানামি তাকে মন দিয়েছে। কিন্তু সুন্দরী সাজানামির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন মহারাজ স্বয়ং। ড্রামবাদকের হাতে ড্র্যাগনের চামড়ার তৈরী এক অভিশপ্ত ড্রাম তুলে দিয়ে বলা হয়েছে এই ড্রামে বোল না তুলতে পারলে মৃত্যুদণ্ড হবে তার।

শীতের রাত্রে গায়ে বরফ-শীতল জল ঢালতে ঢালতে সাজানামি পুজো করছে তার প্রেমিকের জন্য। মূর্ছিতপ্রায় সাজানামির সামনে দেখা দিলেন বিওয়া হ্রদের ড্র্যাগন দেবী। দেবী বললেন, সাজানামির জীবনের বিনিময়ে অভিশপ্ত ড্রামে বোল ফুটবে।

পরের দৃশ্যে স্টেজের ওপর ঝর ঝর করে ঝরনার জল পড়ছে দেখা গেল। মেয়েরা নেচে নেচে মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা তুলছে রাজার জন্য। জাপানী পাখা হাতে নাচতে নাচতে সাজানামি নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে আর অমনি টাকেনোজোর ড্রাম বেজে উঠল গভীর গুম গুম আওয়াজ তুলে। জলকণায় ভরে গেল স্টেজ। ঝাপসা-ভাব কাটতে দেখা গেল সাজানামির মৃত্যু হয়নি। একজন রাজপুরুষ বাঁচিয়ে দিয়েছেন ওঁকে।

এদের স্টেজক্র্যাফট চমকপ্রদ একথা শুনেছিলাম, পরের দৃশ্যে পরিচয় পেলাম তার। পুরো স্টেজ তখন লেক বিওয়া। উত্তাল ঢেউ সরোবরে। তাতে নৌকো বেয়ে চলেছে নায়ক আর তার প্রাণদণ্ডের আদেশ সহ এক রাজপুরুষ। দুলে দুলে উঠছে নৌকো। স্টেজের ওপর জল সবই ইলিউশন—দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু মঞ্চশিল্পীরা খুব সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এই বিভ্রম। নৌকোর ওপর যুদ্ধ হল তরবারী নিয়ে, তারপর নায়ককে ঠেলে জলে ফেলে দিলে হত্যাকারী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড় ঘনিয়ে এল আরো। সরোবরের উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় ছোট একটি নৌকোতে নায়িকা সাজানামি, একটি জাপানী লণ্ঠন জ্বলছে নৌকোর পাটাতনে। প্রেমিকের সন্ধানে এসেছে বিরহিণী নায়িকা। ঝড়ের বেগে নায়িকাও ডুবে গেল সরোবরে।

শেষ দৃশ্যে পাতালপুরী। ড্র্যাগন দেবীর সামনে টাকেনোজো ড্রাম বাজাচ্ছে আর নাচছে সাজানামি। দেবী বর দিলেন এই মুহূর্ত অমর হয়ে থাকবে ওদের জীবনে। চিরদিন বাজনা বাজাবে টাকেনোজো আর নাচবে সাজানামি। ওদের মিলন হবে অক্ষয়।

"তোমাদের কি খুব বোরিং লাগল?"—ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন ইয়ামাগুচি, আকাশি ও অন্যান্যরা। কী আশ্চর্য! বোরিং লাগতে যাবে কেন? যদিও গানের ভাষা বুঝিনি তবুও মোটের উপর বুঝে গিয়েছি পুরো নাটক।

সেদিন সন্ধ্যার পর আবার পণ্টো চো-র লণ্ঠন জ্বালা অলিগলিতে ঘুরে একটা ছোট কাঠের বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলাম। একশ বছরেরও বেশী পুরনো একটি খাবার জায়গা এখানে। সেদিন কিওটো শহরের নাগরিকেরা কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন। মিয়াকো হোটেল থেকে সকলে একসঙ্গে হয়ে এখানে আসা হল। এই সরু গলিতে পর পর অনেকগুলো আধুনিক স্ট্রীমলাইনড জাপানী গাড়ী দাঁড়ালো, আর একটা সাংঘাতিক ভাল চেহারার রোলস্ রয়েস। এই প্রাচীন গলির নীরব, নির্জন পরিবেশের সঙ্গে গাড়ীগুলো নিতান্তই বেমানান। ছোট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সংকীর্ণ উঠোন, তার এক পাশে কাঠের একখানা ঘর। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সিঁড়িতে জুতো খুলে সবাই ঘরে ঢুকলাম।

ঘরের এক দেওয়ালে একটি মাত্র ছবি। মেঝেতে নীচু টেবিলে খাবার আয়োজন, টেবিল ঘিরে নরম কুশন পাতা। ঘরের এক কোণে ঘর গরম করার হিটার, অন্য কোণে মাটিতে রাখা টেলিফোন। বাঁশের স্ক্রীন থেকে ঝুলছে কয়েকটা হ্যাঙার। সকলে কোট খুলে তাতে ঝুলিয়ে দিলেন আর তারপর হাঁটু মুড়ে বসে গেলেন। এই সব বৃদ্ধ জেনারেলদের যখন-তখন হাঁটু

মুড়ে বজ্রাসন হয়ে বসে যাওয়া দেখে তাক্ লেগে যেত আমার। দুটি গেইশা হাসি হাসি মুখে এসে অতিথি পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু'জনের মধ্যে একজন বেশ প্রবীণা।

প্রবীণা বলছিলেন, ওদের এই জায়গার নাম Golden Bowl বলা যেতে পারে, স্বর্ণপাত্র। কারণ এক সময় ওঁরা অতিথিদের সোনার পাত্রে খাবার পরিবেশন করতেন। জাপানীরা থালায় খায় না—নানা আকারের বাটিতে খায়। ওদেরও ছিল বিভিন্ন আকারের সোনার পাত্র। একবার ডাকাতি হয়ে সব সোনার বাসন লুঠ হয়ে যায়। এখন পোর্সেলিনের বাসনই ব্যবহার হয়। কিন্তু স্বর্ণপাত্র নামটি রয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে নবীনা গেইশা খাবার আয়োজন প্রস্তুত করে ফেলেছে। টেবিলের ওপর সার সার কয়েকটা উনুন বসিয়েছে। তাতে বাঁশের চুপড়ি বসালো, চুপড়িতে পেতে দিল সাদা কাগজ। সেই কাগজপাতা চুপড়িতে ব্রথ ঢেলে দিয়ে যখন উনুন জ্বেলে দিল আমি তো অবাক। কাগজ পুড়ে যাবে না? বাঁশের চুপড়ির ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবে না ঝোল? নবীনা হেসে কী সব বললে। শুনলাম ভয়ের কিছু নেই। একটু পরেই ব্রথ টগবগ করে ফুটতে লাগল। প্রবীণা ও নবীনাতে মিলে যাবতীয় তরকারী ও মাংসের টুকরো তাতে ফেলে রাঁধতে বসল। আমাদের বললে, চপস্টিক দিয়ে তুলবার সময় সাবধানে তুলো, কাগজে যেন খোঁচা না লাগে।

বড় বড় পাথরের কুঁজোতে "সাকে" রাখল টেবিলে আর ঢেলে খাবার জন্য দিল ছোট ছোট কুঁজো। জাপানী ডিনারে ওরা সাধারণত সাকে খেলেও অনেক সময় বিয়ারও নিতে দেখেছি। খাবার টেবিলে বসে ফুজিয়ারা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে অর্ডার দিতেন "বির-অ, বির-অ"। ওঁরা ঐভাবে উচ্চারণ করেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন "জুস-অ, জুস-অ"। অমনি এসে যেত সাত্ত্বিক ফলের রস। তরুণ দুই জাপানী ইয়োকোটা জুনিয়র আর ইয়ামাগুচি জুনিয়র আমার সঙ্গে সব সময় "জুস-অ" পান করে চলেছে দেখতাম। আমি ওদের বললাম, তোমরা কি আমাকে সঙ্গ দিতে চাইছ, তার চাইতে তোমাদের যা ইচ্ছা নাও না। ওরা বললে, না-না,

আপনার জন্য শুধু নয়, আমরা তো গাড়ী ড্রাইভ করছি সব সময়, জাপানে আইনকানুন খুব কড়া। দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা হলে অ্যালকোহলিক ড্রিংক করেছি প্রমাণ করতে পারলে খুব মুশকিল।

রান্না তৈরী হয়ে যাওয়াতে জাপানী মেয়ে দুটি চপস্টিক দিয়ে আমাদের পরিবেশন করতে লাগল আর খুব যত্ন করে, পীড়াপীড়ি করে খাওয়াতে বসল। ওরা বললে, এ হল চিকেন ব্রথ বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। সেটা একটা সিক্রেট। অনেকদিন ধরে মুর্গীদের তরিবৎ করতে হয়, তবেই এই ব্রথ করা যাবে। এর এক চুমুক খাওয়া মানেই নাকি দশ বছর পরমায়ু বেড়ে যাওয়া। আমার যে অত দীর্ঘ দিন পরমায়ু বাড়াবার ইচ্ছা ছিল তা নয় কিন্তু পীড়াপীড়িতে কয়েকবার নিতেই হল।

সেদিন কিওটোর কয়েক জন বিশিষ্ট নাগরিক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন কবি। তাঁর ছদ্মনাম সুগিতা। ঐ নামেই উনি বিখ্যাত। আসল নামটা জানাই হল না। আর একজন ছিলেন মস্ত বড় ব্যবসায়ী সংস্থার মালিক। টোকিও, কিওটো ছাড়াও তাঁর প্যারিসে আছে নিজস্ব কোম্পানি। ওঁদের নিজস্ব উচ্চারণ মত ফুজিয়ারা বললেন, উনি একটা বিরাট কোম্পানীর "প্রেসিডেণ্টো"। এই প্রেসিডেণ্টো ভদ্রলোকের নাম ইয়ামাজাকি, বেশ হাসিখুশি, রসিক। উনি বলে উঠলেন, গান হোক এবার, গান। কী গান হবে ? ট্যাগোর সঙ্‌? ফুজিয়ারা বললেন, না আজ আই এন এ সঙ্‌ হোক। ততক্ষণে আমাদের সাবু-সাবু খাওয়া হয়ে গেছে। ফুজিয়ারার অর্ডার মত "রাইস-অ" দিয়ে গেছে। ছোট ছোট বাটিতে আঠা আঠা ভাত, তাতে জাপানী আচার ফেলে শেষ পাতে খাওয়া হচ্ছে। জাপানীরা মিষ্টি বড় একটা খায় না। ভাতের পর এল ডেজার্ট ফলের টুকরো।

এর মধ্যে গান শুরু হয়ে গেল। সকলেই বেশ প্রাণোচ্ছল হয়ে আছেন। আই এন এ সঙ দিয়ে শুরু হল। তারপর সকলে নিজে থেকে গান ধরছেন, কাউকে অনুরোধ করতে হচ্ছে না। কবি সুগিতা একটি কোরিয়ার লোকসঙ্গীত শোনালেন। আমাদের প্রেসিডেণ্ট ইয়ামাজাকি জাপানের

জনপ্রিয় রোমান্টিক গান "ভাঙা দুর্গের ওপরে চাঁদ" দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয় করে গাইলেন। তরুণ অধ্যাপক ইয়োকোয়ামা বললেন, আমি শোনাবো মাঞ্চুরিয়ার গান। ইয়ামাগুচির মনে পড়ে গেল যুদ্ধের সময়ে সিঙ্গাপুরে সৈনিক জীবনের স্মৃতি। উনি ধরলেন এক মার্চিং সঙ। সিঙ্গাপুরে মার্চ করতে করতে এই গান গাইতেন ওঁরা।

হিন্দি গানের ভাব বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম ফুজিয়ারাকে।

একদিন ও খো গয়া, হম্‌সে জুদা হো গয়া
ক্যা মহলকি ঝোপড়ি, সবভি আঁখ রো পড়ি
লোটকে আয়া নেহি, ও দূরকা মেহমান।

—'একদিন সে হারিয়ে গেল, আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল তার। কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, সকলের চোখে জল। সেই দূরের অতিথি আর ফিরে এল না।'

দেখলাম ফুজিয়ারার চোখ ছলছল করছে। নিজের পাত্রে সাকে ঢালতে ঢালতে বললেন, কিওটোর এই সন্ধ্যা অনেক দিন মনে থাকবে আমার।

আমাদের টোকিও ফিরে যাবার দিন এসে পড়ছিল। কিন্তু নারাতে বুদ্ধ প্রণাম না করে ফিরে যাওয়া হবে না, ফুজিয়ারার অর্ডার। যেদিন আমরা নিজো কাস্‌ল দেখতে গেলাম, সেদিনই ইয়োকোয়ামা আমাকে বলল, ফুজিয়ারা কত কাণ্ড করেছেন জানো না তো। ওদিকে নিজো রাজপ্রাসাদে লর্ড অব দি কাস্‌ল তোমাদের অভ্যর্থনা করবেন। আর নারাতে প্রধান পুরোহিত স্বয়ং তৈরী হচ্ছেন, তোমাদের রিসিভ করবেন।

নিজো কাস্‌ল-এ পৌঁছে দেখি লর্ড বলতে ডিরেকটর অব দি কাস্‌ল গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি নিজে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতে আমাদের খুব সুবিধা হল। ভিতরে সার সার দরবার-কক্ষ, তার দেওয়ালে বিখ্যাত জাপানী চিত্রকরদের আঁকা ছবি। কানো পরিবার জাপানের বিখ্যাত শিল্পীপরিবার। নিজো প্রাসাদের দেওয়ালে জীবজন্তু, পাখীর ছবি তানিউ কানোর আঁকা। অন্দরমহলের চেরীফুলের ছবি আর একজন কানো—কানো নাওনোবু এঁকেছিলেন। ডিরেকটর সাহেব বলছিলেন, নিজো

কাস্‌লের স্থাপত্য ওঁদের বিখ্যাত মোমোয়ামা পিরিয়ডের স্থাপত্যর নমুনা। এই প্রাসাদের নাইটেঙ্গল ফ্লোর আর একটি বিস্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন। রাজার দরবার কক্ষের বাইরে দীর্ঘ করিডোরের মেঝে এমনভাবে তৈরী যে তার ওপর দিয়ে হাঁটলেই এক ধরনের মৃদু আওয়াজ হবে। বাইরে যে কেউ আসছে বুঝতে পারলেই সাবধান হয়ে যাবেন।

প্রাসাদের বাইরে সুন্দর বাগান। ছোট ছোট লেকে রঙিন মাছ। বাগানের এককোণে টি-সেরেমনির কুটির। কাস্‌লের ডিরেকটরের নাম টাকাহাসি। জাপানে অনেকেরই দেখলাম এই নাম। অনেকদিন আগে আনন্দবাজারে ছোট একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল "টাকাহাসির মুখে হাসি"। এক জাপানী ট্যুরিস্টের টাকা-পয়সা খোয়া গিয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। পুলিস খুঁজেপেতে সেই টাকা ফিরিয়ে দেয় ভদ্রলোককে। তখন তাঁর মুখে হাসি ফোটে। আমাদের টাকাহাসিও হাসিমুখে আমাদের প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখালেন। চলে আসার আগে কিওটোর মেয়রের পক্ষ থেকে কিওটোর ওপর লেখা এক মস্ত মোটা বই উপহার পেলাম।

"কাবুকি" আগে দেখেছি কিন্তু জাপানের "নো" থিয়েটারে আগে কখনো যাইনি। কিওটোর "নো" থিয়েটার শুনলাম খুবই বিখ্যাত। আর অন্তত ছয়-সাতটি নামকরা "নো" থিয়েটার গ্রুপ আছে শহরে। তাই ইয়ামাগুচি আমাদের একদিন "নো" থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। আমরা যখন আসন গ্রহণ করলাম, একপাশে উঁচু কাঠের মঞ্চে নাচ-গান সহ অভিনয় চলছে। অনেকটা আমাদের যাত্রার মত। গেইশাদের অভিনয়ে সব ভূমিকায় ছিল মেয়েরা। এখানে দেখলাম অভিনেতারা সবাই পুরুষ। শুনলাম একটা দেশপ্রেমের উপাখ্যান নিয়ে নাটক চলছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এত ধীরগতিতে চলছিল যে, আমার মত বিদেশীর পক্ষে রস উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। খুব চড়া সুরে, মিহি গলায় কী যেন করুণ গান চলছে তো চলছেই। তারপর নাচের মুদ্রা পরিবর্তন করতে লাগছে কুড়ি মিনিট। খানিক পর আমার অবস্থা বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। অথচ জাপানী বন্ধুরা বেশ উপভোগ করছেন, কিছু বলাও যায় না। আমি

নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, দেখো এরা সব নেতাজীর সহযোগী, কত ভালবেসে "নো" দেখাতে নিয়ে এসেছেন, তোমার ভাল লাগতেই হবে। চেষ্টা করলে কী না হয়।

ইয়ামাগুচি একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, জানো তো, নেতাজীকে একবার "নো" দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম।—তাই নাকি! জানতাম না। ইয়ামাগুচি আবার বললেন, নেতাজী আধঘন্টা চুপচাপ বসে দেখলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অসম্ভব, আধঘন্টার বেশী আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে 'নো' দেখা সম্ভব নয়।" উপস্থিত সকলে হেসে উঠলেন। আমি তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেখেছি।

অভিনেতারা আমাদের সাজঘরে নিয়ে গেলেন। "নো" থিয়েটার গ্রুপ সাধারণত নাকি এক একটি পরিবারকে ঘিরে গড়ে ওঠে। এটি একটি বিশিষ্ট পারিবারিক গ্রুপ। অভিনেতারা পুরুষ হলেও দলনেত্রী এবং পরিবারের কর্ত্রী এক বৃদ্ধা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তিনি সাজঘরে সব তদারক করছেন। নায়ককে তখন একটা ব্রোকেডের কিমনো পরানো হচ্ছে। সেটা এত ভারি যে বেচারা নড়তে পারছে না। আমাদের নীচু হয়ে অভিবাদন করতে পারছে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিল। বৃদ্ধাকে ঘিরে আমরা মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসলাম এবং বিচিত্র বেশভূষায় সাজগোজ দেখলাম। বলতে বাধা নেই, মঞ্চের চাইতে সাজঘরের কার্যকলাপ আমার কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হল। বৃদ্ধা জাপানীতে কথা বলে চলেছিলেন। একবার দোভাষী আমাকে বললে, উনি বলছেন, তোমার ওভাবে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে হয়ত কষ্ট হচ্ছে, তুমি সহজভাবে বসো। বুঝলাম বৃদ্ধার চোখ আছে সব দিকে। বিদায় নেবার সময় ওদের প্রথা মত লাল সিল্কের রুমালে বেঁধে থিয়েটারের স্যুভেনির দিলেন আমাদের হাতে।

॥ ১৫ ॥

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে প্রধান পুরোহিতের পিছনে বিরাট বুদ্ধমূর্তি প্রদক্ষিণ করলাম। নারা শহরে টোডাইজি মন্দিরের এই বিরাট বুদ্ধকে ওঁরা বলেন বৈরোচন বুদ্ধ। পাখির গানে, রঙীন ফুলের শোভায়, আকাশের মেঘে, নদীর জলে—সব কিছুর মধ্য দিয়ে বুদ্ধের বার্তা পৌঁছচ্ছে মানুষের কাছে। অবতংসক সূত্র অনুসারে সম্রাট এই বিশাল কাঠের মন্দিরে বিরাট ব্রোনজের বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান দেশে বুদ্ধের আশীর্বাদে স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে—'সুখবতী' প্রতিষ্ঠা হবে এই ছিল সম্রাটের কামনা। যাঁরা এই মন্দির গড়তে সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্তত একজন ভারতীয় পুরোহিত। নাম তাঁর বোধিসেনা। প্রথম প্রতিষ্ঠার পর অন্তত দু'বার এই বৃহৎ কাঠের মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে একবার, ষোড়শ শতাব্দীতে আর একবার মন্দিরটি নূতন করে গড়তে হয়।

প্রদক্ষিণ শেষ করে যখন মুখ তুলে তাকালাম, দেখলাম তিপ্পান্ন ফুট দীর্ঘ বুদ্ধের চোখে করুণা, হাতে অভয় মুদ্রা। এক বিরাট পদ্মের উপর বুদ্ধ উপবিষ্ট। বুদ্ধের আয়ত লোচন প্রায় চার ফুট দীর্ঘ। পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি আমি, মূর্তির বুড়ো আঙুলের চাইতেও ক্ষুদ্র এক মানুষ। মূর্তির বিশালত্বর কাছে তাই আপনিই মাথা নত হয়ে আসে।

বুদ্ধের সামনে রাখা আছে ফুল ও ফল আর জ্বলছে মোমবাতি। পাশেই রাখা আছে বিরাট ঘণ্টা। পুরোহিত দণ্ডটি তুলে আমার হাতে দিলেন। বেশ ভারী দণ্ড, ওঁর সঙ্গে একসঙ্গেই হাতে নিয়ে দু'বার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম ঢং ঢং। আমরা উঁচু বেদীর ওপর, আর নীচে চেয়ে দেখলাম বেশ ট্যুরিস্টদের ভিড়, আর অনেক হাসিখুশি ছোট ছেলেমেয়ের দল।

"বৈরোচন বুদ্ধের জ্ঞানের আলো পৃথিবীর অন্ধকারতম কোণ আলোকিত করুক"—সম্রাট শোমু-র এই প্রার্থনার সঙ্গে নিজেদের প্রার্থনা যুক্ত করে আমরা মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

'বোধিসেনা', 'অবতংসক', 'বৈরোচন'—এই ধরনের কিছু পরিচিত শব্দ কানে আসছিল কিছুক্ষণ থেকেই। কিন্তু এখন সামনের দিকে চেয়ে আমার চক্ষুস্থির! সামনেই এক বৃহদাকার ব্রোনজের তৈরি ল্যানটার্ন বা বলা যায় আলোকস্তম্ভ। সেই আলোকস্তম্ভের উপর দিকে রিলিফের কাজে মূর্তি ও নানা রকম প্যাটার্ন। আমার চোখ যে প্যানেলে আটকে গেছে সেখানে স্পষ্ট দেখছি এক কৃষ্ণের মূর্তি, বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন পরিচিত ভঙ্গিতে। আজ না হয় কৃষ্ণ-কনসাস্‌নেসের ঢেউ লেগেছে দেশ-বিদেশের তটভূমিতে, কিন্তু সেই অষ্টম শতাব্দীতে দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে জাপানের তখনকার রাজধানীতে কৃষ্ণ কী করে এলেন ভেবে অবাক হলাম!

প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য পুরোহিতদের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। ঘন সবুজ 'ওচা' ও সাদা চ্যাপটা জাপানী বাতাসা। সেখানে বসেই শুনলাম, সম্রাট শোমু জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। উনি চীন দেশ থেকে গানজিন নামে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রচারককে নারাতে নিয়ে আসেন। সেকালে ভ্রমণ ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। চার পাঁচবার চেষ্টার পর গানজিন সমুদ্র পার হয়ে জাপানে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তবুও পথের কষ্টে তাঁর দুই চক্ষু প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নারাতে পৌঁছোবার পর বিরাট বুদ্ধ মন্দিরের সামনে এক দীক্ষা মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। সেই মঞ্চে সম্রাট শোমুকে এবং আরো অনেক জাপানী জ্ঞানী-গুনীকে দীক্ষা দিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু গানজিন।

নারাতে আছে বিখ্যাত ডিয়ার পার্ক। এত নির্ভীক ও পোষমানা হরিণ একসঙ্গে আগে দেখিনি। মনে হল এরা বুদ্ধের অহিংসা ও শান্তির বাণীর জীবন্ত প্রতীক। গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতে সব এসে ঘিরে ধরল। কেউ শাড়ির আঁচলে মুখ ঘষতে চায়, কেউ হাত থেকে বিস্কুট খেতে চায়।

নারা শহর এ সময়ে ইস্কুলের ছেলেমেয়েতে ভরতি। কালো প্যান্ট-কোট, কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ—এই ইউনিফর্ম পরা একদল ছেলেমেয়ে আমার কিঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে হরিণকে বিস্কুট খাওয়ানো দেখে হেসেই অস্থির।

হরিণদের খাইয়ে-দাইয়ে তারপর নিজেরা লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। নারা হোটেলের পাশে কিকুসাই বলে বেশ ছিমছাম ওয়েস্টার্ন খাবার জায়গা। তা চেয়ার-টেবিলে বসে স্যুপ দিয়ে শুরু করে পুডিং দিয়ে শেষ ওয়েস্টার্ন লাঞ্চ খেতে মন্দ লাগল না। নয়ত মাটিতে বসে কাঁচা মাছ বা টেমপুরা, স্থকিয়াকি বা সাবু-সাবু খাওয়া বেশ অভ্যাস হয়ে এসেছিল আমাদের।

লাঞ্চের পর গেলাম টোশোডাই-জি মন্দির দেখতে। কারণ টোশোডাই-জি না দেখলে গানজিন নামে যে চীনা ধর্মপ্রচারকের গল্প আগে শুনলাম, তার কাহিনী ঠিক শেষ হবে না।

মনে হল শহর থেকে দূরে মাঠঘাটের মধ্যে টোশোডাই-জি মন্দির অবস্থিত। কিন্তু জাপানী বন্ধুরা বললেন, এখন এরকম মনে হচ্ছে। আসলে আজ যেখানে টোশোডাই-জি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, এক সময় সেখানেই ছিল নারা শহরের কেন্দ্র। এখন শহর দূরে সরে গেছে। বৃদ্ধ পুরোহিত গানজিন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই কাটান। এই মন্দির চত্বরে রয়েছে ওঁর সমাধি। আর পাশেই একটি সুন্দর কাঠের মন্দিরে ওঁর এক মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। কাঠের ওপর ল্যাকারের কাজ করা অপূর্ব মূর্তি। কিন্তু বছরে মাত্র একদিন তার দরজা খোলা হয় দর্শনের জন্য। তাই বোধহয় একে বলা হয় সিক্রেট বুদ্ধ।

আমাদের মূর্তি দেখা হবে না আগেই সে কথা শুনলাম। কিন্তু মন্দির চত্বরে পা দিয়ে দেখি সামনের করিডর ধরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন মুণ্ডিত মস্তক, সৌম্য চেহারা, বৃদ্ধ ভিক্ষুক গানজিন স্বয়ং! এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আরো কয়েকজন অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ শ্রমণ! কী ব্যাপার। স্বপ্ন দেখছি নাকি! না, তা নয়। গানজিনের জীবন নিয়ে একটি ফিল্ম তৈরী হচ্ছে, তারই শুটিং চলছে। গানজিনের হেঁটে চলে যাওয়ার একটি

দৃশ্যের শট্ নেওয়া হল।

এই সব মন্দির শুধু যে দেবস্থান ছিল তা নয়। আমাদের নালন্দার মত শিক্ষাক্ষেত্রও ছিল। তাই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে লেকচার হল, ঘণ্টাঘর, দীক্ষা-মঞ্চ–এসব তো রয়েছেই।

বেলা থাকতেই আমরা নারা থেকে কিওটোর পথে রওনা হলাম। সাধারণত দু'খানা গাড়ী সব সময় ড্রাইভ করছিলেন ইয়ামাগুচি জুনিয়র আর ইয়োকোটা জুনিয়র। কিন্তু নারা যাবার দিন একজন প্রফেশন্যাল ড্রাইভারও সঙ্গে ছিলেন। একটা জিনিস দেখে খুব ভাল লাগছিল, এই জাপানী ড্রাইভার দুপুরে আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেলেন। পরে রাত্রে যখন কিওটোর এক অভিজাত রেস্তোরাঁতে জাপানী প্রথায় খেতে বসলাম, সেখানেও তিনি আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন।

কিওটো-নারা-কিওটো পথ বেশ সুন্দর। মাঝে মাঝে কমলালেবুর গাছ, লোকালয়ে ছোট-ছোট দোতলা কাঠের বাড়ী, বাড়ীর সামনে ফুল ফুটে আছে। পথঘাট যত প্রশস্ত তুলনায় লোকচলাচল কম। সে কথা বলাতে বন্ধুরা একটু অবাক হয়ে বললেন, এখন তো পথ ফাঁকাই হবে, সবাই তো কাজে গেছে। তাও তো বটে। খামোখা পথে পথে ঘুরে বেড়ানো বা রকে বসে আড্ডা দেবার সময় কোথায় জাপানীদের ?

বেলাবেলি কিওটো ফিরে এসে আমরা অবশ্য জাপানী রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করলাম। মিছিমিছি পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। সেদিন শহরের আধুনিক অঞ্চল, দোকান-পাট যেদিকে, সে সব দিকে ঘুরে দেখা হল। কী চাই ? জাপানী সিল্ক আছে, মিকিমাটো মুক্তো আছে, বই আছে, ছবির প্রিণ্ট আছে। প্রাণভরে উইণ্ডো শপিং করা যেতে পারে, কোন বাধা নেই।

চলে আসার দিন আমরা এক উৎসব-মুখর কিওটো শহর পিছনে ফেলে এলাম। সেদিন জাপানের জাতীয় দিবস, মেইজি সম্রাটের জন্মদিন। শহরের প্রধান রাজপথে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। ছোট ছেলেমেয়ের দল পতাকা হাতে গান গাইছে, মিছিল করে চলেছে। আমাদের জাপানী বন্ধুরা কেউ

কেউ সেদিন পরেছেন ওঁদের জাতীয় পোশাক, আর পায়ে দিয়েছেন খড়ম। সুন্দরী মেয়েরা কিমনো পরে ঘুরছে ফিরছে। জাপানী মেয়েরা আজকাল পাশ্চাত্ত্য পোশাক স্কার্ট-ব্লাউজ পরতেই পছন্দ করেন। কিমনোর চল্ প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু এখন ফ্যাশন জগতে একটা আন্দোলন চলছে 'ব্যাক্ টু কিমনো।' তাই মেয়েরা উৎসবের দিনে কিমনো পরে সেজেছেন। একটা মস্ত কিমনো মেলা চলছে। তাতে কোন ঋতুতে কোন ধরনের কিমনো পরতে হবে তার প্রদর্শনী চলছে। মেয়েরাও উৎসুক চিত্তে দেখে নিচ্ছেন 'পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস'।

কিওটো স্টেশন থেকে বুলেট ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগেই সিল্কের রুমালে বাঁধা এক পুঁটুলি আমাদের হাতে পৌঁছে গেল। সেই যে আমাদের জন্য ঘণ্টা ছাঁচে বসানো হয়েছিল তা তৈরী হয়ে গেছে। পুঁটুলি খুলে দেখার আর সময় হল না। তাড়াতাড়ি ভরে নিলাম ছোট হ্যাণ্ডব্যাগে।

কিওটো থেকে টোকিও যেদিন ফিরে এলাম, সেদিনই সন্ধ্যায় টোকিওর ইচিগাওয়া কাইকান বা আর্মি ক্লাবে একটি বড় বৈঠক বসবার কথা। বৈঠক শেষে আছে বিরাট ব্যাঙ্কোয়েটের আয়োজন। এই বৈঠক ও ব্যাঙ্কোয়েটের উদ্যোক্তা টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটি।

আগে থাকতে ভেবে রেখেছি স্টেশন থেকে বাড়ী পৌঁছে চটপট তৈরী হয়ে নিতে হবে। ইচিগাওয়া কাইকানে এই সভা বেশ বড় ব্যাপার হবে মনে হয়। ইম্ফল যুদ্ধের অফিসাররা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ইচিগাওয়া কাইকোশাতে। সেটা ছিল একটি ছোটখাট আর্মি ক্লাব। কিন্তু এই ইচিগাওয়া কাইকান হল ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বিরাট আর্মি ক্লাব।

এদিকে বুলেট ট্রেনের ডাইনিং কার-এ বসে লাঞ্চ খেতে খেতে ফুজিয়ারা বললেন, স্টেশন থেকে বাড়ী ফিরে যাওয়া চলবে না। আমরা সোজা চলে যাব ইচিগাওয়া কাইকান। সে কী! সেই কোন সকালে মিয়াকো হোটেল থেকে বেরিয়েছি। সারা সকাল কিওটোর পথে পথে ঘুরে মেইজি উৎসবেই আনন্দের ভাগ নিয়েছি। তারপর এই ট্রেন জার্নি। একবার বাড়ী হয়ে

গেলে হত না! ফুজিয়ারা বললেন, না, টোকিওর পথে এই সময় হবে ট্র্যাফিকের পিক্ আওয়ার। একবার স্টেশন থেকে ইণ্টারন্যাশনেল হাউজ, আবার সেখান থেকে অনুষ্ঠানে যেতে গেলে লেট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আসবেন অনেকে, লেট হওয়া ঠিক হবে না। একেই তো টোকিওতে আমাদের প্রথম দিনের এমনি এক বড় বৈঠকে আমরা হাজির হতে পারিনি, ফুকুওকাতে আটকে পড়েছিলাম। জেনারেল সাহেবের আদেশ শিরোধার্য করে নিলাম। টোকিওর বন্ধুদের সঙ্গে এই শেষ ব্যাঙ্কোয়েটে যে একটি বিশেষ শাড়ী পরব ভেবে রেখেছিলাম, এরকম একটা তুচ্ছ কথা তো আর সেনাপতির কানে তোলা যায় না।

'ইচিগাওয়া কাইকান'-এর গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ফুজিয়ারা বললেন, স্টেশন থেকে সোজা চলে আসাতে বোধহয় একটু 'বিফোর টাইম' এসে গেলাম। তা আর কী হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিতে পারো, মুখ-হাত ধুয়ে নিতে পারো।

দেখা গেল খুব একটা আগে এসে পৌঁছনো হয়নি। বেশ কয়েকজন অভ্যাগত এরই মধ্যে এসে গেছেন। ঢুকতেই যাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হল, তিনি মিসেস এমোরির মেয়ে কাজুকো মাত্‌সুশিমা। শ্রীমতী কাজুকো ভারী হাসিখুশি, মিশুকে মহিলা। জাপানী ও ইংরাজী মিশিয়ে অনর্গল কথা বলে চলছেন। ওঁর মা মিসেস কিকুকো এমোরির ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা ছিল অপরিসীম। অথচ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওঁর এই আগ্রহের সূচনা হয়েছিল বেশ আকস্মিকভাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে একদিন মেইজি শ্রাইনের 'তোরি' বা তোরণের সামনে মিসেস এমোরির এক অল্পবয়সী ভারতীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটিকে উনি বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়ালেন। ছেলেটি ছিল নেতাজীর ক্যাডেটদের অন্যতম। ওর কাছেই মিসেস এমোরি শুনলেন, পঁয়তাল্লিশটি ভারতীয় ছেলে টোকিওর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনো করতে এসেছে। ওদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পাঠিয়েছেন। ওরা মাতৃভূমির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। এদের উৎসাহ ও দেশপ্রেম

মিসেস এমোরিকে মুগ্ধ করল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ করে জাপান সারেণ্ডার করে গেল। যুদ্ধ থেমে গেল। দূর বিদেশে এই টোকিও বয়েজ বা ক্যাডেটরা পড়ল বিপদে। অবশ্য রামমূর্তি ছিলেন, মিসেস সহায় ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে মিসেস এমোরিও এই সব ছেলেদের দেখাশুনোর ভার নিজের ওপর নিলেন। ওঁর শুনে খুব ভয় হল যে, অ্যাংলো-আমেরিকানরা এই সব ছেলেদের নাকি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যেমন করে হোক এদের আগলে রাখতে হবে, উনি মনে মনে ঠিক করলেন।

কাজুকো বলছিলেন—আমি তখন নেহাত ছোট্ট মেয়ে। কিন্তু মার সঙ্গে সঙ্গে এই পঁয়তাল্লিশটি ছেলের সঙ্গে আমারও খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমাকে ডাকত 'টম বয়' কারণ আমি ভারী দুষ্টু ছিলাম। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমি কী করে রুটি-পরোটা বেলতে হয় শিখেছিলাম। এই এমনি করে—হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন কাজুকো। তা ছাড়া, সে সময় ওদের কাছে কয়েকটা হিন্দী গানও শিখেছিলাম। শুনবে ?—বলে বেশ ক' লাইন গেয়ে দিলেন। সুর চেনা চেনা লাগল, যেন হিন্দী ফিল্মের গানের মত। কিন্তু এমন জাপানী উচ্চারণে হিন্দী বলছিলেন যে, তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না।

মিসেস এমোরির সঙ্গে নেতাজীর ক্যাডেটদের এই অন্তরঙ্গতার কথা পরে ক্যাডেটদের মুখেও শুনেছি। ওঁর কাছে মায়ের মত স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল ওরা। টোকিওতে যুদ্ধের সময় খাওয়াদাওয়ার কষ্ট ছিল বেশ। মিসেস এমোরি মাঝে মাঝেই ছেলেদের ডেকে ভাত খাওয়াতেন। ওরাও তেমনি নিজেদের রেশনে পাওয়া চিনি ওঁকে দিয়ে আসত। কয়েক বছর হল মারা গিয়েছেন মিসেস এমোরি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত টোকিওর সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন উনি। শুনে খুব ভাল লাগল, ওঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন টোকিওবাসী ক্যাডেট মিঃ দত্ত।

মিসেস এমোরির সঙ্গে কলকাতায় যখন আমার পরিচয় হয়েছিল তখন উনি বৃদ্ধা। তাই কাজুকো যখন ওঁর মায়ের তরুণী চেহারার একটি ফটো-

গ্রাফ দেখালেন, তখন সুন্দরী জাপানী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতায় মিসেস এমোরি তাঁর সংগৃহীত অনেক নেতাজী ফিল্ম নেতাজী সংগ্রহশালায় দিয়েছিলেন।

ততক্ষণে আমরা ইচিগাওয়া কাইকানের দোতলার প্রশস্ত হলঘরে সম্মিলিত হয়েছি। মিসেস কিমুরা এলেন। বললেন, মিসেস তোজোকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়িতে রেখে এলাম। ওঁর খুব ইচ্ছা আসেন। কিন্তু এই বয়সে এত ধকল সইবে না। বিশেষ করে ফিরতে তো রাত হবে। সব বৃদ্ধ জেনারেলরা বসে আছেন। হায়াশি সুভাষচন্দ্র বসু কমিটির সেক্রেটারি, অনেকক্ষণ থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছেন। হামাদা এসেছেন, একসময়ে কলকাতায় ছিলেন তাই ইংরেজীটা ভাল বলেন। মিঃ চেরপুট এসে ঢুকলেন। উনি এখন ভারতীয় দূতাবাসে চার্জ-দ্য-অ্যাফেয়ার্স। অবতার সিং চলে গেছেন, নতুন রাষ্ট্রদূত এসে পৌঁছন নি। ইয়োকোবরি রয়েছেন। সাহিত্যিক বন্ধু ইয়াশিরোর কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে টেপরেকর্ডার ছাড়াও একটা নূতন জিনিস যোগ হয়েছে। ইয়াশিরোর ভাষায় সেটা 'মেমরি ট্যাবলেট'।

এই মেমরি ট্যাবলেট হল সোনালি বর্ডার দেওয়া রূপোলি পিচবোর্ডের চৌকো টুকরো। ভিজিটরস্ বইয়ে না লিখে এই ট্যাবলেটের ওপর নাম লিখছেন উপস্থিত অভ্যাগতরা। দেখতে দেখতে জাপানী ও ইংরাজী ভাষায় নানা লেখায় চিত্রিত হয়ে আধুনিক চিত্রকলার চেহারা নিল ট্যাবলেট। ইয়াশিরো ঘুরে ঘুরে নাম লেখাচ্ছেন। ট্যাবলেটের ঠিক মাঝখানে ইয়াশিরো লিখেছেন— In memories of our joyful meeting. Ichigaya Kaikan, Tokyo.

আমার দিকে ফিরে বলে নিয়েছেন—'সরি, পুওর ইংলিশ'। সবাইর নাম লেখা হলে পর সেই 'মেমরি ট্যাবলেট' আমার হাতে তুলে দিলেন।

ভিড়ের মধ্যে নেগিশিকে দেখে খুব ভাল লাগল। নেগিশি রেঙ্গুনে, সিঙ্গাপুরে, ব্যাংককে এমনকি সায়গনেও নেতাজীর সঙ্গে দোভাষীর কাজ

করেছেন। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল উনি অন্য কাজে বোম্বাই ও কলকাতা ছিলেন। চুপচাপ মানুষ, কথা বেশী বলেন না। আমরা ধরলাম, কলকাতায় একবার 'নেতাজী অরেশন' দিতে যেতে হবে। উনি খুবই রাজী। জেনারেল কাটাকুরা মাথা নেড়ে বললেন, আমার আর ইণ্ডিয়া যাওয়া হবে না, বুড়ো হয়ে পড়েছি! জেনারেল আরিস্যুয়ে আশির ওপর বয়স হলে কী হয়, উৎসাহী খুব। বললেন, 'আমি ঠিক চলে যাব। উনসত্তর সালে শেষ গিয়েছি, রেড রোডের মাথায় সুন্দর নেতাজী স্ট্যাচু দেখলাম। কে একজন বললে, নর্থ ক্যালকাটায় আর একটা আছে। অমনি ছুটলাম। দেখে এলাম ঘোড়ায় চড়া মূর্তি।' মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আবার যেতে হবে কলকাতায়।'

আমরাও হেসে বললাম, 'বেশ তো, দিস টাইম ইন টোকিও, নেক্সট টাইম ইন ক্যালকাটা।'

ইতিমধ্যে পাশের হলঘরের দরজা খুলে গেল। ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলে খাবারদাবার ও ফুলের সমারোহ।

প্রথমে জেনারেল কাটাকুরা বক্তৃতা করলেন। তিনি টোকিওর এই কমিটির চেয়ারম্যান। নেতাজীর ত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করলেন উনি। তারপর জেনারেল আরিস্যুয়ে কিছু বললেন। জেনারেল কাটাকুরা ভারত-জাপান মৈত্রী সুদৃঢ় হোক—এই আশা ব্যক্ত করে প্রথম আনুষ্ঠানিক 'টোস্ট' প্রোপোজ করলেন। তারপর থেকে আরো বিভিন্ন ধরনের 'টোস্ট' প্রস্তাবিত হল। জেনারেল ফুজিয়ারার উদ্দেশে যখন একটি বিশেষ 'টোস্ট' প্রস্তাব করা হল, তখন সমবেত অভ্যাগতরা হই-হই করে তাতে সায় জানালেন। ফুজিয়ারা লাজুক মুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যাঙ্কোয়েটের শেষে "গান হোক, গান হোক—নেতাজী সং, আই এন এ সং"—রব উঠল। এটা আমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। আমি শুরু করলেই অন্য সকলে যোগ দেবেন সে কথাও জানি। গান খুব জমে উঠল। মিসেস এমোরির মেয়ে এবার যে হিন্দী গান ধরলেন, তার কথা কিছু বুঝতে পারলাম। ক্যাডেটদের কাছে পঁয়ত্রিশ বছর আগে শেখা সেই গান হল—

"ত্নিয়া রঙিলি, এ ত্নিয়া মেরে স্নন্দর বাগিচা।" জাপানী গানও হল। কিন্তু সবার শেষে গান ধরলেন হায়াশি, বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী উচ্চারণে গাইলেন —'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা'—হায়াশির সঙ্গে অনেকে গলা মেলালেন। এই গানের স্বরের রেশ কানে নিয়ে আমরা সেদিন ঘরে ফিরলাম।

॥ ১৬ ॥

প্রবাসের ক্ষণস্থায়ী আবাসের ওপর কখন যেন নিজের অজ্ঞানতে মায়া পড়ে যায়। কিওটো থেকে টোকিওতে "আই-হাউজ"-এ ফিরে মনে হল যেন ফিরে এলাম আপন ঘরে। ইণ্টারন্যাশনাল হাউজ অব জাপানকে ওরা অনেক সময় সংক্ষেপে বলে আই-হাউজ। জাপানী নামটাও শিখে নিয়েছিলাম 'কোকুসাই বাংকো কাইকান'—মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চড়লে ড্রাইভারকে জাপানী নামটা বলতাম, নয়ত হাতে ম্যাপ থাকত, আঙুল দিয়ে কোথায় যেতে চাই বুঝিয়ে দিতে হত।

এই আই-হাউজে সাধারণত দেশবিদেশের স্কলাররা এসে ওঠেন। এর সাজসজ্জায় কোন আড়ম্বর নেই কিন্তু পারিপাট্য আছে। ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া আছে লেখাপড়া করার টেবিল-চেয়ার, টেবিলে রিডিং ল্যাম্প। পড়ুয়াদের স্নখস্নবিধার দিকে এদের নজর। একদিন কাউণ্টারের ছেলেটিকে আমার একটা প্রবলেম বলছিলাম। অনেক বই জমেছে, বেশীর ভাগ অবশ্য জাপানী বই। এত বই নিয়ে দেশবিদেশ ঘুরব কী করে, প্যাক করে উঠতেও পারছি না। সে বললে, নো প্রবলেম, আমাদের কাছে বইগুলো পাঠিয়ে দাও, আমরা এসব কাজ হরদম করছি। অল্পক্ষণের মধ্যে ভারী ভারী চেহারার বই কী চমৎকার হালকা চেহারার প্যাকিং হয়ে ফিরে এল কী বলব!

আই-হাউজের পিছনে আছে সুন্দর জাপানী বাগান। ছোট ছোট কৃত্রিম পাহাড়, জলাশয়, সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে পাথরের টুকরোয় বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথ। পড়াশুনো করতে করতে অবসাদ বোধ হলে কাঁচের স্বচ্ছ দেওয়ালের বাইরে তাকিয়ে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। নীচের কনফারেন্স রুমগুলি দেখতাম সদাব্যস্ত। বেশীর ভাগ অ্যাকাডেমিক মিটিং হলেও একদিন দেখলাম জাপানী বিয়ের রিসেপশন হচ্ছে। কনের পরনে অবশ্য মেমসাহেবদের মত সাদা গাউন, মাথায় ওড়না।

যাই হোক, আই-হাউজে আমাদের দিন শেষ হয়ে আসছিল। টোকিওতে আমাদের শেষদিনটি প্রথম দিনের মতই অতিথি সমাগমে ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। সকালবেলা টিউবে চড়ে একবার শহরের কেন্দ্রে ইম্পিরিয়াল হোটেলের দিকে গেলাম। টিউবে চড়ে আর একটু বেশী ঘুরতে পারলে টোকিও শহর আর শহরের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে আরও বেশী জানা যেত। দু'একবার যা ঘুরেছি তাতে একটা জিনিস চোখে পড়েছিল, জাপানীদের পোশাক-পরিচ্ছদের শালীনতা ও সংযম। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আজকাল পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরছে। কিন্তু আমেরিকাতে যেমন তালিমারা ছেঁড়া জিনস্ পরা ফ্যাসন এখানে তেমন নয়। বেশীর ভাগ লোক স্যুট পরে কাজে চলেছে বা কাজ থেকে ফিরছে। এমন কি বুশ সার্ট-প্যাণ্টও বিশেষ চোখে পড়েনি। মেয়েরাও পরে আছে স্কার্ট-ব্লাউজ বা স্কার্ট ও কোটের টু-পিস্ ড্রেস। ঘুমোবার জামার মত লম্বা, ঝোলা-ঝোলা জামা পরে ঘুরতে একজনকেও দেখিনি। আর পোশাকের রং চড়া নয়, বেশ মৃদু। বেশীর ভাগ ব্রাউন বা ধূসর। অবশ্য কিমনো হলে আলাদা কথা, সেখানে আছে রঙের বাহার।

ইম্পিরিয়াল হোটেলের কাছে শপিং আর্কেড, ট্যুরিস্টদের কেনাকাটার ধুম। আমাদের ভারতীয়দের ওসব ঘোড়া রোগ থাকতে নেই। তাছাড়া জাপানে এলে যে সব জিনিস দেখে তাক্ লেগে যায়—ইলেকট্রনিক জিনিস-পত্র বা রকমারি ক্যামেরা এসব আমাদের দেশের আইনমত নেওয়া বারণ। তাহলে আর নেবার থাকল কী। আমাদের দু'একটা জরুরী জিনিস নেবার

ছিল, যেমন ওষুধ। টোকিও ছাড়বার পর আমরা দেশবিদেশে ঘোরাঘুরির মধ্যে পড়ে যাব। ওষুধের স্টকটা ঠিক থাকা উচিত। কিন্তু সেদিন সঙ্গে ইণ্টারপ্রেটার না থাকাতে একটু অসুবিধা হল। মাথাধরার ওষুধ চাইলে হাত দিয়ে মাথা দেখাই। দোকানদার জাপানী-ইংরেজী ডিক্‌শনারী হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়ায়, আঙুল দিয়ে অসুখের নামটা দেখিয়ে দিলে খুসি হয়ে ওষুধ বার করে দেয়। ওরা যাকে আমেরিকান ড্রাগ স্টোরস বলে, কী জানি কেন সেদিন সেগুলো সবই বন্ধ। জাপানী ওষুধে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, নির্দেশনা সবই জাপানীতে লেখা। এ সব অভিধান কন্‌সাল্‌ট করে কেনাকাটার ফলে সন্দেহ হতে লাগল পেটের অসুখের ওষুধ চাইলে উল্টোটা দিয়ে দিচ্ছে না তো!

কাজ শেষ করে দৌড়তে দৌড়তে ফিরতি টিউব ধরলাম। জানি অনেক অতিথি-অভ্যাগত অপেক্ষা করে থাকবেন। গম্‌গম্‌ করে ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে স্টেশনে থামলে সুর করে স্টেশনের নাম হেঁকে উঠছে— কাসুমিগাসেকি রোপংগি—। পৌঁছে দেখি লাউনজে অনেকে বসে আছেন। মিসেস হাচিয়া এসেছেন, সঙ্গে ছেলে ফুমিও আর নাতি-নাতনী। ইয়োকোবরি হাজির হলেন, হাতে কিছু বইপত্র। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সময়ের কিছু কাগজপত্র নিজের সংগ্রহ থেকে নিয়ে এসেছেন। ছোট শিবুসাওয়া এলেন, হাতে ওঁদের পারিবারিক অ্যালবাম। ১৯৪৩ সালে নেতাজী যে সময়ে ওঁদের বাড়িতে ছিলেন তখনকার ছবিতে ভর্তি। ইয়াশিরো রয়েছেন, আগে থেকেই আর সকলকে তদারক করছেন। চকোলেটের বাক্স খুলেছেন হাচিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য। 'টেলিফোন বাজছিল থেকে থেকে। যাঁরা আসতে পারেননি টেলিফোনে গুডবাই বলছিলেন। একটা টেলিফোন এল, ওদিকে জেনারেল শিডেইর ছেলে কথা বলছেন। কিওটো থেকে আংকল ওকে খবর দিয়েছেন। জেনারেল ফুজিয়ারা এসে পড়লেন। আমাদের টোকিও বাসের দিনগুলিতে ফুজিয়ারা নিত্যদিন ডিউটি দিয়েছেন সকাল আটটা থেকে গভীর রাত্রি। আজ আর উনি বাড়ি ফিরবেন না। টোকিওর এই শেষরজনী উনি আমাদের সঙ্গে থেকে যাবেন

আই-হাউজে। কাল খুব ভোরের ফ্লাইটে আমরা টোকিও ছাড়ব।

কোন আনুষ্ঠানিক বৈঠকের কথা ছিল না। কিন্তু আপনা থেকেই দেখলাম নেতাজী প্রসঙ্গ উঠে পড়েছে। ইয়োকোবরি বলছিলেন, জাপানে নেতাজীর ভূমিকা কী ছিল। এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটা ইন্দো-জাপান—আজকালকার ভাষায় 'প্রোজেক্ট' হয়েছিল—কতখানি তার ব্যর্থতা, সার্থকতাই বা কতটুকু। সামরিক দিক থেকে বিচার করলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হয় কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এর একটা বিলম্বিত অথচ তীব্র প্রতিক্রিয়া হল।

সকলেই একবাক্যে বললেন, জার্মানী থেকে পূর্ব এশিয়া এসে পৌঁছতে নেতাজীর অনেক দেরী হল। যদি উনি আরো কিছুদিন আগে পৌঁছতেন, তবে—এটা একটা ইতিহাসের 'যদি' থেকে যাবে, ও নিয়ে আলোচনা বৃথা। তবে সবই নিয়তি। নয়ত নেতাজী যে বার্লিনে রয়েছেন, প্রয়োজনে উনি যে এদিকে এসে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন, একথাটা তো অনেকদিন ধরে হাওয়ায় ভাসছিল।

দেশ থেকে ওঁর অন্তর্ধান হল ১৯৪১-এর জানুয়ারী। সেই ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসেই কলকাতার জাপানী কনসাল-জেনারেল ওকাজাকি টোকিওর ফরেন অফিসকে খবর দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বোসকে বার্লিনে কনট্যাক্ট করো। স্বয়ং ফরেন মিনিস্টারকেই একথা জানিয়েছেন উনি। আমরা অন্য সূত্র থেকে জানি, এই সময়ে কলকাতায় ওকাজাকির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। ওঁর মারফত বাংলার বিপ্লবীদের জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র জাপান থেকে আনিয়ে দেবার প্রস্তাবও দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়।

ফুজিয়ারা বললেন, আমিও তো সেই ১৯৪১ সালের গোড়ায় ব্যাংককে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিছুদিনের মধ্যেই ওই একটি নাম বারেবারে আমার কানে আসতে থাকে—সুভাষচন্দ্র বোস—। সকলেরই খুব উঁচু ধারণা ওঁর সম্বন্ধে। সকলেই বলাবলি করেন, সুভাষ বোস যদি আসেন ওঁর নেতৃত্বে আমরা সকলে মিলে-মিশে কাজ করতে পারি।

বারবার কথাটা শোনার পর ফুজিয়ারাও হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করলেন যে, এইরকম একজনের কথা শুনতে পাচ্ছেন।

এর মধ্যে ১৯৪১-এর অক্টোবর মাসে ফরেন অফিস থেকে বার্লিনের জাপানী দূতাবাস এক নির্দেশ পেলেন, বোস নামে একজনকে ভাল করে অবজার্ভ করো আর রিপোর্ট পাঠাও। এই ধরনের ডিপ্লোমেটিক আদান-প্রদানে কত যে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে যায়! অবজার্ভ করো বললেই কী করা যায় নাকি। ওদিকে আবার জার্মানরা আছে না? একজন এজেন্ট রিপোর্ট করলে, জার্মানরা হয়ত জাপানীদের এই বোসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা ভাল চোখে দেখবে না, কারণ ওরা নিজেরা নাকি বোসকে 'লাইক এ টাইগার কাব্'—ব্যাঘ্র-শিশুর মত আগলে রাখছে!

বার্লিন জাপানী দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাচে ইয়ামামোটো বেশী সুবিধা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অ্যামবেসেডর ওশিমা নিজেই দেখা করতে চাইলেন। প্রথমবার দেখা হতে নেতাজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ওঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রিপোর্ট চলে গেল টৌকিওতে। কিন্তু কোন অ্যাকশন তো নেওয়া হল না।

অ্যামবেসেডর ওশিমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে জার্মানরা যখন একবার নেতাজীর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করতে অনুমতি দিল, তারপর থেকে ওশিমা, ইয়ামামোটো ও নেতাজী পরস্পর অসংখ্য বার মিলিত হয়েছেন। কিন্তু হলে কী হবে, অমূল্য সময় বয়ে যেতে থাকল। '৪২ সালের এপ্রিল নাগাদ টৌকিও হেডকোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত নিলেন, সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে আসা হোক। কিন্তু তারপরও পুরো একবছর কেটে গেল। কোথায় '৪২ সালের এপ্রিল আর কোথায় '৪৩ সালের মে মাস। এর মধ্যে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বদলে গেছে অনেক।

শেষদিকে অবশ্য সাবমেরিন যাত্রার খুঁটিনাটি ঠিক করতে অনেক সময় লাগল। বিভিন্ন সূত্র থেকে এখন আমরা জানি নেতাজী নিজে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। জাপানী দূতাবাসের কাউনসিলর কাওয়াহারার বাড়ি লাঞ্চ খেতে গেছেন নেতাজী। খাওয়াতে রুচি নেই, প্লেটে খাবারদাবার

নাড়াচাড়া করছেন। এমন সময় কাওয়াহারা জানালেন, সাবমেরিন যাত্রার প্রস্তুতি হয়ে গেছে, খবর এসে গেছে সব ঠিক আছে। মুহূর্তের মধ্যে নেতাজীর মুখের চেহারাই পালটে গিয়েছিল।

ফুজিয়ারা বলছিলেন, একথা ঠিক, আরো আগে সংগঠনে হাত দিতে পারলে নেতাজী নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে নানান বাধাবিপত্তির মধ্যেও কীভাবে এক চমৎকার সংগঠন গড়ে তোলা যায়, তার এক আশ্চর্য ক্ষমতা নেতাজী দেখিয়েছিলেন।

জাপানে পৌঁছতে দেরী হল। তারপর যে কোন কারণেই হোক, তোজোর সঙ্গে দেখা হতেও বেশ সময় লাগল। কিন্তু যেদিন তোজোর সঙ্গে দেখা হল সেদিন কী হল? অমনি আমার মনে পড়ে গেল এক আমেরিকান ঐতিহাসিকের উক্তি—the magic of Bose enchanted Tojo—এর আগেই এই ম্যাজিকের ছোঁয়া লেগেছিল জেনারেল সুগিয়ামার আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেমিৎসুর মনে। এবার স্বয়ং তোজোর পালা।

এই ম্যাজিক যে ঠিক কি তা বুঝিয়ে বলা বা ডিফাইন করা খুব শক্ত। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে অনেকেই এই ম্যাজিকে ধরা পড়তেন। তবে সব জাপানী জেনারেলরা বেশ জোর দিয়ে বলেন, এই ম্যাজিকের মানে এই নয় যে উনি শুধুই একজন চার্মিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উনি দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, আর ছিলেন বিশেষভাবে প্র্যাকটিক্যাল। আরিস্যুয়ে বলেছিলেন, উনি খুব ভাল নেগোশিয়েট করতে পারতেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি ডকুমেণ্টে নেতাজী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে—অবশ্য একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে—বলা হয়েছে…'as usual he was obstinate'. অর্থাৎ কিনা উনি বিশেষ রকম একগুঁয়ে ছিলেন, একবার গোঁ ধরলে জাপানী-দের দিয়ে যা চাই তা করিয়ে না নিয়ে ছাড়তেন না। জাপানীরা স্বীকার করেছে —'it required tremendous negotiating powers to convince Bose about anything'.

তোজোর সঙ্গে নেতাজীর যে বোঝাপড়া হয়েছিল তা কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাই

'৪৪ সালে শেষবার যখন টোকিও এলেন নেতাজী, তখন তোজো যদিও আর প্রধানমন্ত্রী নেই, তবুও নেতাজীর কোন অসুবিধা হল না। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী কয়সো নেতাজীকে একজন মিত্ররাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করলেন। সে সময়কার কাগজপত্রে প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তার। নেতাজীও অনেক রকম চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন নতুন সরকারের কাছ থেকে।

এইসব আলোচনা একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। বেলা পড়ে আসছিল। হাচিয়ার নাতি-নাতনীরা ছটফট করতে শুরু করেছিল। ওঁরা গুডবাই বললেন। একে একে অনেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। ইয়োকোবরি এসময় প্রস্তাব করলেন, আর যে ক'জন আছি সকলে একসঙ্গে মিলে কোথাও গিয়ে সাপার খেয়ে নেওয়া যাক। আমি মৃদু আপত্তি করলাম। প্যাকিং-এ হাত লাগানো হয়নি। কাল ভোর রাত্রে প্লেন। ওরা হইচই করে এসব অজুহাত বাতিল করে দিলেন। বেশীদূর যেতে হবে না। কাছেই কোথাও হেঁটে চলে যাওয়া যাক।

রাত্রে রোপংগির আলো-ঝলমল চেহারা বেশ সুন্দর লাগল। কাঁচের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে দেখছি দোকান-পাট, রেস্তোরাঁ, এমন কি লিফটের ওঠানামা। এক জায়গায় গাড়ী পার্ক করার একটা টার্নটেবিল ব্যবস্থা। গাড়ীটা ঢুকে যাবার পর মেঝেটা ঘুরে যাচ্ছে আর গাড়ীটাকে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছে। আবার যে সব গাড়ী নামবে তাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে নামিয়ে আনার।

জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে পথে হেঁটে যেতে যেতে আমার একটা কথা মনে পড়ল। আন্দামান বিমানবন্দরে সেবার নেতাজীর একটি ছবি টাঙানো হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের সময় নেতাজী আন্দামান বিমানবন্দরে এসে নেমেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছবিতে জাপানী মুখও কিছু দেখা যাচ্ছে। জনৈক সুপরিচিত ভারতীয় ছবিটি দেখে শুচিবায়ুগ্রস্তের মত আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'একি! এখানে জাপানীরা আবার কেন।' কী মুশকিল, উনি কী ভেবেছিলেন ছবিতে উনি ফরাসীদের দেখতে পাবেন।

আসলে এত বছর বাদেও আমাদের কারো কারো মধ্যে নেতাজী কেন জার্মানদের সঙ্গে গেলেন, নেতাজী কেন জাপানীদের সঙ্গে গেলেন এই ছুঁৎমার্গ রয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার বলেন, ওঁর দেশপ্রেমে আমাদের কোন সংশয় নেই, তবে কিনা জার্মান ও জাপানীদের সঙ্গে কাজ করা ঠিক হয়নি।

আমরা তো সকলেই দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি দেশ তার নীতি নির্ধারণ করে কিসে তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হবে সেই কথা মনে রেখে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ সে সময়ে ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন। নেতাজী প্রথম সাক্ষাতে তোজোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জাপান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিঃশর্ত সাহায্য—unconditional help দিতে রাজী কিনা। তোজো তৎক্ষণাৎ 'হ্যাঁ' বলেছিলেন। এর মধ্যে সেই Magic of Bose-এর প্রভাব নিশ্চয় অনেকখানি ছিল। তেমনি একথাও সত্য যে, সেই সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধাদের স্বার্থ ও জাপানের স্বার্থ একই খাতে বইছিল। বাস্তব ঘটনা হল এই, যে দুটি বিদেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ সহায়তা করেছিল, সে দুটি রাষ্ট্র হল জার্মানী ও জাপান।

জাপানে আমরা যতদিন রইলাম, নিরবচ্ছিন্ন ভাল ওয়েদার পেয়েছিলাম। এই শেষদিন সন্ধ্যাবেলা এলোমেলো হাওয়া আর টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। আমরা পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি পথের ধারে এক চীনা রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম। যদিও এ রেস্তোরাঁর যা নাম তার অর্থ ইংরেজীতে দাঁড়ায় roofless—বাংলায় বলা চলে মুক্তাঙ্গন। কিন্তু আমরা বাগানে বড় বড় ছাতার নীচে সাজানো টেবিল চেয়ারে বসলাম না। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে ভেতরের ঘরে ঢুকে বসলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে ইয়াশিরো আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে গোটা দুয়েক হাইকু লিখে ফেললেন।

॥ ১৭ ॥

রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে সুটকেসগুলো প্যাক করার চেষ্টা করছিলাম। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন জেনারেল ফুজিয়ারা। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অন্যমনস্কভাবে আমার প্যাক করা দেখতে লাগলেন। বাক্সতে জিনিসপত্র ধরছে না। জাপানীরা খুব উপহার দিতে ভালবাসে। হয়ত একটি জাপানী হাতপাখা, হয়ত বা জাপানী সিল্কের স্কার্ফ। প্রত্যেকটাই সুদৃশ্য মোড়কে মুড়ে রাখা। বেশীর ভাগ মোড়ক আমি খুলিনি। কারণ মোড়কগুলোও যেন একটা ওয়ার্ক অব আর্ট, খুলতে মায়া হয়। কিন্তু বোঝা গেল, মোড়ক সুদ্ধ নিতে গেলে বাক্সতে দিশী মতে চেপে বসলেও বন্ধ হবে না। অনেক বন্ধুরা আমাদের প্রিয় অন্য ধরনের উপহারও দিয়েছেন—পুরোন, বিবর্ণ ফটোগ্রাফ, ছেড়াখোঁড়া কাগজপত্র, দলিল। সেগুলোও সাবধানে নিতে হবে।

অতএব নির্মমভাবে মোড়ক ছিঁড়তে বসলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরের কোণে রঙীন কাগজের আর লাল, নীল রিবনের স্তূপ হয়ে গেল। কাল পরিচারিকার পরিশ্রম হবে খুব। রোজ সকালে আমি ছোট একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিতাম দরজার বাইরের দিকের হাতলে—তাতে লেখা থাকত, মেইড, ইউ ক্যান ডু দি রুম নাউ। অমনি গদাইমাশতা, গদাইমাশতা বলতে বলতে হাসিখুসি এক পরিচারিকা এসে ঘর সাফ করতে লেগে যেত।

ফুজিয়ারা রীডিং ল্যাম্পটা জ্বেলে নিয়ে খস্‌খস্‌ করে কী সব লিখতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, তাইপের জন্য আরো কিছু চিঠিপত্র লিখছেন। আমার ইয়োকোয়ামার কথা মনে পড়ে গেল। ইয়োকোয়ামা আমাকে ভয় দেখিয়েছে, তাইপেতে তোমাদের জন্য রয়েল ওয়েলকাম অভ্যর্থনা করছে। ফুজিয়ারা খবর দিয়ে দিয়েছেন তাইপের গভর্নরকে, ওদের

ডিফেন্স মিনিস্টারকে, আরো সব কাদের। কাল সকালে আমরা টোকিও থেকে তাইপে যাচ্ছি।

ফুজিয়ারা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'না-না ওসব কিছু নয়, ওর কথা বাদ দাও।' উনি বললেন, 'তবে তোমরা যাতে ওখানে সুব্যবস্থা পাও সেটা দেখতে হবে বৈ কি। ফরমোজার সঙ্গে ভারতবর্ষের ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক নেই কোন। জাপান আর ফরমোজাতে ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক সম্প্রতি ছিন্ন হয়েছে। এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে হঠাৎ কোন অসুবিধায় পড়ে গেলে কী হবে। আমি তাই চিন্তা করছি।' আরো কয়েকটা ফোন নম্বর আমার হাত-ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনে করো এয়ারপোর্টে নেমে দেখলে কেউ তোমাদের রিসিভ করতে আসেনি, তখন এইসব নম্বরে ফোন করবে। আমি অবশ্য সকলকে আগেই লিখে দিয়েছি, তবে চিঠিপত্র পৌঁছল কি না কে জানে!

ফুজিয়ারার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল ওঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আশ্চর্য নয়। যে রকম দৌড়ঝাঁপ করেছেন গত কয়েকদিন! আজ অবশ্য আমাদের ঘরের দুটো ঘর ওপাশে উনি থাকবেন। পাছে বিদেশে আমরা কোন অসুবিধায় পড়ি সেই কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ছেন উনি। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। এই বিদেশী সমরনেতার সঙ্গে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই আমাদের। কিন্তু কী যেন এক অদৃশ্য, সূক্ষ্ম বাঁধনে বাঁধা রয়েছি মনে হয়। এ যেন এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক। মনে হল কাল সকালে ছেড়ে যাব এক পরম আপনার জনকে। অনেক সময় যেখানে ভালবাসা প্রত্যাশিত ছিল সেখান থেকে নেমে আসে আঘাত। তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া কোন কোন মানুষের অহৈতুকী ভালবাসা জীবনকে সহনীয় করে, পৃথিবীকে বাসযোগ্য মনে হয়।

রানী ঝাঁসি বাহিনীর অধিনায়িকা লক্ষ্মী সায়গল (স্বামীনাথন) একবার নেতাজী ভবনে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ফুজিয়ারার মত দরদী বন্ধু ভারতবর্ষের খুব কমই আছে, আমাদের উচিত ওঁকে কোন-না-কোন ভাবে সম্মানিত করা, ফুজিয়ারার জন্য ভারতবর্ষের অনারারি

সিটিজেনশিপ অফার করা উচিত আমাদের।' লক্ষ্মী ঠিকই বলেছিলেন। ফুজিয়ারার কাছে ভারতবাসী ঋণী।

আজকের এই বৃদ্ধ সেনাপতি ১৯৪১ সালে ছিলেন জাপানী আর্মির তরুণ অফিসার মেজর ফুজিয়ারা। ধীরে ধীরে উপরে উঠে যুদ্ধের অনেক পরে উনি জাপানী আর্মির প্রধান বা চেয়ারম্যান-ইন-চীফ হন। ১৯৪১ সালে তরুণ ফুজিয়ারার ওপর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়। ব্যাংককে কিছু ভারতীয় বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের বলতে হবে, জাপান ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করতে আগ্রহী। বিনিময়ে জাপান চায় যে এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলি একযোগে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা co-prosperity sphere গড়ে তুলবে। ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠল, তার নাম দেওয়া হল 'ফুজিয়ারা কিকান' বা 'এফ-কিকান'।

একজন তরুণ অফিসারের পক্ষে এটা খুব বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগে টোকিওর এক মন্দিরে গিয়ে ফুজিয়ারা অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। বিপ্লবী প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে ব্যাংককে ফুজিয়ারা যোগাযোগ করলেন ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে। তারপর জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ডিসেম্বরে মালয়ে একদল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির সৈনিক জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তাদের ইংরেজ অধিনায়ক ফ্রিৎস-প্যাট্রিক গুরুতর আহত হন। পরবর্তী অফিসার ছিলেন মোহন সিং। ফুজিয়ারা ও প্রীতম সিং মোহন সিংকে বললে, মাতৃভূমির মুক্তি যদি চাও তো এই সুযোগ। মোহন সিং ওদের আহ্বানে সাড়া দিলেন। প্রথম আই এন এ-র জন্ম হল মালয় সীমান্তে।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফুজিয়ারা এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অধিনায়ক হলেন। ইংরেজরা বলত, সিঙ্গাপুরের পতন কোনদিন হতে পারে না। সেই সিঙ্গাপুরের পতন হল আর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির পঞ্চাশ হাজার সৈনিক আত্মসমর্পণ করল। ফুজিয়ারা আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের

সারেণ্ডার গ্রহণ করলেন। অপর দিকের ব্রিটিশ ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন লেঃ কর্নেল হাণ্ট।

এর পরের ঘটনা বেশ নাটকীয়। পরাজিত সৈনিকেরা বুঝতেই পারছিল না যে, ফুজিয়ারা তার বক্তৃতায় কী বলছেন। ওরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফুজিয়ারা বলছেন, তোমরা যুদ্ধবন্দী নও, তোমাদের গণ্য করা হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে। আমি তোমাদের আহবান করছি মাতৃভূমির স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দাও। এ এক বিচিত্র ধরনের সারেণ্ডার অনুষ্ঠান। ঐতিহাসিকেরা তাই তো জেনারেল ফুজিয়ারাকে অভিহিত করেছেন Lawrence of Indian national army.

তবে এসব তো অনেকদিন আগের কথা। আজও কেন ফুজিয়ারা ভারতবর্ষের মায়া কাটাতে পারছেন না? ফুজিয়ারার ভারতবর্ষ হল নেতাজীর ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করেছিল। এই ভারতবর্ষে আছে আজকের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ফুজিয়ারা তাই ফিরে ফিরে আসেন এই তিন দেশে। পাকিস্তানে আছেন প্রাক্তন আজাদ হিন্দ অফিসাররা—জমান কিয়ানি, এনায়েৎ কিয়ানি, সৌকত মালিক—কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন হবিবুর রহমান। এই যে ওঁর ভারত উপমহাদেশের ওপর টান, এর মূলে আছে নেতাজীর সেই ম্যাজিক টাচ্—একবার যার এই ছোঁওয়া লেগেছে আর সে ফিরতে পারে না।

ফুজিয়ারা অনেকবার বলেছেন আমাদের নেতাজীর সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হবার কাহিনী। "অনেকদিন ধরে শুধুই নাম শুনছিলাম সুভাষ বোস, সুভাষ বোস। দেখা হল সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে। আমি তো জুনিয়ার অফিসার। আমার চীফ তখন জেনারেল কুনোমুরা। উনি যাবেন নেতাজীর সঙ্গে আসন্ন ইম্ফল অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করতে। সাদার্ন কম্যাণ্ডের জেনারেল মুতাগুচি নির্দেশ পাঠালেন আমিও যেন কুনোমুরার সঙ্গে যাই। তাই আমরা দু'জন নেতাজীর সিঙ্গাপুরের বাসভবনে একদিন হাজির হলাম।"

বাড়ীর গেটের কাছে জেনারেল ভোঁসলে, সায়গল, ধীলন, হবিবুর

রহমান সকলে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। ভিতরে আগে কুনোমুরার সঙ্গে নেতাজী সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। তারপরই ফুজিয়ারার দিকে ফিরে ওঁর হাত চেপে ধরে বললেন—"আপনার কথা বার্লিনে থাকতেই শুনেছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনি, প্রীতম সিং ও মোহন সিংয়ের সঙ্গে মিলে যে প্রথম আই. এন. এ. গড়ে তুলেছিলেন তার জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" নেতাজীর সৌজন্যে ফুজিয়ারা অভিভূত হয়েছিলেন।

আবার ঠিক ইম্ফল অপারেশন শুরু হবার আগে দেখা হল নেতাজীর সঙ্গে। এবার বার্মার মেমিওতে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী। জেনারেল মুতাগুচি আর নেতাজীর বৈঠক হচ্ছে ইম্ফল অপারেশন নিয়ে। দুজনেই বেশ খুশি। কারণ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে ইম্ফল যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত। ফুজিয়ারা উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে। রাত্রে মুতাগুচি ডিনার দিলেন নেতাজীর সম্মানে।

ডিনারের পর নেতাজী ফুজিয়ারাকে ধরে নিয়ে এলেন ওঁর নিজের বাড়ীতে। সারা রাত ধরে কথা বললেন দু'জনে। সামরিক ষ্ট্র্যাটেজি যেমন আলোচনা হল, তেমনি নেতাজী তার ভবিষ্যতের স্বপ্নও অনেক বলছিলেন। এক একটা এলাকা মুক্ত হবে, সেখানে ভার নেবে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট। জাপানী কারেন্সি কখনোই ব্যবহার হবে না। তার আগে নিজস্ব কারেন্সির ব্যবস্থা করতে হবে। কোন মতে একবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঢুকতে পারলে আর কথা নেই। বাংলাতে তো সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবেই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে বিদ্রোহ দেখা দেবে। ফুজিয়ারা বলেন, আমার মনে হত ওঁর সঙ্গে যেন আমার অনেকদিনের চেনা।

নেতাজী যে ঠিক কেমন ছিলেন, ফুজিয়ারা ভাল বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। দেশপ্রেমিক ছিলেন, কিসে ভারতবাসীর মঙ্গল হবে এই তো ছিল সর্বক্ষণের চিন্তা। আবার যোদ্ধাও ছিলেন, সামরিক ব্যাপারে তো কথাবার্তা বলেছেন ফুজিয়ারা। তবে সব কিছু ছাপিয়ে ওঁর মধ্যে আবার একটা অন্য ধরনের মানুষও ছিল—ফুজিয়ারা কথাটা ব্যবহার করলেন 'ফিলজফার'।

যে মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হঠাৎ করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পুজোর ঘরে ধ্যানে বসে যান।

নেতাজীর অত সাধের ইম্ফল যুদ্ধ যখন শুরু হল, ফুজিয়ারা তখন একটানা মাস চারেক ইম্ফল ফ্রণ্টে ছিলেন। উনি হিসেব করে বললেন, এপ্রিল থেকে জুলাই। জুলাইর দশ তারিখে রিট্রিটের অর্ডার হল। ইম্ফল যুদ্ধে পরাজয় ফুজিয়ারার মন ভেঙে দিয়েছিল। উনি চোখের জল ফেলেছিলেন। কারণ কবে থেকে যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুজিয়ারারও নিজস্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

আবার কবে আসবেন আমাদের ওদিকে? ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞাসা করি। "দেখি কবে যেতে পারি", বললেন। "পাকিস্তানে তো যাই মাঝে মাঝে, পুরোন বন্ধুরা চলে যাচ্ছে একে একে, হবিব চলে গেল। বাংলাদেশে শেষ গিয়েছি অনেকদিন হল। শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রীয় অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। নেতাজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন উনি। জানুয়ারীতে কলকাতা যেতে ভাল লাগে। প্রায় বছরই তো যাই। প্রেম, সায়গল আসে, লক্ষ্মী আসে, ধীলন আসে—নেতাজী ভবনে সকলে যখন একসঙ্গে হই, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি ফিরে আছে। তবে এই জানুয়ারীতে যাওয়া হবে না। দেখি সামনের বছর কী হয়। শরীরটাও খুব ভাল থাকে না আজকাল। ডাক্তারের উপদেশ শুনে চলি।"

স্নেহ পাপশঙ্কী—আমার মনটা হঠাৎ কীরকম করে উঠল। আবার দেখা হবে তো! ভাল থাকেন যেন উনি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম ফুজিয়ারা বলছেন—যেখানেই থাকি নেতাজীর কাজ ঠিক করে যাব আজীবন।

সে রাত্রে আমরা ঘুমোবার সময় আর বেশী পেলাম না। ভোরবেলাই নারিটা এয়ারপোর্ট।

জাপানের বন্ধুদের আর নেতাজীর স্মৃতিবিজড়িত টোকিও শহর ছেড়ে যেতে মনে কষ্ট হচ্ছিল। একেবারে বিদায়লগ্নে টোকিও বিমান বন্দরে একটা ছোট মজার ঘটনা ঘটে যাওয়াতে মনটা অন্যদিকে গেল আর মনের ভার

আপনা থেকেই লাঘব হয়ে গেল। আমরা তখন সিকিওরিটি এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এক এক করে সকলে ইলেকট্রনিক দরজা পার হয়ে যাচ্ছি। আমি যখন দরজা পার হলাম সামনের টেলিভিশন স্ক্রীনে দেখছি পাশের কন্‌ভেয়র বেল্ট দিয়ে নাচতে নাচতে আমার হ্যাণ্ড ব্যাগ আসছে, সেটাও একটা ইলেকট্রনিক দরজা পার হবে। এমন সময় হঠাৎ সকলকে হতচকিত করে একটা বিপদ-সংকেত জ্ঞাপক বাজনা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল, চারিদিকে এধার-ওধার লাল আলো জ্বলে উঠল, 'স্টপ স্টপ' চীৎকার শোনা গেল।

কেউ-ই কয়েক মিনিট কিছু বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা কী! তারপর দেখি আমার নিরীহ চেহারার হাতব্যাগটা ঘিরে ফেলেছে সিকিওরিটির লোকজন। হাতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে সন্তর্পণে পরীক্ষা করছে সেটাকে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সিল্কের কাপড়ে বাঁধা এক পুঁটুলি। দেখলে হঠাৎ হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ভেবে বসা বিচিত্র নয়। এ সেই পুঁটুলি কিওটো স্টেশনে আমাদের ঘণ্টাশিল্পী বন্ধু যা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সিল্কের কাপড় খুলতে, ভিতরে কাগজের রঙীন মোড়ক, তার মধ্যে আর একটা মোড়ক, তার মধ্যে আরো একটা। পেঁয়াজের খোসার মত ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতর থেকে বার হল ভারী সুন্দর এক মন্দিরের ঘণ্টা আর দণ্ড, ঘণ্টার গায়ে জাপানী ভাষায় কীসব লেখা, আমাদেরই নাম-ধাম মনে হয়। সিকিওরিটির বড় অফিসাররা এসে কেবলি মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাও' করতে লাগলেন আর বিনীতভাবে বলতে লাগলেন—আমরা খুব দুঃখিত, মাপ করবেন, আপনাদের কত কষ্ট হল।

কষ্ট আবার কি! আর ওঁরা তো ওদের কর্তব্যই করছিলেন। একটা ধাতু-নির্মিত কিছু পাস্ করে যাচ্ছে, তাই ইলেকট্রনিক সংকেত বেজে উঠেছে চতুর্দিকে। এতে ওদের ক্ষমাপ্রার্থী হবার তো কিছু নেই। তবুও ওরা এত বার বার মার্জনা চাইতে লাগলেন, আমার মনে হল কী জানি মন্দিরের ঘণ্টা বলেই হয়ত ওঁরা অপরাধী বোধ করছেন। নাকি এটা জাপানীদের চারিত্রিক বিনয়ের প্রকাশ। তিন-চারজন মিলে ঘণ্টাটি আবার যেমন ছিল ঠিক তেমন

করে প্যাক করে দিলেন। চীফ সিকিওরিটি অফিসার শুধু বললেন যে, এরপর যে সব বিমান বন্দরে যাবে আগেই ঘণ্টাটা বার করে নিয়ে ওদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিও। ওঁরা আমাদের খাতির-যত্ন করে প্লেনে তুলে দিলেন।

কলকাতায় আমাদের বসবার ঘরে যখন ঢঙ করে বাজিয়ে দিই ঘণ্টা, অমনি মনে পড়ে যায় বিমান বন্দরের পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠা, লাল আলো জ্বলে ওঠা আর আমাদের হতভম্ব ভাব।

॥ ১৮ ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি ছোট দ্বীপ, তার নাম ফরমোজা। নামটি নাকি পর্তুগীজ, যার অর্থ সুন্দর দ্বীপ। চীনা নাম অবশ্য তাইওয়ান। এই দ্বীপের এক প্রান্তে তাইপে শহর। যুদ্ধের সময় জাপানী নাম ব্যবহৃত হত তাইহোকু। সে সময় ব্যাংকক বা সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যেতে আসতে অনেক প্লেনই তাইহোকুতে যাত্রা-বিরতি করত। কখনো কয়েক ঘণ্টা, কখনো বা একটা রাত। টোকিও আসা-যাওয়ার পথে নেতাজীও এখানে থেমেছেন কখনো কখনো। এমন কি সাবমেরিনে করে সাবাং এসে পৌঁছবার পর সাবাং থেকে টোকিও যেতে পথে তাইপে ছুঁয়ে গেছেন।

আমাদের প্লেন তাইপের দিকে উড়ে চলছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম আমরা তাইপে চলেছি কিসের আশায়! আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের যে কাহিনীর জন্য তাইপে নামটি ভারতবাসীর মনে গাঁথা হয়ে আছে, আজকের তাইপেতে সে কাহিনী প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার মত কিছু আমরা পাব এমন আশা করা যায় না। তবুও তাইপেতে একবার না গেলে কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। তাইপেতে কোন একসময় যেতে হবে, দেখে আসতে হবে সে জায়গাটা কেমন—এই ইচ্ছা মনের মধ্যে সংগোপনে রেখে দিয়েছি বহুদিন।



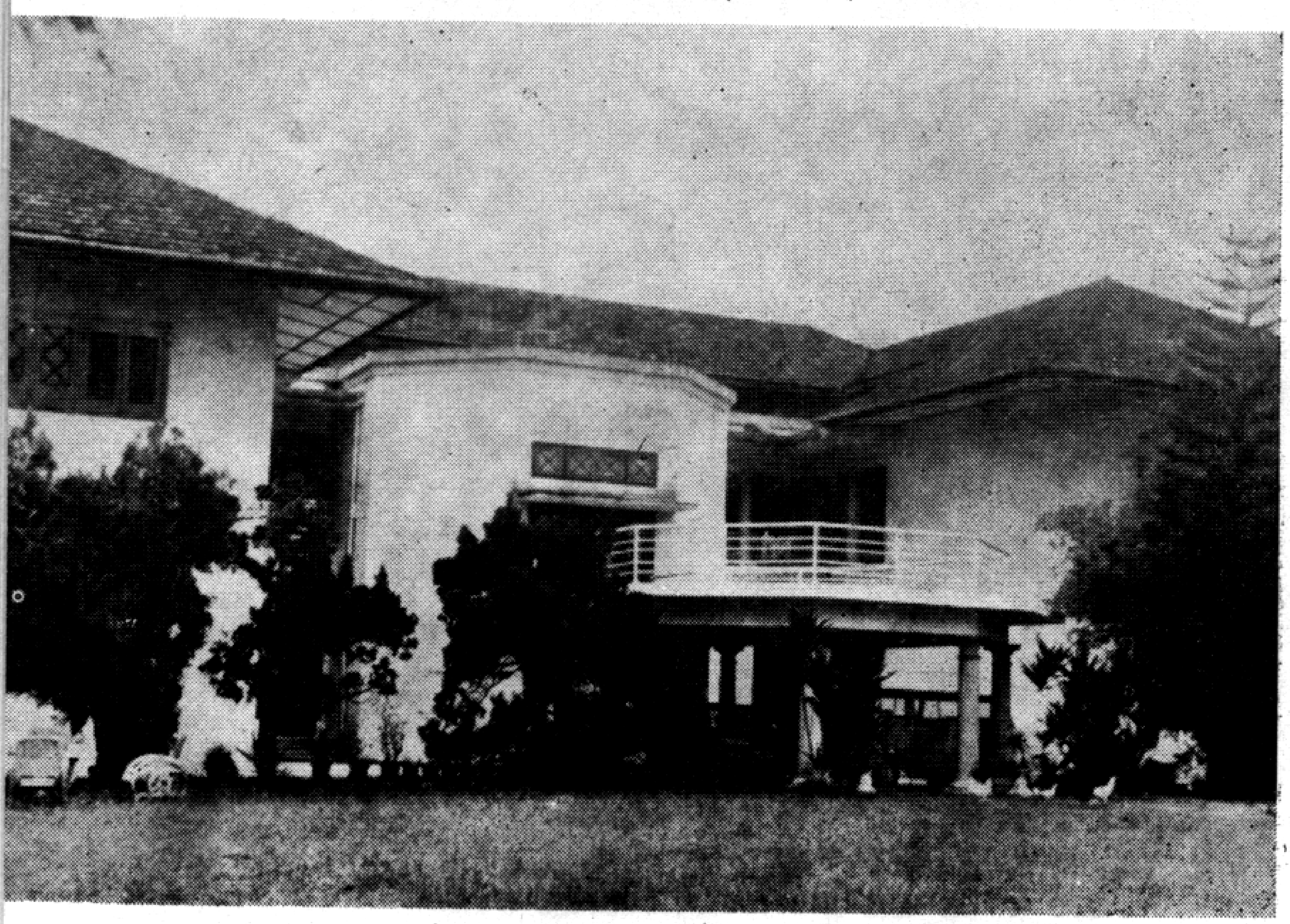
নেতাজীর সহযোগী জেনারেল কাটাকুরা ও জেনারেল আরিসুয়ে



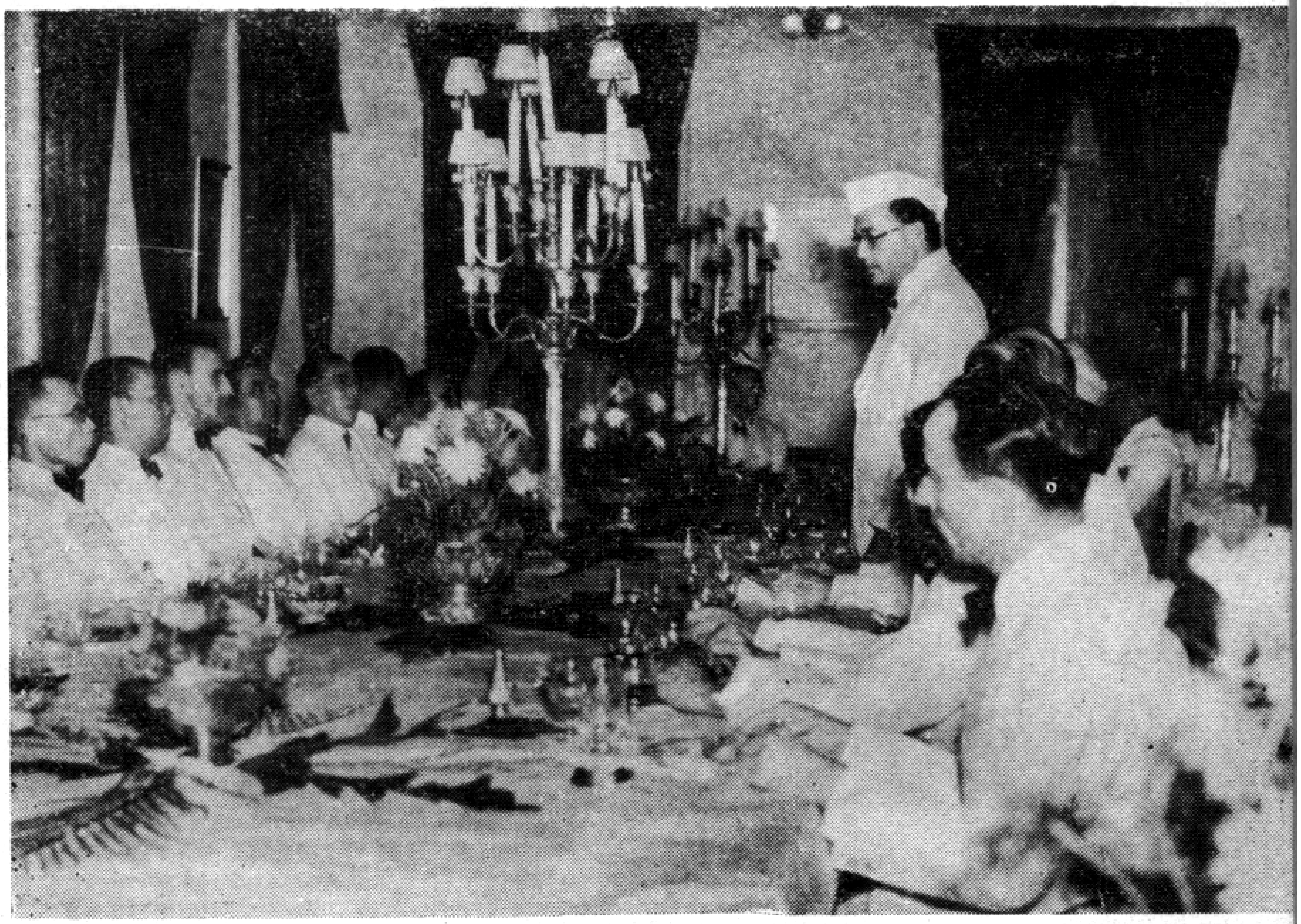
জেনারেল ইসোডা, মিসেস ইসোডা ও জেনারেল ফুজিয়ারা



তাইপের মাউথগেট হাসপাতাল



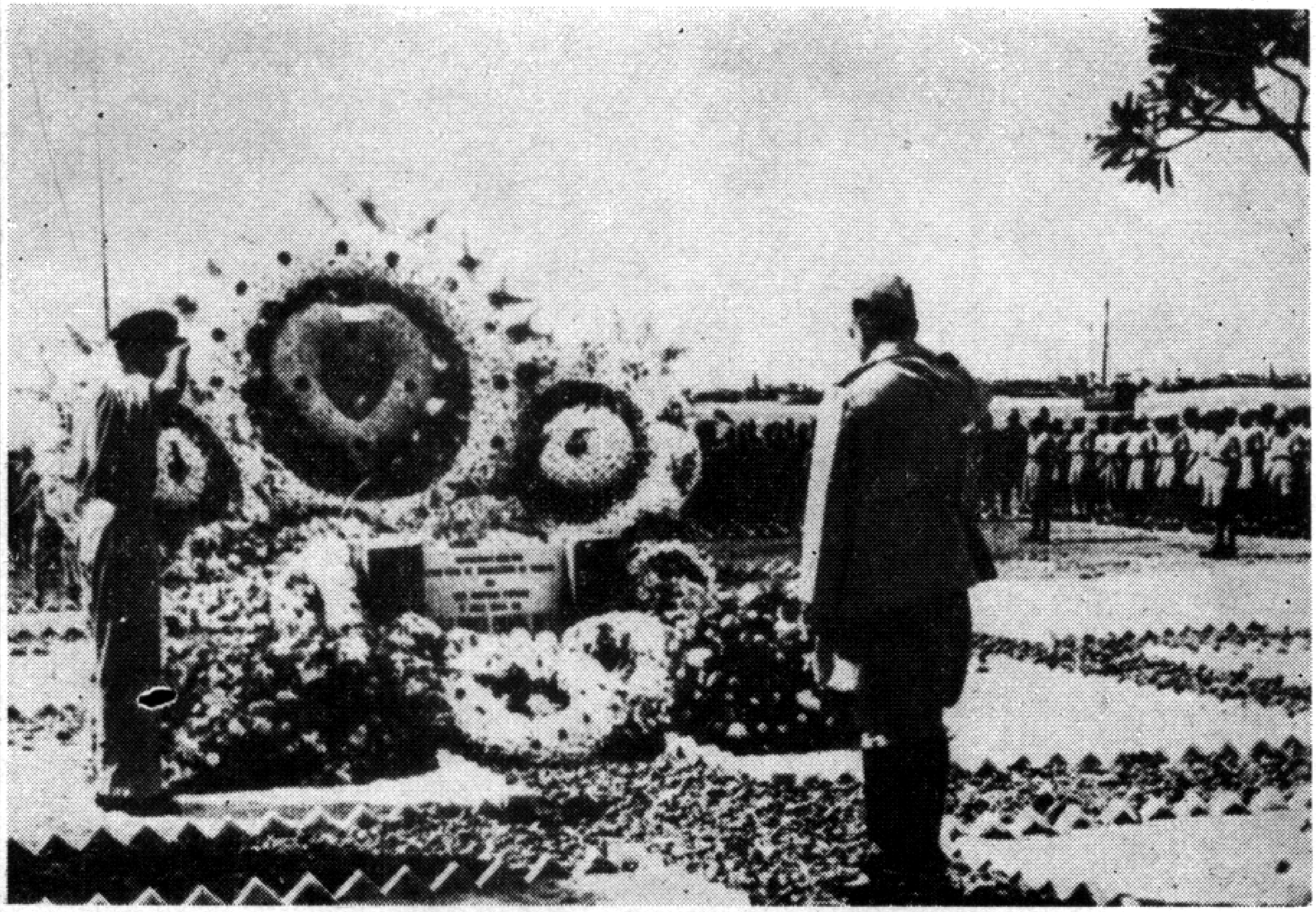
সিঙ্গাপুরে নেতাজীর বাসগৃহ



ব্যাংককে ডিপ্লোমেটিক ডিনারে ভাষণ দিচ্ছেন নেতাজী



কুয়ালালামপুর পরিদর্শনে এসেছেন নেতাজী



সিঙ্গাপুরে আই, এন, এ মেমোরিয়ালের ভিত্তিস্থাপন করলেন নেতাজী, জুলাই ১৯৪৫

সেটা হবে ১৯৫৬ সালের শেষ দিক বা ১৯৫৭ সালের গোড়া। একদিন দুপুরবেলা একটা বই-এর পাতা উল্টে দেখতে গিয়ে পুরোটাই পড়ে ফেললাম। হারীন শা নামে এক সাংবাদিক বলছেন, তিনি ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে তাইপে গিয়েছিলেন। সেখানে উনি এক ফরমোজান নার্সের দেখা পান। তাইপে হাসপাতালের এই নার্স ওঁকে বলে যে, সে বিমান দুর্ঘটনায় আহত নেতাজীর সেবা করেছিল ও শেষ সময়ে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিল। হারীন শা আরো দেখা পান তাইপে ক্রিমেটরিয়ামের এক কর্মীর, সে বলেছিল আগের বছর একজন ভারতীয় নেতার শেষ কাজ সে করেছিল। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া যায় শহরের হেলথ আর হাইজিন ব্যুরোর দুই কেরাণীকে। এদের কাজ সংকারের আগে সার্টিফিকেট ইস্যু করা। এরা বলেছিল গত বছর জাপানী অফিসাররা আসেন এক ভারতীয় নেতার মরদেহ নিয়ে। ওরা সার্টিফিকেট করিয়ে নিয়ে যান। নানা জায়গার ও নানা লোকের ছবি সহ হারীন শা তাঁর বইয়ে এসব বিবরণ পেশ করেছেন। বইটি পড়ে অসম্ভব বিচলিত হয়েছিলাম। মনে পড়ে উডবার্ণ পার্কের ছোট বাড়ির দোতলার ঘরে বসে এক নিঃশ্বাসে বইটি দুপুরবেলা পড়ে ফেললাম। পড়া শেষ করে যখন জানালার বাইরে তাকালাম, সাউথ ক্লাবের সবুজ ঘাসে ঢাকা টেনিসের মাঠ, দূরে গাছপালা সবই বিকেলের আলোয় মনে হল বিবর্ণ। টমাস হার্ডির উপন্যাস পড়লে মনে এক ধরনের হতাশা ও অবসাদ আসে, মনে হয় নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে মানুষ কত অসহায়। ক'দিন একটা ঘোরের মধ্যে রইলাম।

সেই সময়ে ডাঃ বসু আমাকে একদিন বললেন—"তোমার বই পড়েই এই দশা! তাহলে ভেবে দেখো, এইসব কথা লেখকের মুখ থেকে সোজা-সুজি শুনতে কীরকম লাগত।" ওঁর সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রাগ-এ।

সেখানে হারীন শা ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে। উনি বললেন, 'আমরা তখন আছি প্রাগ-এ হোটেল অ্যাল কর্ণে। সে সময় বাবা (শরৎচন্দ্র বসু) একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'হারীন শা নামে এক জার্নালিস্ট আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, বললে সর্দার

প্যাটেল বলে দিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে নাকি তাইহোকুর এয়ারক্র্যাশের ব্যাপারে কীসব খবর সংগ্রহ করতে পেরেছে। বাবা বললেন, "আমি চাই, যখন আমার ওর সঙ্গে কথাবার্তা হবে তুমি সেখানে উপস্থিত থাকো।"

সেইমত হারীন শাকে একদিন ডিনারের পর আসতে বলা হল। আমাদের দু'জনের কাছে উনি বইয়ে যা লিখেছেন সেইসব কথা প্রায় একই ভাষায় ও ভঙ্গীতে বলে গেলেন। এইসব কথা বসে বসে শোনা বাবার পক্ষে অসম্ভব কষ্টের হয়েছিল, টরমেণ্ট হয়েছিল বলা চলে। উনি যখন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সারা মুখ থম্‌থম্ করছে। তখন আমি জোর করে একটু হেসে বললাম, কী সব বলে গেল ফেয়ারী টেল, রূপকথা। ডুবন্ত লোক যেভাবে খড়কুটো চেপে ধরে সেইভাবে বাবা যেন আমার কথাগুলো আঁকড়ে ধরলেন। ব্যাকুল-ভাবে বলে উঠলেন—'এসব কথা সত্যি নয়, না? তোমারো তাই মনে হল? এ সব কথা সত্যি নয়?'

পরবর্তীকালে বইটা আমি পড়েছি। অত বিচলিত হইনি। অসংগতিও চোখে পড়েছে। এমন কী বইটা এমন কিছু সুলিখিতও নয়। তবুও প্রথম-বার পড়বার সময় থেকে মনে ভেবে রেখেছি তাইপে একবার যেতে হবে, দেখে আসতে হবে জায়গাটা কেমন।

এই তাইপে প্রসঙ্গে নেতাজীর অনুরাগী ও সহকর্মীদের মধ্যে স্পষ্টত তিনটি ভাগ আমি লক্ষ করেছি। একদল মনে করেন, নেতাজী শারীরিক ভাবেও যেন মৃত্যুহীন, তাইপে কেন, কোথাও কোনদিনই যেন তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। আর একদল আছেন, তাঁরা মনে করেন নেতাজী আজ আর জীবিত নেই, তবে এই প্লেন ক্র্যাশে কখনোই তাঁর মৃত্যু হয়নি। এই দলের মধ্যে অনেক চেনাজানা আছেন। একজনের কথা এখনি মনে পড়ছে, আবিদ হাসান। আর তৃতীয় আর একদল আছেন যাঁরা মনে করেন যদিও আজ আর সন্দেহাতীতভাবে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না, তবুও সবদিক বিচার-বিবেচনা করলে এয়ারক্র্যাশের ঘটনাটাই আমাদের

এয়ারক্র্যাশের ঘটনাটাই আমাদের মেনে নিতে হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তার সাতজন সারভাইভরও সাক্ষী রয়েছেন, হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন এমন দুজন ডাক্তার রয়েছেন—সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা কথা বলছেন একথা মনে করার কারণ আছে কি? জাপান সরকারও আজ এত বছর ধরে একটা মিথ্যা কাহিনী বলে যাবে কি উদ্দেশ্যে?

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-সংশয়ী সকলের কাছেই তাইপে হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটা জায়গা যার আকাশে, পাহাড়ে, অরণ্যে, সমুদ্রের জলে 'দুঃখ তার লেখে নাম।'

জাপানের আত্মসমর্পণের পর নেতাজী যে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে চলে যাচ্ছিলেন এবং ওঁর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রাখা একথা এখন সকলেরই জানা। জাপানের সারেনডারের পর নেতাজী আর একটা 'গ্রেট এসকেপ'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু হবিব যে কথা বলতেন, তা হল বিমান দুর্ঘটনার ফলে এসকেপ প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে গেল। যদি সফল হত তবে হবিব থাকতেন নেতাজীর সঙ্গে। তাইপে থেকে টোকিও ফিরে আসার পর হবিবকে আয়ার যখন প্রথম দেখলেন উনি বারবার বলছিলেন, 'হবিব, আমাকে সত্যি কথাটা বলো।' ওঁর কথায় অবিশ্বাস করার মত কিছু রয়েছে মনে করা হচ্ছে দেখে হবিব নাকি বিস্মিত হয়েছিল।

সেদিন আমরা তাইপের দিকে উড়ে চলেছি সকালবেলা। কিন্তু হংকং থেকে জাপান যাবার পথে আমাদের প্লেন তাইপেতে নেমেছিল সন্ধ্যাবেলা। আগে জানতাম না তাইপেতে নামার কথা আছে। তাই যখন ঘোষণা করল আমরা তাইপে বিমান বন্দরে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন বেশ উত্তেজিত বোধ করলাম। শুনলাম আমরা রিফুয়েলিং অর্থাৎ তেল ভরে নেবার জন্য নামছি। '৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজী, হবিব, জেনারেল শিডেই ও অন্যান্যদের নিয়ে এরোপ্লেন তেল ভরে নেবার জন্যই তাইপেতে নেমেছিল বলে বলা হয়।

আমি এরোপ্লেনের জানালার কাঁচে নাক চেপে ধরে একদৃষ্টে নীচে

তাইপের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ফিরতি পথে কয়েকদিন তাইপেতে থাকতে পারব কিনা সে বিষয়ে তখনো নিশ্চিত ছিলাম না। তাই ভাবছিলাম, যেটুকু পারি এখনি দেখে নিই। নীচে কালচে সবুজ পাহাড় ও গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। আমরা বিমানবন্দরের ওপর এসে পড়লাম। ধীরে ধীরে পাহাড় ও গাছপালা সব যেন আমাদের দিকে উঠে আসতে লাগল। একটি লাল টক্‌টকে আগুনের গোলার মত সূর্য অনেকক্ষণ ধরে এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছিল। ঠক করে মাটিতে নেমেই প্লেন একটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল আর সূর্যও ছুটে চলল আমার জানালার পাশেপাশে। আর তারপর একেবারে হঠাৎ-ই সামনের পাহাড়ের ওপাশে ঝুপ করে চলে গেল সূর্য আর আঁধার নেমে এল বিশ্ব চরাচরে। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ভেতর দিয়ে কোন ছেলেবেলায় পড়া কয়েকটা কবিতার লাইন রেলগাড়ীর মত ঝম্‌ঝম্ করে চলে গেল—কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ / বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি, / তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন / আসিবে ভারতভাগ্যে বিষাদ রজনী।

এদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম প্লেনের ভেতর বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, মৃদু টুংটাং বাজনা বাজছে। খানিকপরে আমরা যাত্রীরা সব ট্র্যানজিট লাউঞ্জে ভীড় করলাম। ডিউটি-ফ্রি শপে সকলে খুব কেনাকাটা শুরু করে দিলে। আমরা একপাশে সরে গিয়ে এক চীনা বিমান কর্মীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। এই যে আলো-ঝলমল বিমান বন্দরে আমরা নামলাম, তার নাম চিয়াং কাইশেক এয়ারপোর্ট। এটি নতুন হয়েছে। হ্যাঁ, আমি যে এয়ারপোর্টের কথা জিজ্ঞাসা করছি তা আছে শহরের একেবারে ভিতরে। নতুন এয়ারপোর্ট হবার পর সেটা আজকাল ডোমেষ্টিক এয়ারপোর্ট হিসেবে ব্যবহার হয়। আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট হল এই চিয়াং কাইশেকের নামাঙ্কিত বন্দর।

আজ আমরা তাইপেতে নামলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। বেশ প্রসন্ন সূর্যালোকিত সকাল। চিয়াং কাইশেক এয়ারপোর্ট লোকজনের আনা-গোনায় ব্যস্ত-সমস্ত। আমরা প্রথমেই কাষ্টমস্-এর লোকদের বলে দেবার

চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের সঙ্গে যে সিল্কের পুঁটুলি, তাতে আছে টেম্পল বেল, মন্দিরের ঘণ্টা। ওরা আমাদের কথায় বিশেষ কানই দিলে না। ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমাদের সেই অতিসুন্দর প্যাক করা বইয়ের প্যাকেটটি নিয়ে। একজন টান মেরে খুলে ফেলল প্যাকেট, চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল জাপানী ভাষায় লেখা বই, বেশ কিছু কবিতা, কিছু শিশুসাহিত্য, কিছু সেনাপতিদের আত্মজীবনী। ওরা বেশ অপ্রসন্নভাবে বললে, সব জাপানী বই কেন ?—জাপান থেকেই তো আসছি, বন্ধুরা দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা নিয়ে এল জাপানী ভাষা বিশারদকে। তিনি সব বই পড়তে বসলেন। সেরেছে ! এ যদি লাইন-বাই-লাইন সব পড়তে চায় তা হলে তো মুশকিল।

তা ভদ্রলোক প্রত্যেকটি বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখলেন। পরে জেনেছিলাম, ওরা এক ধরনের আতঙ্কে ভোগে। পাছে কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে কম্যুনিজম ঢুকে পড়ে দেশে। তাই বইপত্র আর টেপ-এর ওপর ওদের চোখ রাখতে হয়, কোন মতে যেন কম্যুনিষ্ট লিটারেচার অনুপ্রবেশ না করতে পারে। টোকিওর কাষ্টমস অফিসারদের মত এরা বারবার মার্জনা ভিক্ষাও করল না, ফিরে প্যাক করেও দিল না বইগুলো। কোনমতে পড়ে থাকা দড়ির টুকরো দিয়ে জড়ো করা বইগুলো বেঁধে নিলাম নিজেই।

কাষ্টমস এলাকার বাইরে আসতেই দেখি এক মধ্যবয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আর একটি ভারী সুন্দরী অল্পবয়সী চীনা মেয়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। মিসেস বোস ? —জিগ্যেস করল মেয়েটি। শাড়ী পরিহিতা আর কেউ নেই কোন দিকে। ওরা ঠিকই চিনতে পেরেছেন। জেনারেল ফুজিয়ারার চিঠি পেয়েছেন ওঁরা। ভদ্রলোকের নাম মিঃ উ, তাইওয়ানের একজন শিল্পপতি উনি, মেয়েটি ওঁর সেক্রেটারি ক্রিষ্টিন লী। আমাদের বাইরে আসার দেরী দেখে ওঁরা চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। বই বিভ্রাটের কথা বললাম।

মিঃ উ গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চললেন। উনি চীনা ভাষায় কথা বলেন, ক্রিষ্টিন ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়। হ্যাঁ, আমার এই প্রথম তাইপে

আসা—ওঁর কথার জবাবে বলি। না, ডাঃ বসুর প্রথম ভিজিট নয়, উনি এসেছিলেন পনেরো বছর আগে। তাইপের পরিবর্তন চোখে পড়ছে কিনা জানতে চাইলেন মিঃ উ। হ্যাঁ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চিয়াং কাইশেক এয়ার পোর্টই তো নতুন। তাছাড়া অনেক বড় বড় অট্টালিকা উঠে গেছে, আর চওড়া রাজপথ—এসব পনেরো বছর আগে ছিল না।

এক সময় তাইওয়ানের ওপর আমেরিকানরা অনেক অর্থ ঢেলেছিল, আজ অবশ্য সঠিক অবস্থা কী জানি না। উ কথায় কথায় বললেন, ব্যবসা বাণিজ্যে তাইওয়ান উন্নতি করেছে খুব। এই যেমন জাপানের সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু তাহলেও তাইওয়ান ও জাপান চুটিয়ে ব্যবসা করছে পরস্পর।

দূর থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের প্রাসাদ চোখে পড়ল। উজ্জ্বল লাল রঙের এক বহুতল অট্টালিকা, তার চীনা স্থাপত্যের মত ঢেউ খেলানো ছাদ, ছাদের রঙ সোনালী। লাল আর সোনালীতে মিলে খুব জাঁকজমকপূর্ণ চেহারা। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে মিঃ উ বললেন, আমরা তো ওখানেই যাচ্ছি, ওখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এ হল তাইপের গ্র্যাণ্ড হোটেল। বিদেশীরা এলে সাধারণত ওখানেই থাকেন।

ক্রিষ্টিন লী উত্তেজিতভাবে যোগ করে দিল—জানেন, ওখানে এখন এলিজাবেথ টেলর রয়েছেন। তাইপেতে ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল চলছে, সেই উপলক্ষে উনি এসেছেন। ক্রিষ্টিনের ছেলেমানুষী ব্যগ্রতা দেখে আমরা 'তাই নাকি!' বলে যথোচিতভাবে পুলকিত হলাম।

অনেক দূর থেকে দেখা গেলেও গ্র্যাণ্ড হোটেল খুব কাছে নয়। প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আরো বেশ কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে আমরা সোনালী ও লালে ঝলমল একটা চৈনিক তোরণ দিয়ে ঢুকে গেলাম। হোটেলটা একটু উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে বসানো। সামনে দেখলে ঢালু হয়ে নেমে গেছে শহর। বাঁ দিকে তাকালে আরো একটা ঢাল, সেই ঢালের শেষে দূরে দেখা যাচ্ছে অনেকখানি সমতল জায়গা। লাউঞ্জের প্রশস্ত কাঁচের জানালা দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে উ বললেন, সেটাই হল তাইপের আগেকার এয়ারপোর্ট।

এখনো খুবই ব্যস্ত বিমান বন্দর তবে ডোমেষ্টিক, আন্তর্জাতিক নয়! আমরা সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই একটা প্লেন হোটেলের পাশ দিয়ে উড়ে গেল আর টুক করে নেমে পড়ল বিমান বন্দরে। যে ক'দিন তাইপেতে ছিলাম, হোটেলে থাকলেই জানালায় দাঁড়িয়ে বিমানের ওঠা-নামা দেখা একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেল আমার।

উ আর ক্রিষ্টিন বিদায় নেবার সময় বলে গেল ওঁরা সন্ধ্যায় ঘুরে আসছেন। এই গ্র্যাণ্ডেই আমাদের জন্য একটা ডিনারের আয়োজন আছে আজ। অনেকে আসবেন দেখা করতে। আর সেই সময়ে ঠিক করে ফেলতে হবে আমাদের এখানকার প্রোগ্রাম কী হবে, তাইপেতে কী দেখতে চাই আমরা। ক্রিষ্টিন বললে, চীনা শ্রাইন আছে, নানা রকম ট্যুরিষ্ট স্পট আছে, চীনা রেস্তোরাঁ আছে, রকমারি। আমাকে বিশেষ উৎসাহী ট্যুরিষ্ট মনে হল না ওঁর।

॥ ১৯ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ডের একতলায় একটি ডাইনিং হল-এ আমরা সকলে সমবেত হলাম। ঘরের মাঝখানে একটি বড় গোল ডাইনিং টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। টেবিল সাজানো রয়েছে, সিট-ডাউন ডিনারের ব্যবস্থা। এক পাশে কয়েকটি সোফা। সেখানে বসে আছেন অতিথিরা। প্রথমে মিসেস উ-র সঙ্গে আলাপ হল, ছোটখাট চেহারার চীনা মহিলা। ক্রিষ্টিনের সাহায্য নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করলাম, উনিও মিঃ উ-র মত চীনা ভাষা ছাড়া আর কিছু জানেন না। একটি হাসি-খুসি তরুণের সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম রজার কু। সে আবার চমৎকার ইংরেজি বলে। রজার আর ক্রিষ্টিন তাইপেতে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে পড়েছিল।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল পাও, ওখানকার মিলিটারি

একাডেমির ডিরেক্টর। আর ছিলেন এডমিরাল টুন হুয়া কো আর তাঁর স্ত্রী মার্গারেট। এডমিরাল কো হলেন এখন ভাইস মিনিষ্টার অব ওয়ার—অর্থাৎ বলা যেতে পারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী। এডমিরাল কো-র সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল, বেশ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। বললেন, ১৯৪৩ সালে কিছুদিন কলকাতায় ছিলাম, তোমাদের গ্র্যাণ্ড হোটেলে। তখন ইংলণ্ডে পড়তে যাচ্ছি, পথে কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলাম। মিসেস কো খুব মিশুকে, হৈচৈ করে গল্প করতে ভালবাসেন। খেলাধুলোতে উনি খুব ভাল—গলফ খেলেন, টেনিস খেলেন নিয়মিত। মিসেস ইয়ানি নামে আর এক মহিলার কথা মনে পড়ছে, নিজে চীনা, বিয়ে করেছেন জাপানী, শ্বশুড়বাড়ী কিওটোতে। মিসেস উ-র সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, উনি তাইপের গভর্নর মিঃ উ-র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

আমরা রয়েছি চিয়াং কাইশেকের চীনে। যুদ্ধের সময় নেতাজী ছিলেন বিপক্ষদলে। আজ জেনারেল পাও আর এডমিরাল কো-র মত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ডিনারে মিলিত হয়ে নেতাজীর কথা বলছেন, একটু বিচিত্র বৈ কি! কিন্তু ওঁরা বলেন নেতাজীর প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল, ওঁরা জানেন নেতাজী ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, মুক্তিসংগ্রামী বীর।

ডিনার তৈরী, ঘোষণা হল। সকলে উঠে গিয়ে টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসলেন। সকলের সামনে ছোট ছোট রূপোর রেকাব, তার ধারে কারুকার্য করা। চীনে-জাপানে বড় প্লেটে কেউ বিশেষ খায় না। জাপানীরা খায় ছোট ছোট বাটিতে। এদের আবার রূপোর রেকাব যেন ঠাকুরঘরে প্রসাদ খাবার থালা। পাশে রয়েছে ছোট ছোট রূপোর ওয়াইন কাপ, তারও আকৃতি বেশ ক্ষুদ্র। ডিনারের মেনু আমার হাতে তুলে দিয়ে মিসেস উ আর মিসেস কো বার বার চীনা ও ইংরেজিতে মিশিয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমি তো খানিকক্ষণ কিসের জন্য ক্ষমা বুঝতেই পারছিলাম না। ক্রিষ্টিন বুঝিয়ে দিল, ওঁরা বলছেন আজকের খাওয়া-দাওয়া খুব সিম্পল্ হয়ে গেছে, তাই ওঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। যে কোন চাইনিজ ডিনার খুব কম করেও কুড়ি-একুশ পদ হওয়া চাই।

নয়ত সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু আজ মাত্রই বারো পদ। এত কম খেলে আমাদের তো ক্ষুন্নিবৃত্তিই হবে না, সারারাত ক্ষুধার্ত থাকতে হবে এই ওঁদের আশংকা। এসব ব্যাপারে ওঁরা আমাদেরই মত। আমরা যেমন পীড়াপীড়ি করে খাওয়াই,—না-খাও তো মাথা খাও বলি, আজ রান্না ভাল হয়নি, আপনার খুব কষ্ট হল এইসব বিনয়সূচক কথাবার্তা বলি, এঁরাও ঠিক তেমনি।

ইতিমধ্যে প্রাক্ ডিনার ভাষণ শুরু করে দিয়েছেন এডমিরাল কো। ওঁর কথাবার্তা খুবই ডিপ্লোমেটিক। উনি বললেন, একথা ঠিক আমাদের দু'দেশের মধ্যে বর্তমানে ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক নেই কোন। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সম্পর্ক? আসল কথা হল দু'দেশের মানুষে ভালবাসার বন্ধন। সব সম্পর্কই কী আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হবে! একাডেমিক লেভেলে হতেও তো পারে। এই যেমন আজ তোমরা এসেছ, আমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হল আর এর ফলে তাইপে ও ভারতের সম্পর্ক নিশ্চয় একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল।

খাবার এসে গেল টেবিলে, প্রথম পদ পরিবেশন করা হল। সবাই চপষ্টিক দিয়ে খাচ্ছে। আমাদের জন্য মিনি সাইজের ছুরি-কাঁটা সাজানো ছিল। কিন্তু আমরাও চপষ্টিক দিয়ে শুরু করলাম। চাইনিজ ওয়াইন ঢেলে দিয়ে গেল ওয়াইন কাপে। ওঁরা এই ওয়াইনকে বলেন মাও-তাই। তাইপেতে আমাদের ওয়েলকাম করে প্রথম টোষ্ট প্রোপোজ করলেন এডমিলার কো।

চীয়ার্সকে এরা বলে 'গান্‌বেই', তার মানে হল বটম্‌স আপ্ অর্থাৎ কিনা ওয়াইনের পাত্র উপুড় করে নিঃশেষ করে দিতে হবে। এর পর চাইনিজ প্রথামত প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে টোষ্ট প্রোপোজ হয় আর সকলে 'গান্‌বেই' বলেন।

খাদ্যদ্রব্যও উৎকৃষ্ট। চিংড়িমাছ, মুর্গী, মাশরুম দিয়ে নানা ধরনের রান্না। মেনুতে একটি পদ হাঙরের ডানা দিয়ে কাঁকড়ার মাংস লেখা আছে দেখে একটু চিন্তিত বোধ করলাম। ওঁরা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কেমন হয়েছে

সব, চাইনিজ খাওয়া ভাল লাগছে কি না। বললাম, রোষ্ট-পিপিং ডাক্ সবচাইতে ভাল লেগেছে। অনেকটা আমাদের লুচির মত জিনিসে রোষ্ট করা হাঁসের মাংসের পুর দেওয়া হয়েছে।

জাপানীরা সাধারণত একটু চুপচাপ। চীনের লোকেরা মনে হল বেশ গপ্পে। জেনারেল পাও তাঁর মিলিটারী একাডেমির গল্প করছেন, এডমিরাল কো তাঁর কলকাতা প্রবাসের দিনগুলির কথা। মিসেস কো গলফ খেলা, টেনিস খেলার গল্প জুড়েছেন। ডিনারের শেষে সকলে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রাত্রির তাইপে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে বাটির মত শহর। আমরা দাঁড়িয়ে আছি উঁচুতে, সামনে নীচু হয়ে গেছে শহরের আলো। তবে বাইরে দাঁড়ানো বেশ দুঃসাধ্য। ঝড়ের মত হু হু করে হাওয়া, সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যেমন হয় তেমন। উ বলছিলেন, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এইভাবে এখানে প্রায় সময় হাওয়া দেয়, তাই তাইপের আবহাওয়া ঝড়ো আর মেঘলা থাকে অনেক সময়। কাল কোথায় যাব কথা হচ্ছিল। রজার আর ক্রিষ্টিন আমাদের নিয়ে যেতে চায় তাইপের একটু বাইরে কোন এক সুন্দর ট্যুরিষ্ট স্পটে। শোনা গেল লিজ টেলর গেছেন আপাতত সেখানে। কিন্তু আমি দেখতে চাই এখানকার এয়ারপোর্ট আর হাসপাতাল। ক্রিস্টিন আর রজার শুনে হতাশ হল।

পরদিন মিঃ উ নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এয়ারপোর্টে এমনিতে তোমাদের যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে অসুবিধা হতে পারে, তাই আমি নিজেই এলাম। আমাদের গাড়ী যখন এয়ারপোর্ট এলাকায় ঢুকল, সামনে দেখলাম চমৎকার আধুনিক এয়ারপোর্টের বাড়ী। ভিতরে সবকিছু ঝলমল করছে, ব্যস্ত এস্কালেটর এদিক-ওদিক নামছে উঠছে। সার সার দোকান পসরা সাজিয়ে বসে আছে। মনে হল এয়ারপোর্টের আরো সম্প্রসারণের কাজ চলছে, জায়গায় জায়গায় নূতন দোকান বসছে, এস্কালেটর বসছে আরো। উ-র প্রশ্নের জবাবে ডাঃ বসু বললেন, না, পনেরো বছর আগে এসব ছিল না, তবে কিছু ঘরবাড়ী তখনি হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো কিছুই ছিল না। হবিবুর

রহমানের বর্ণনায় আছে ওঁরা একটা সামিয়ানার তলায় বসে কলা আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলেন। প্লেনে হবিবের শীত করেছিল। হবিব তাই নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উলের ইউনিফর্ম বার করে দেবেন কি? নেতাজী বললেন, না। তবুও হবিব একটা উলের পুলোভার বার করে দিলেন। তারপর এরোপ্লেনেরই একপাশে দাঁড়িয়ে নিজে পোশাক পরিবর্তন করে গরম কাপড়ের ইউনিফর্ম পরে নিলেন।

উ আমাদের নানা রকম করিডর দিয়ে ঘুরিয়ে একটা খোলা জানালার মত জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অমনি সামনে দেখা গেল টানা লম্বা এয়ার ষ্ট্রীপ, তার শেষ প্রান্তে দূরে পাহাড়ের আভাস। উ বললেন, এয়ার ষ্ট্রীপ মোটামুটি একই ধরনের আছে, আকারে শুধু কিছু বেড়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছি যেন আমাদের একটা ডেমনস্ট্রেশন্ দেবার জন্যই একটা প্লেন রানওয়ে দিয়ে দৌড় দিল আর টুক্ করে টেক-অফ্ করে গেল।

এই একই দৃশ্য আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলের জানালা দিয়ে রোজই দেখতাম। এখানে আরো একটু কাছ থেকে দেখছি এই যা। আরো একটা প্লেন উড়ল, একটা এসে নামল। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা সেখানে। মিঃ উ জিজ্ঞাসা করছিলেন ডাঃ বসুকে ওঁর আগের তাইপে আসার দিনগুলির কথা। উনি বললেন, 'হ্যাঁ, এয়ারপোর্টে এসেছিলাম, ছবিও তুলেছিলাম অনেক, কেউ বারণ করেনি। তবে এবার যেমন আপনাদের মত বন্ধুদের সাহায্য পাচ্ছি, সেবার একা পড়ে গিয়েছিলাম। জাপান থেকে দেশে ফিরবার পথে হঠাৎ-ই এসেছিলাম।'

'মিসেস এমোরি অবশ্য একটা কনট্যাক্ট দিয়েছিলেন, এক মহিলা খুব সামান্য ইংরেজি জানেন। তিনি তো আমাকে বেশ চমকে দিয়েছিলেন। বললেন, এয়ারক্র্যাশ স্বচক্ষে দেখেছেন এমন দুটি মেয়েকে উনি চেনেন। তারা তখন ইস্কুলের ছাত্রী ছিল, ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল। পথে দাঁড়িয়ে ওরা এরোপ্লেন ভেঙে পড়তে দেখে। পরদিন আমি আবার ওঁর বাড়ীতে গেলাম। দু'জনের মধ্যে একটি মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল। সে

ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ক্র্যাশ দেখার অভিজ্ঞতা বললে। কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করলাম বুঝতে পারলাম, ও অন্য একটি এয়ারক্র্যাশের কথা বলছে। এটা ঘটেছিল ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে। এখন যেখানে গ্র্যাণ্ড হোটেল, তার পাশে একটি নূতন জাপানী মন্দির তৈরী হয়েছিল। পরদিন সেই মন্দিরের উদ্বোধন হবার কথা। এমন সময় একটা প্লেন ল্যাণ্ড করবার সময়—না টেকঅফ্ করার সময় নয়—ল্যাণ্ড করবার সময়—মন্দিরের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে ক্র্যাশ করে। মেয়েটি সেই ক্র্যাশের প্রত্যক্ষদর্শী।'

নেতাজীর প্লেন বলা হয়েছে ভেঙে পড়ে টেকঅফ্ করার অল্পক্ষণের মধ্যে। হবিবের দেওয়া বর্ণনাটাই মনের মধ্যে রয়েছে। উনি একটা জোর বিস্ফোরণের মত আওয়াজ পেয়েছিলেন, তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্লেন মাটিতে আছড়ে পড়ে। সামনের দিকটা ভেঙে গিয়ে আগুন ধরে যায়।

অথচ সহযাত্রীরা বলছেন, উড়বার আগে প্লেন চেক্আপ করা হল। দোষও নাকি একটা ধরা পড়েছিল, সেটা ঠিক করে নেওয়া হয়। পাইলট মেজর টাকিজাওয়া যখন পরীক্ষার জন্য ইঞ্জিন চালু করলেন, বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ইয়ামামোটো, আরো ছিলেন প্লেনের আর এক যাত্রী মেজর কোনো। দু'জনেই বললেন, বাঁ-দিকের ইঞ্জিনটায় গোলমাল আছে মনে হয়। টাকিজাওয়া সেটা দেখে নিলেন, সকলেরই মনে হয়েছিল এবার ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়র ইয়ামামোটো দেখলেন, যতটা যাওয়া উচিত তার চেয়ে কিছু বেশীদূর রানওয়েতে এগিয়ে গিয়ে প্লেন উড়ল। উড়ে বাঁ-দিকে একটু কাত হয়ে চলেছিল। এমন সময় বাঁদিক থেকে কী যেন একটা খসে পড়ে গেল আর তারপরই প্লেন মুখ থুবড়ে পড়ল। খসে যাওয়া জিনিসটা নাকি প্লেনের প্রপেলর!

হবিবের বর্ণনা এরপর বড় মর্মান্তিক, বড় নিষ্ঠুর। জ্বলন্ত এরোপ্লেনে নেতাজী পিছন ফিরে হবিবের দিকে তাকালেন। পিছনে মালপত্র পড়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ, সামনে আগুন। হবিব বললেন—আগেসে নিকলিয়ে, পিছে সে রাস্তা নেহি হ্যায়। নেতাজী সামনের আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে

বেরিয়ে গেলেন। হবিব বাইরে এসে দেখলেন, কয়েক গজ দূরে নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর বুশসার্ট জ্বলছে। উনি দৌড়ে গিয়ে বুশ সার্টের বেল্ট খুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নেতাজীর কপালে একটা ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিল, রুমাল দিয়ে সেটা চেপে ধরলেন। নেতাজীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে উনিও ব্যথায় কাতর ও ক্লান্ত হয়ে পাশে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় নেতাজী ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপকো জ্যাদা তো নেহি লাগি? —আপনার বেশী লাগেনি তো?

আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা এই ক্র্যাশ একেবারেই বিশ্বাস করেন না, বলেন এটা বানানো গল্প। বানানো হলে যে বানিয়েছে তার মুন্সিয়ানা আছে বলতে হবে। ঐ রকম সাংঘাতিক আহত অবস্থায় নিজের কথা বিস্মৃত হয়ে সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করছেন—আপনার বেশী লাগেনি তো?—এ কেবল নেতাজীর পক্ষেই সম্ভব।

সেখানে আকাশের তলায় শুয়ে নেতাজী হবিবকে বলেন—"যব্ আপনে মুলক ওয়াপস্ যায়ে তো মুল্কি ভাইয়োঁ কো বাতানা কি ম্যায় আখড়ি দম্ তক্ মুল্ক কি আজাদি কি লিয়ে লড়্তা রহা হুঁ, উয়ো জঙ্গে আজাদি কো জারি রাখেঁ। হিন্দুস্তান জরুর আজাদ হোগা, উসকো কোই গুলাম নাহি রাখ শক্তা।"

কলকাতায় আমাদের বসবার ঘরে বসে আই. এন. এ-র বন্ধুরাই কতদিন নিজেদের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। কেউ বলেছেন, সত্যি নয়, হবিবকে মিথ্যা বলতে বলা হয়েছিল, ও তাই বলেছে। আবার কেউ বলেছেন, তাই বলে এত দীর্ঘকাল ধরে সে মিথ্যা বলে যাবে? ধরো যদি নেতাজীর কোন বিপদই হয়ে থাকে পরবর্তীকালে, আমরা কেউ তো জানতেই পারব না। হবিব কী তবু ক্যাসাবায়ান্‌কা হয়ে থাকবে?

কলকাতার বসবার ঘরে তর্ক-বিতর্ক এক কথা আর তাইপের বিমান-বন্দরে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবা আর এক। একটা অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল। কী করে জানব কোনটা সত্যি কথা? কে বলে দেবে? কোনদিনও কেউ আর জানতে পারবে কী? দু'দিকেই প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাবে।

যখনি আমার মনে হচ্ছিল এমন হলেও হতে পারে যে, আমি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, আমার সামনেই অল্পদূরে ভেঙে পড়েছিল নেতাজীর প্লেন ; অগ্নিদগ্ধ, আহত নেতাজী এই মাটিতেই শুয়েছিলেন, পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হবিবকে—আপনার বেশী লাগেনি তো ?—তখনি আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল, চোখের সামনে প্লেনের ওঠা-নামা, তাইপের বিমান বন্দর সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যাঁরা বলেন এ ঘটনা সত্যি নয়—তাঁদের কথাই যেন সত্যি হয়, ভগবান করুন, তাঁদের কথাই সত্যি হোক।

মিঃ উ আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি ফিরবেন ? আমি বললাম, চলুন।

॥ ২০ ॥

আমাদের তাইপের দুই সঙ্গী রজার কু আর ক্রিষ্টিন লী দু'জনেই বয়সে নবীন। ওদের খুব ইচ্ছা আমাদের নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু এত নিস্পৃহ ট্যুরিষ্ট ওরা বিশেষ দেখেনি। তাইপের কোন দ্রষ্টব্যই যেন আমাদের বিশেষ আকর্ষণ করছে না। একদিন সকালে ওরা ধরে নিয়ে গেল এক সুন্দর চীনা শ্রাইন বা মন্দিরে। ঝল্‌মলে তোরণ পার হয়ে মন্দিরের প্রশস্ত বাগান। মন্দিরের স্থাপত্য প্রাচীন চীনা ধরনের হলেও আসলে মন্দিরটি বেশীদিনের নয়। এত অন্যমনস্ক ভাবে সব কিছু দেখলাম যে, এখন মনেও করতে পারছি না মন্দিরটির কী নাম।

মন্দিরের বাইরে এসে আমি কুণ্ঠিতভাবে বললাম, আমার একটি বিশেষ শ্রাইন দেখার ইচ্ছা ছিল। ওরা ব্যস্ত হয়ে বললে, বলো না কী দেখবে, এখনি নিয়ে যাব। আমি যে শ্রাইন দেখতে চাই তার নাম 'নিশি হোংগানজি'—। রজার আর ক্রিষ্টিন পরস্পর আলোচনা করল, ওরা ঠিক

বুঝতে পারছিল না আমি কোন শ্রাইন-এর কথা বলছি। সেদিন অবশ্য এমনিতে আমাদের তাইপের হাসপাতাল দেখতে যাবার কথা। রজার বললে, আগে চলো হাসপাতালটা ঘুরে আসি, এর মধ্যে একটু খোঁজ করে নেওয়া যাক নিশি হোংগানজি টেম্পল কোনদিকে হতে পারে।

হাসপাতাল বলতেও একটি বিশেষ হাসপাতাল আমাদের গন্তব্য। যুদ্ধের সময় সে হাসপাতালের নাম ছিল নানমুন মিলিটারি হাসপাতাল বা সাউথগেট হাসপাতাল। রজার আর ক্রিষ্টিন জোর দিয়ে বললে হাসপাতাল ওদের চেনা, ও ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

তাইপের পথে এদিক ওদিক ঘুরে গাড়ী এসে থামল এক বড়সড় বাড়ীর সামনে। হাসপাতালই বটে। তবে এ জায়গা তো সে জায়গা নয়। এ যে বেশ নূতন চক্‌চকে চেহারা। সে হাসপাতাল হবার কথা খুব সাধারণ চেহারার একতলা, পুরোন বাড়ী। রজার বললে, এই হাসপাতালেরই নাম ছিল সাউথগেট হাসপাতাল। এখন অবশ্য বলা হয় ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল বা পিস্ হাসপাতাল। আমি হতাশ মুখ করে গাড়ীতেই বসে ছিলাম। ওরা বললে, চলো ভিতরে গিয়ে না হয় জিজ্ঞাসা করি।

খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিতরে ঢুকলাম। এমনিতেই হাসপাতাল ভাল লাগে না আমার। মানুষের রোগ-তাপ-ব্যথা-যন্ত্রণা দেখলে অসহায় বোধ হয়। করিডর ধরে হেঁটে যেতে একটা বাঁক ঘুরতেই চমকে গেলাম। ভিতরে প্রশস্ত মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের একতলা লম্বা ধরনের একটা পুরোন বাড়ী, অনেকটা ব্যারাকের মত চেহারা। এ বাড়ী আমার চেনা, ছবি দেখেছি।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। সামনে হাসপাতালের নূতন উইং তৈরী হয়েছে। বাঁ পাশে আর একটা উইং তৈরী হচ্ছে। দুটো মিলে ইংরেজী ‘এল’ অক্ষরের মত। মাঝখানে পুরোন হাসপাতালের বাড়ীটি ঢাকা পড়ে গেছে। ততক্ষণে আমাদের সঙ্গে হাসপাতালের ডেপুটি ডিরেকটার এক মহিলা যোগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, পুরোন এই বাড়ীও আমরা শীগগিরই ভেঙে ফেলব, নূতন বাড়ী উঠবে এখানে। রজার ওকে বলছিল

আমাদের কোন এক আত্মীয় বহুদিন আগে খুব সম্ভবত এখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন তাই জায়গাটা আমরা একটু দেখব।

মহিলা আমাদের নিয়ে চললেন। একতলা বাড়ীর সামনে লম্বা টানা বারান্দা, তার পিছনে সার সার ঘর। কয়েক ধাপ সিঁড়ি মাঝখানে উঠে গিয়েছে বারান্দার দিকে। ডানদিকে সিঁড়ির বদলে আছে একটা ঢাল। মহিলা বললেন ওটা ছিল আগেকার ইমার্জেন্সির প্রবেশ পথ। ওপাশের ঘরটি ছিল ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড। প্রথমে সেই ঘর, তারপর একে একে অন্য সব ঘরে নিয়ে গেলেন সেই মহিলা। রুগী সব ঘরে। সকলে আমাদের দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে দেখছিল।

সেই '৪৫ সালের আগষ্ট মাসে হাসপাতালের ইন-চার্জ ছিলেন ডাঃ ইয়োশিমি। ১৮ই আগষ্ট দুপুরবেলা উনি টেলিফোন পান বিমানবন্দরে এরোপ্লেন ভেঙে পড়ে হতাহত হয়েছেন অনেকে, আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ইয়োশিমি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। ওর সহকারী ছিলেন ডাঃ সুরুতা।

একটু পরেই আহতরা এসে পৌঁছলেন। একজন জাপানী মিলিটারী অফিসার আহতদের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে ডাঃ ইয়োশিমিকে বলেন, ইনি ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিই ছিলেন সবচাইতে গুরুতর আহত ও অগ্নিদগ্ধ। কিন্তু উনি বলছিলেন অন্যদের আগে দেখতে, ওঁকে পরে দেখলেও চলবে। ডাক্তার তো সেকথা মানতে পারেন না। উনি প্রথমে ওঁকেই দেখলেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন, ভিটা কাম্ফর ও ডিজিটামাইন ইনজেকশন্ দিলেন। অবশ্য ডাক্তারের মনে হয়েছিল আজকের রাত কাটবে না। ডাঃ সুরুতার উপর ভার দিয়ে উনি অন্য আহতদের দিকে নজর দিলেন। নেতাজী যদি কিছু বলতে চান মনে করে একজন ইনটারপ্রিটার ডেকে পাঠানো হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দোভাষী নাকামুরা এসে পড়লেন।

নেতাজীকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল বলা হয়, তার সামনে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। উঁচু সিলিংওয়ালা বেশ বড় ঘর। সার সার বিছানায়

তিন-চারজন রুগীও রয়েছে দেখলাম। ডাঃ ইয়োশিমি এখন টোকিও থেকে বেশ দূরে এক জায়গায় থাকেন ও তাঁর ক্লিনিক পরিচালনা করেন। ডাঃ ইয়োশিমি, ডাঃ সুরুতা, দোভাষী নাকামুরা, অন্যান্য জাপানী আহত অফিসারেরা এবং হবিবুর রহমান ওদের সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা একাধিকবার বলেছেন। খুঁটিনাটি ব্যাপারে নানারকম অমিল আছে বিভিন্ন লোকের বক্তব্যে। কেউ বললেন, ঘরে ছিলেন শুধু নেতাজী ও হবিব, কেউ বললেন, না, সব আহতরা একসঙ্গে ছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি বললেন, নেতাজীকে ব্লাড ট্র্যানসফিউশন দেওয়া হল। ডাঃ সুরুতা বললেন, না দেওয়া হয়নি। কেউ বললেন রাত এগারোটায় সব শেষ হয়ে গেল, কেউ বললেন— না, রাত আটটায়। খুঁটিনাটিতে অমিল হলেও একথা অস্বীকার করা যায় যায় না যে, মূল কাহিনীর কাঠামো বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্যে একই থাকছে।

দোভাষী নাকামুরা বলছেন, উনি এসে পৌঁছবার পর নেতাজী অন্তত তিনবার কথা বলেন, তাঁর মধ্যে প্রথমবার বলেছিলেন, 'আমার পিছন পিছন আমার আরো কিছু সহকর্মীর এসে পৌঁছবার কথা, তাদের যেন ঠিকমত ব্যবস্থা করা হয়।' দোভাষী আরো বলেছেন, অন্যান্য জাপানী আহত অফিসারেরা যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলেন, কেউ বলছিলেন আর সহ্য করতে পারছি না, এর চাইতে আমাকে মেরে ফেলো। অথচ অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও নেতাজী ছিলেন ধীর স্থির ; একটি কাতরোক্তিও ওঁর মুখ থেকে কেউ শোনেনি।

সন্ধ্যার পর অবস্থার যখন অবনতি ঘটল, শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন দুই ডাক্তার, দুই নার্স, দোভাষী, একটি ওয়ার্ড বয় আর হবিবুর রহমান। ওয়ার্ড বয়টির নাম ছিল মিৎসুই। দোভাষী নাকামুরা শেষ সময়ের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। হবিবুর রহমান খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলেন কয়েক মিনিট, তারপর উঠে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘরে উপস্থিত সকলেই চোখের জল রুখতে পারছিলেন না। নার্স দুটি তো জোরে কেঁদে উঠেছিল।

ডাঃ ইয়োশিমি বলেন, উনি জাপানীভাষায় ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন—তাতে নাম লিখেছিলেন চন্দর বোস আর মৃত্যুর কারণ, থার্ড ডিগ্রি বার্ণস্। এইখানে আবার গোলমালের শুরু। কেউ জানে না এই সার্টিফিকেট কোথায় গেল।

আমাদের মহিলা ডেপুটি ডিরেকটর বললেন, তোমরা কি একটু অপেক্ষা করবে? ডিরেকটর বাইরে গেছেন, এখনি ফিরবেন। হয়ত তোমরা কোন ওল্ড্ রেকর্ড বা কাগজপত্র দেখতে চাও। আমরা বললাম, না, আমরা আর বসব না। তবে উনি কি জানেন নিশি হোংগানজি টেম্পল কোথায়? আমার নিজের ধারণা হাসপাতালের কাছাকাছি কোথাও ছিল এই মন্দির। মহিলা বললেন, হ্যাঁ, 'নিশি হোংগানজি' হাসপাতালের খুব কাছেই, সোজা যেতে পারলে কয়েক মিনিট লাগত। আজকাল নানারকম ওয়ান-ওয়ে রাস্তা হওয়াতে একটু ঘুরপথে যেতে হবে। ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

শোনা যায়, ক্রিমেটরিয়াম থেকে ভস্মাধার নিয়ে এসে হবিব এই নিশি হোংগানজি শ্রাইনে রেখেছিলেন। এখানে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানও হয়েছিল। তাতে ফরমোজা মিলিটারি হেডকোয়ার্টারস-এর পক্ষে মেজর নাগাটোমো উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে মেজর নাগাটোমো এসে উপস্থিত হন এবং ক্রিমেটরিয়ামে নেওয়ার সব ব্যবস্থা করেন। প্রথমে অবশ্য কথা হয়েছিল টোকিওতে দেহ নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমত ডাঃ ইয়োশিমি ফর্মেলিন ইনজেকশন দিয়ে দেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত কেন তা করা হল না সে কথা খুব পরিষ্কার নয়। কেউ বললেন, কাঠের কফিন বড্ড বড় ছিল, ছোট বিমানে নেওয়া যেত না। কেউ বললেন, না, টোকিও থেকে নির্দেশ এল সংকারের ব্যবস্থা যেন তাইপেতে করা হয়। এমন কি ঠিক কবে ক্রিমেশন হল—কুড়ি তারিখ, একুশ তারিখ?—তাই নিয়েও প্রশ্ন আছে। দোভাষী নাকামুরা বলেছেন ক্রিমেশন-এর সময় হবিবের সঙ্গে উনিও উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন মেজর নাগাটোমো। একজন বৌদ্ধ পুরোহিতও ছিলেন আর ক্রিমেটরিয়ামের কর্মী চু সাং। পরদিন এঁরা আবার

যান ও ভস্মাধার সংগ্রহ করে এনে নিশি হোংগানজি মন্দিরে স্থাপন করেন। হারীণ শা তাঁর বইয়ে লিখেছেন, উনি ক্রিমেটরিয়ামে গিয়ে কর্মী চু সাং-এর দেখা পান। সে তাঁকে বলেছিল, একজন ভারতীয় নেতার শেষ কাজে সে উপস্থিত ছিল। হারীণ শা আরো বলেছিলেন, হাসপাতালের এক নার্সকেও উনি পেয়েছিলেন। এদের দু'জনকে পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায়নি।

আমরা এক ঘিঞ্জি এলাকাতে এসে পড়লাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে গাড়ী ছেড়ে হেঁটে আমরা এক গলিতে ঢুকলাম—এখানেই নাকি নিশি হোংগানজি টেম্পল। গলির শেষে এসে আমাদের চক্ষু স্থির। সামনে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গিয়েছে মন্দিরের চাতাল পর্যন্ত—কিন্তু মন্দির কই? নালন্দার ধ্বংসস্তূপের মত কী যেন একটু দেখা যাচ্ছে। পাশের দোকানের লোকজন বললে, এখানে মস্ত বড় মন্দির ছিল। কিছুকাল আগে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। ওখানে সব কাঠের মন্দির, তাই আগুন লেগে পুড়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। আমরা সেই ভগ্নস্তূপের উপর ঘোরাঘুরি করলাম খানিক।

মিঃ উ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন বলে অপেক্ষা করছেন Celestial রেস্তোরাঁ নামে এক জায়গায়। আমরা তাই ফিরে চললাম। তাইপের এক জনবহুল রাস্তার ওপর এই সেলেস্টিয়াল বা স্বর্গীয় রেস্তোরাঁ। খেতে খেতে মিঃ উ-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল—সেদিনকার অভিজ্ঞতার গল্প। মিঃ উ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাঃ বোস, আপনি যখন পনেরো বছর আগে এসেছিলেন, তখন এই মন্দির দেখেছিলেন কি?' উনি বললেন—'হ্যাঁ, দেখেছিলাম। মন্দিরের পুরোহিতের ছেলের সঙ্গে কথাও হয়েছিল। তবে সে আগেকার ঘটনা খুব একটা জানে না বলেছিল।' মিঃ উ জানতে চাইছিলেন সেবার উনি আর কার দেখা পেয়েছিলেন, কী করেছিলেন এইসব।

উনি বললেন, 'কী আর করব। সেবার তো একা একা তাইপের পথে ঘুরছিলাম। খুব খারাপ লাগছিল—তায় আপনাদের ভাষাও জানি না। একদিন ঘুরতে ঘুরতে সোজা আপনাদের ফরেন অফিসে ঢুকে পড়লাম। একজন অফিসারকে বললাম—আমার সঙ্গে ইংরেজি বলতে পারেন এমন কোন অফিসারের যোগাযোগ করে দেবেন কি? আমার কিছু জিজ্ঞাসা

ছিল।' সে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেলেন ওদের ইউরোপীয়ান ডেস্‌কের যিনি প্রধান তাঁর কাছে। তাঁর নাম শু হেঙ্‌।

ওঁর ঘরে যখন ঢুকছি উনি কীরকম একটু আশ্চর্য মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ওঁকে আমি কী চাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, তখন আরো কেমন যেন আশ্চর্য ভাব করে আমার মুখের দিকে চেয়েই রইলেন। আমার পরিচয় বুঝবার পর শু হেঙ্‌ একটু হেসে বললেন—'এইবার বুঝলাম। আপনি যখন হেঁটে এসে ঘরে ঢুকছিলেন তখন আপনার চেহারা, হাঁটার ভঙ্গী আমার খুব চেনা-চেনা লাগছিল। আর যেই কথা বলতে শুরু করলেন, কণ্ঠস্বরও মনে হল আগে কোথাও শুনেছি। আসল কথা হল, আমি বেশ কিছুকাল কলকাতায় চীনের কনসাল জেনারেল ছিলাম! আপনার বাবা শরৎচন্দ্র বসুকে আমি যথেষ্ট ভালভাবে চিনতাম। হ্যাঁ, আপনার কাকাকেও চিনতাম বৈ কি। আপনার চেহারায়, গলার স্বরে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে, তাই আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতার নানকিং রেস্তোরাঁতে বেশ কয়েকবার আমি আপনার বাবা-কাকার সঙ্গে মিলিত হয়েছি।' একটু হেসে শু হেঙ্‌ আরো বললেন—'আচ্ছা, সেই যে আপনাদের দুটো বাড়ী ছিল কাছাকাছি, এলগিন রোডে আর উডবার্ন পার্কে—সে দুটো এখনো আছে?' বুঝুন একবার! কে ভেবেছিল তাইপে এসে এমন লোকের দেখা পাব যে জিজ্ঞাসা করবে এলগিন রোড আর উডবার্ন পার্কের খবর। আমার তখন তাইপে থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। হেঙ বারবার বলছিল আর দু'তিনদিন বেশী থেকে যান। আমাদের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? আমার পক্ষে তখন আর বেশী থাকা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এসে পড়েছিলাম হঠাৎ। তবে হেঙের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল তার পরও বেশ কিছুদিন। আমি যা খবরাখবর চাই তা ও যথাসাধ্য সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করেছে।

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হতে ক্রিষ্টিন বললে, চলো এবার একটু শপিং করবে। রজারও বললে আমাদের এখানে স্যুটকেস খুব ভাল আর খুব শস্তা,

কিনবে নাকি ? স্যুটকেস একটা কিনলে মন্দ হত না। কিন্তু আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম—মানে আর একটা জায়গা শুধু দেখব ভাবছিলাম। কী জায়গা ? ওরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল। বলতেও কেমন লাগে। তবু জোর করে বলে ফেললাম, তোমাদের ক্রিমেটরিয়ামটা একটু দেখতাম।

রজার আর ক্রিষ্টিন তো আমাকে পাগলই ভাবছিল। মিঃ উ বললেন, চলুন আমিই নিয়ে যাব। কারণ ওটা হল পুরোন ক্রিমেটরিয়াম। এখন আমাদের নতুন বড় ক্রিমেটরিয়াম হয়ে গেছে। পুরোনটা একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে।

খুঁজতে হবে কেন বুঝতে পারছিলাম না। সান ইয়াৎ সেন এভেনিউ ধরে চলে গেলে বেশ সহজেই নাকি জায়গাটা পাওয়া যায়। ডাঃ বসুও তো পেয়েছিলেন সেবার। অবশ্য তখনো সেটা তাইপের নাগরিকেরা ব্যবহার করতেন। মস্ত বড় হলঘর, তাতে পাশাপাশি ফার্ণেস। মাঝের বড় ফার্ণেসটি সাধারণত ভি-আই-পিদের জন্য থাকত।

মিঃ উ বললেন, 'ও অঞ্চলটাই পালটে গেছে বেশ। তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক।' বেশ ঘুরতে হল আমাদের। শেষ পর্যন্ত একটা কারখানার পিছন দিকে এসে পড়লাম। গাড়ী রেখে কারখানার উঠোন পার হয়ে উল্টো দিকের রাস্তায় এলাম। এখানেই ছিল সেই ক্রিমেটরিয়াম। এদিক ওদিক চাইতে নজরে পড়ল রাস্তার ওপারে খুব নূতন একটা পেট্রল পাম্প—ওরা বলে গ্যাসোলিন ষ্টেশন। খুব ঝকমক করছে। সেখানকার কর্মচারীরা বললে, হ্যাঁ, এইখানে একটা পুরোন ক্রিমেটরিয়াম ছিল। কিছুকাল আগে সেটা ভেঙে ফেলা হয়। সেই জায়গায় নূতন করে গড়ে উঠেছে এই গ্যাসোলিন ষ্টেশন। আমরা ফিরে চললাম।

তাইপের চিয়াং কাইশেক বিমানবন্দরে প্লেন ছাড়বার আগে রজার কু আমাদের কফি খাওয়াচ্ছিল। "কেমন লাগল তাইপে ?"—রজার জিজ্ঞাসা করল। ম্লান হেসে বললাম, ভাল। ওকে ঠিক বোঝানো যাবে না তাইপে থেকে কী জানি কেন খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কী, তাইপে এসে খুব দুঃখ পেলাম, তাইপের কথা লিখতে আরো বেশী।

॥ ২১ ॥

তাইপে থেকে হংকং-এর পথে প্লেনে এক ধরনের অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। মনে হল বড্ড বেশী ঘোরাঘুরি হয়ে গিয়েছে। এমন কি পা ব্যথা করছে খুব। হংকং-এ ক'দিন বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে মনে করে আশ্বস্ত হলাম। কারণ হংকং-এর পরই আবার আছে কিছু ব্যস্ত ঘোরাঘুরির পালা। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুরে ছড়িয়ে আছে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বেশ কিছু স্মৃতি। আমাদের সফরে ও জায়গা দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। আজ এত বছর বাদেও এই আন্দোলনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দলিলপত্র, ছবি এখনো পাওয়া যাচ্ছে—সেটাই ভেবে দেখলে আশ্চর্য মনে হয়। তাইপে ছেড়ে আসার আগে তাইপে হাসপাতালের ডিরেক্টর মিঃ উ-কে ফোন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কি হাসপাতালের কোন রেকর্ড দেখতে চান। ডিরেক্টর সাহেব মহা উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলেন, আমাদের হাসপাতালে গত দশ বছরের সব রেকর্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখা আছে। মিঃ উ যখন বললেন, পঁয়ত্রিশ বছর আগের রেকর্ড দরকার, তখন উনি হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তাই কখনো থাকে! তখন ছিল জাপানী অকুপেশন্, তারপর অ্যাংলো-আমেরিকানরা ল্যাণ্ড করল। তারপর চীনারা ভার পেলেন। আরো পরে মেন ল্যাণ্ড চীন থেকে সরকার এখানে সরে এল। এতগুলো উত্থান-পতনের পর অত দীর্ঘকাল আগের রেকর্ড আর থাকে কী?

সুখের বিষয় জাপানে যাবার পথেই হংকং-এর যা কিছু দ্রষ্টব্য তার অনেকটাই দেখে নিয়েছিলাম। তাই এবার যদি নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নিই কিছু যায় আসে না। বিশেষত সেখানে আছে অতিথিবৎসল বন্ধুগৃহ। হংকং প্রথম দর্শনের পরই আমার প্রিয় শহরে পরিণত হয়েছিল। অথচ

প্রথম যখন জাপান যাত্রার ছক তৈরি করছিলাম, তখন তো হংকং আমাদের সফরসূচী থেকে বাতিল করে দেবার তালে ছিলাম। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবার পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে চলেছি, হংকং তাতে অবান্তর মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য বুঝেছি হংকং না দেখলে লোকসানটা হতো আমারই।

প্রথমত, হংকং ভারী সুন্দর শহর। যেখানেই সমুদ্র আর পাহাড়ের সহাবস্থান হয় প্রকৃতি সেখানে হয়ে ওঠে মোহময়ী। একদিকে সমুদ্রের গভীর নীল জল, অন্যদিকে আকাশের গায়ে উঠে গেছে খাড়া খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। তার ওপর আধুনিক মানব সভ্যতার নিদর্শন ত্রিশতলা, চল্লিশতলা, সুদীর্ঘ অট্টালিকা মাথা উঁচু করে আছে। সব কিছু মিলে এই শহরের এক বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, হংকং অবান্তর হবে কেন? যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদা সূর্য অস্ত যেত না, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল নেতাজীর সংগ্রামের আহ্বান, তারই এক টুকরো কেমন করে যেন টিকে রয়ে গেছে এই ভূখণ্ডে। তাই আমার সফরে হংকং বেশ যথাযোগ্য পটভূমিকা রচনা করেছিল। তৃতীয়ত, আর একটি বিশেষ সূত্রেও হংকং-এর নাম জড়িয়ে গেছে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে। এই আন্দোলনের অনেক সৈনিক ও কর্মী যুদ্ধ শেষ হবার পর ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে হংকং-এর কুখ্যাত স্ট্যানলি জেলে ঠাঁই পান। নেতাজীর টোকিও ক্যাডেটরা তখন ছিলেন নেহাতই অল্পবয়সী ছেলের দল। তাঁরা হংকং-এর এই জেলখানাতে অত্যাচারিত হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ তার সাক্ষ্য এখনো বহন করছেন শরীরে।

এ সব দুঃখজনক ঘটনার কথা থাক। জাপানের পথে হংকং-এ কয়েকদিন খুব আনন্দেই কাটিয়ে গিয়েছি। একদিন যাওয়া হল ভিক্টোরিয়া পিক-এ, হংকং-এর সব চাইতে উঁচু পয়েন্ট। সেখান থেকে দেখা যায় নীচে সমুদ্র-মেখলা হংকং শহরের অপূর্ব ভিউ। এই ধরনের জায়গা পৃথিবীর সব দেশেই যেমন টুরিস্ট স্পট হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে তেমনি রাখা আছে। সুন্দর রেস্তোরাঁ, সুভেনিরের বাহারি দোকান। নীচ থেকে পিক-এ উঠে আসার জন্য রয়েছে ‘ফুনিকুলার’ বা ছোট ট্রেন, ট্যুরিস্টরা সেটাই পছন্দ

করেন। অবশ্য মোটরগাড়িতেও আসা যায়।

আর একদিন যাওয়া হল হংকং-এর সমুদ্র পার্কে। এটা এই শহরের একটা অবশ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে কেটে কেটে তৈরি হয়েছে বিস্তীর্ণ এই পার্ক। পাহাড়ের নীচ থেকে ওপরে সমুদ্র পার্ক পর্যন্ত সোজা উঠে গেছে কেব্‌ল্ কার বা চেয়ার কার। কেব্‌ল্ কার-এ যেতে যেতে চোখে পড়বে একদিকে দিগন্তবিস্তৃত দক্ষিণ চীন সমুদ্র, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়।

ওপরে কেব্‌ল্ কার স্টেশনে নেমে যাত্রীরা চলেছেন সমুদ্র থিয়েটারে। সেখানে বিরাট স্টেডিয়াম, এক সঙ্গে চার হাজার লোক বসতে পারে। সামনে জলের ওপাশে দ্বীপের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ট্রেনাররা। আর ডলফিন, সী-লায়ন, সীল, তিমি প্রভৃতি জলচল জীবেরা কত রকম খেলাই না দেখাচ্ছে। ডলফিনরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে নাচছে, গানও শোনাচ্ছে অবশ্য ওদের ভাষায়। মস্ত বড় লোহার রিং-এর মধ্যে দিয়ে গলে জলে লাফিয়ে পড়ছে। অবষ্ট্রাকল্ রেসের বাধা বিপত্তি ঠেলে দৌড়চ্ছে। এক-একটা খেলার শেষে পুরস্কার হিসেবে মাছ পুরে দেওয়া হচ্ছে ওদের মুখে। রঙীন বালতিতে ছোট ছোট মাছ নিয়ে স্টেজের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। কিসে ডলফিনরা বেশী অনুপ্রেরণা পাচ্ছে—মাছ খেয়ে না দর্শকের হাততালিতে বোঝা দুষ্কর।

ওপাশে আছে বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম। ওরা বলে অ্যাটল-রীফ, এটা নাকি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। চারতলা বাড়ির মধ্যে এই অ্যাকোয়ারিয়াম। বিভিন্ন তলা থেকে জলের মধ্যে মাছ দেখার ব্যবস্থা। মাছের মেলা বসে গিয়েছে। কত বিভিন্ন আকৃতি, কত বিভিন্ন রঙ। মাছের এত উজ্জ্বল রঙ হয়, লাল নীল কমলা, এত প্যাটার্ন হয় গায়ে—ফুলতোলা, ছিটছিট, স্ট্রাইপ দেওয়া, আগে জানা ছিল না। বিরাট আকারের মাছ ড্যাব ড্যাবে চোখ মেলে গম্ভীর চালে যেমন ঘুরছে, তেমনি ঝাঁক বেঁধে তরতর করে চলেছে ছোট ছোট মাছ।

অন্য দিকে দর্শকেরা ভিড় করেছেন 'ওয়েভ কোভ'-এ। সেখানে কৃত্রিম

জলাশয়ে যন্ত্র বসিয়ে কৃত্রিম ঢেউ তৈরি করা হয়েছে। এটা বেশ একটা আজব ব্যাপার। একদিকে ঢেউ তৈরির বিরাট যন্ত্র বসানো হয়েছে। তার সাহায্যে কৃত্রিম হ্রদে কখনো বিরাট, কখনো মৃদু ঢেউ তুলে তুলে উঠছে। সেই ঢেউয়ের মাথায় তুলে উঠছে ডলফিনের দল। একপাশে সমুদ্রতীর তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আছে বালি, বড় বড় পাথরের টুকরো, ছোট ছোট নুড়ি। পাথরের দ্বীপে রোদ পোহাচ্ছে সীলমাছ, কোথাও বসেছে পেঙ্গুইনদের জটলা। দর্শকদের জন্য কাঁচে ঢাকা তিনতলা গ্যালারি। নীচের তলায় দাঁড়ালে জলের নীচের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কাঁচের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছে ডলফিনরা। মানুষ আর পশু উভয়ে উভয়কে দেখছে মহা বিস্ময়ে।

সমুদ্র পার্কের পরিশ্রান্ত দর্শকেরা কেউ ঢুকছেন রেস্তোরাঁতে, কেউ ভিড় করছেন আইসক্রীম পার্লারে। তারপর আবার কেব্‌ল্ কার-এ চেপে ঘরে ফেরার পালা।

সমুদ্র দেখার জন্য অবশ্য আমাদের বাড়ির বাইরে যাবার প্রয়োজন হতো না। বাড়ি একেবারে সমুদ্রের ধারে। উনত্রিশ তলার অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় বসে নীচের দিকে তাকালে মনে হত বসে আছি জাহাজের ডেকে। তবুও একদিন যাওয়া হল হংকং-এর রিপালস্ বে-তে, যেখানে রয়েছে একটানা লম্বা সমুদ্রবেলা।

হংকং-এ আমাদের যেন দূরপ্রাচ্য ভ্রমণের আগে ওরিয়েন্টেশন্ কোর্স হল। ওখানকার চীনা সম্প্রদায়ের চাল-চলন, রীতি-নীতি দেখতে দেখতে অনেক কিছু শিখে নিলাম যা কিনা পরে জাপানে কাজে লাগল। যেমন একটা হল চপস্টিক দিয়ে খাওয়া, হংকং-এ ওটাতে হাতে খড়ি। একদিন রেড পেপার (pepper) নামে এক রেস্তোরাঁতে খাওয়া হল। চপস্টিক দিয়ে ছোট ছোট বাটি থেকে তুলে খাওয়া। চীনে রান্না হলেও একটু দিশী ঝাল ঝাল ভাব। ওরা বললে, এটা চীনের সে-চুয়ান প্রদেশের রান্না—ওরা একটু ঝাল মশলাই পছন্দ করে।

হংকং বিমান বন্দর সদা ব্যস্ত। একসঙ্গে কতগুলো প্লেন যে ল্যাণ্ড করল

ঠিক নেই। ফলে কাস্টমস্, ইমিগ্রেশন এলাকায় মনে হয় যেন মেলা বসে গেছে। প্রথমবার ভারতবর্ষ থেকে আসছি শুনে জানতে চেয়েছিল, গাঁজা বা চরস সঙ্গে আছে কিনা অথবা বন্দুক, পিস্তল। তাইপে থেকে হংকং-এ পৌঁছে আগেভাগেই তাই সুটকেস খুলে রাখলাম। কিন্তু এ যাত্রা কিছু দেখতেই চাইল না। তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেয়ে অবশ্য খুশিই হলাম। কারণ পায়ের ব্যথায় খুঁড়িয়ে হাঁটছিলাম। বাইরে বিরাট 'ওয়েলকাম' এলাকাতে যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ভিড়। দূর থেকেই চেনা মুখ চোখে পড়ল। দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের অতিথিবৎসল বন্ধুরা—কর্তা ও গৃহিণী।

সুটকেস বোঝাই ঠেলাগাড়ি আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঠেলে চলতে চলতে ওঁরা হংকং-এ ক'দিনের যা প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে, উৎসাহের সঙ্গে তা বলতে শুরু করেছিলেন। এদিকে পায়ের ব্যথাটা গোপন করে যাবার চেষ্টা করে সন্তর্পণে হাঁটছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খুব। তবে গৃহকর্ত্রী অলি বললেন, চিন্তার কিছু নেই, আমাদের হংকং-এ টাইগার বাম বলে একটা সাংঘাতিক মলম পাওয়া যায়। সেটা একটু লাগালেই মাথাব্যথা থেকে পা-ভাঙা সব যন্ত্রণা পাঁচ মিনিটে উধাও। গৃহকর্তাও কম যান না। উনি বললেন, ওঁর স্টকে আছে আরো জোরালো কোন ওষুধ যার সামান্য একটু ডোজে চাঙ্গা হয়ে উঠব আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, হোমিওপ্যাথি বুঝি? তার উত্তরে গৃহকর্তা একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন শুধু।

যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের ঊনত্রিশ তলার অ্যাপার্টমেন্টের সমুদ্রের হাওয়াকে হার মানিয়ে চারিদিক সেই ব্যাঘ্র মলমের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে উঠল। সকলের পালাই-পালাই অবস্থা। আজকের রাতটুকু বিশ্রাম নিলে কাল সকাল থেকে প্রোগ্রাম মত কাজ শুরু করা যাবে, এই কথা বলাবলি করে বেশ আশ্বস্ত হয়ে সকলে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য রকম। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলাম আমার পক্ষে বিছানা ছেড়ে ওঠাই সম্ভব নয়। পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। মনে হল সফরসূচী পালটে ফেলতে হবে সবই। হয়ত এখান

থেকেই ফিরে যেতে হবে কলকাতা। মনটা ভেঙে গেল খুব। সিঙ্গাপুরই যদি না দেখলাম, আজাদ হিন্দ আন্দোলনের জন্মস্থানই যদি না দেখলাম—তবে আর দেখা হল কী! চোখে জল এসে গেল আমার। ছবিতে দেখা, ডকুমেণ্টারি ফিলমে দেখা নানান দৃশ্য সেই ভোর রাত্রে সিনেমার পর্দার মতই চোখে ভাসতে লাগল আমার—

সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হল-এ মস্ত বড় জনসভা হচ্ছে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রবেশপথ। দলে দলে লোক আসছে সভায়। গাড়ি থেকে নেমে সাদা শাড়ি পরা একঝাঁক অল্পবয়সী মেয়ে ঢুকে গেল সভাতে। একটু পরেই দেখা গেল, মঞ্চের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গান গাইছে মেয়েরা, 'বন্দেমাতরম্'। নেতাজী বসে রয়েছেন মঞ্চে, সাদা কোট প্যাণ্ট পরা, মাথায় গান্ধীটুপি, ওপাশে সামরিক ইউনিফর্মে মেজর জেনারেল ভোঁসলে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন প্রবীণ নেতা রাসবিহারী বসু। এই সেই বিখ্যাত বক্তৃতা, রাসবিহারী ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন নেতাজীর হাতে। ঘোষণা করছেন, আজ থেকে আমাদের সংগ্রামের নেতা হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। রাসবিহারী বলছেন—আমি কয়েক দিনের জন্য জাপান গিয়েছিলাম, অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের জন্য কী উপহার আনলেন। আমি আপনাদের জন্য এই উপহার এনেছি—হাত দিয়ে পাশে বসা নেতাজীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন উনি। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই মুহূর্তে নেতাজী মুখ ফিরিয়ে মেজর জেনারেল ভোঁসলেকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হল ভরতি লোকের করতালিতে প্রথম সচকিত তারপর বিনীত ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন! রাসবিহারী বসু বলে চলেছেন—আমি এই উপহার এনেছি, ইনি সুভাষচন্দ্র বসু, এঁর পরিচয় আপনাদের কাছে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ক্যামেরা এই সময়ে অনেকক্ষণ ফোকাস করে আছে নেতাজীর মুখে, আপন প্রশস্তি শুনে সলজ্জ মুখ নিচু করে রয়েছেন উনি।

একটু বেলাতে যখন ডাক্তার ওষুধ-ব্যাণ্ডেজ নানা রকম হইচই চলছে, বাড়িতে তখন বসবার ঘর থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল।

জন জেকবের গলা না? জন জেকব আই এন এ'র একজন প্রাক্তন অফিসার। আমাদের সিঙ্গাপুরের বন্ধু। আই এন এ'তে যখন যোগ দেন বয়স ছিল তখন খুবই কম। সেই যে 'ম্যাজিক টাচ্' লেগে গিয়েছে, আজও তাই নেতাজী বলতে অজ্ঞান। ওঁর কাছে রয়েছে নেতাজীর কিছু 'রেলিক'। পরবর্তীকালে জেকব সিঙ্গাপুর ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসেরও সক্রিয় কর্মী। সিঙ্গাপুরের নানান সমাজকল্যাণ কাজ নেতাজীর নামের সঙ্গে যুক্ত করে চলেছেন উনি।

আমি ভাবছি, জেকব কোথা থেকে হংকং-এ এল এখন? জানলোই বা কেমন করে যে, আমরা এখানে রয়েছি। আমার এই প্রশ্ন নিশ্চয় ও-ঘরে কেউ করলেন। কারণ শুনতে পেলাম জেকব উচ্চৈঃস্বরে বলছে—আমরা হলাম গিয়ে Netaji's men—নেতাজীর অনুচর, সহজ লোক তো নই, কোথা থেকে কী খবর যোগাড় করা যায় সব আমাদের জানা, হাঃ, হাঃ!

শোবার ঘরে এসে আমার অবস্থা দেখে অবশ্য ওর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চোখে জল দেখে বিচলিত হয়ে বললে, 'কেন ভাবছ সিঙ্গাপুর দেখা হবে না, নিশ্চয় হবে। নেতাজীর স্মৃতিবিজড়িত যে ক'টি জায়গা রয়েছে সিঙ্গাপুরে সব তুমি নিশ্চয় দেখবে।' আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য বললে—'এই দেখো না মীরা—আহা, আমার ওয়াইফ মীরার কথা বলছি—পায়ের ব্যথায় এক বছর পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এখন আবার সুস্থ হয়ে সব কাজকর্ম দৌড়ে দৌড়ে করছে।'

কিসে ভাল হলেন উনি, জানতে চাইলাম। জেকব বললেন, বাই প্রেয়ারস্, শুধু প্রার্থনায়। কোন ওষুধে কাজ হচ্ছিল না। শেষে একদিন হতাশ হয়ে সব ওষুধ বন্ধ করে দিলে, সেদিন থেকে শুধু প্রেয়ারস, শুধু প্রার্থনা।

'প্লিজ আস্‌ক হার টু ইনক্লুড মি ইন হার প্রেয়ারস্'—অনেক কষ্টে বললাম আমি।

বেশ কয়েকটা টেলিফোন করা হল সিঙ্গাপুরে, কিছু প্রোগ্রাম অদল বদল হল। আমার গৃহস্বামী বুদ্ধি করে এয়ারওয়েজের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফেলল। শুনলাম হুইল-চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে আমার জন্য বিমান-

বন্দরে। গৃহস্বামী হিলি কিনে আনলে এক লাঠি, তার গায়ে ছাপ মারা 'মেড ইন রেড চায়না'। পরবর্তীকালে কলকাতায় চৈনিক লাঠির দৌলতে আমার স্টেটাস্ খুবই উঁচুতে উঠে গিয়েছিল।

অতঃপর একদিন ভোর রাত্রে হংকং বিমানবন্দরে হুইল-চেয়ারে চেপে সিঙ্গাপুরের প্লেনের দিকে চললাম। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। বিমানবন্দরে অনেকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালে। কাস্টমস্, সিকিওরিটি সকলে বিশেষ ভাবে সদয়। করুণমুখে বসে রয়েছি, হাতে রয়েছে মোটা চৈনিক লাঠি। মনে মনে বলছি—লাউ গড়গড়, লাউ গড়গড়, খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল, বিচি ফেলি টুলটুল, বুড়ি গেল ঢের দূর।

॥ ২২ ॥

সিঙ্গাপুরে পা দিয়েই মনে হল শহরটা যেন অনেকদিনের চেনা। আসলে এটা অবশ্য মনের বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আজকের সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের সিঙ্গাপুরের পার্থক্য নিশ্চয় অনেক। কিন্তু এখনো এই শহরের কোন কোন জায়গা বা কোন কোন বিশেষ অট্টালিকা সেই সব ফেলে আসা দিনের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সিঙ্গাপুর পর্যায়ের বহু ছবি সৌভাগ্যক্রমে আজও রয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে ছবিতে যা দেখে আসছি তা বাস্তবে দেখতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হলাম সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে নেতাজী এসে নামছেন। ২রা জুলাই ১৯৪৩, তারই কত যে ছবি দেখেছি ঠিক নেই। ডকুমেণ্টারি ফিল্মেও দেখেছি নেতাজী দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে আসছেন। ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন সকলে, হাতে গুঁজে দিচ্ছেন বিরাট ফুলের তোড়া। গার্ড অব অনার দেওয়া হল নেতাজীকে। রাসবিহারী বসু ছাড়াও জমান কিয়ানি, ভোঁসলে প্রভৃতি

অন্যান্য অফিসাররা উপস্থিত রয়েছেন।

হুইল-চেয়ার থেকেই দেখতে পেলাম দূরে অভ্যর্থনা এলাকায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন মুথুকৃষ্ণণ, রামানুজম, মীরা জেকব, মিসেস সিনহা প্রভৃতি সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা। সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অসুস্থতার খবর পৌঁছে গেছে সিঙ্গাপুরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের বাসস্থানে এসে পড়লাম। সিঙ্গাপুরের দিনগুলি খুব শান্ত, সুন্দর পরিবেশে কাটল। আমরা ছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সিদ্ধাত্মানন্দজী ও তাঁর সহকর্মীদের তত্ত্বাবধানে। যদিও গেষ্ট হাউসটি ছিল আশ্রম চত্বরের বাইরে, তবুও আশ্রমের পূজা-পূজা পরিবেশের ছোঁয়া লেগে থাকত সেখানে। আর সিদ্ধাত্মানন্দজী যে স্নেহ ও মমতায় আমাদের ঘিরে রেখেছিলেন তাতে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার পক্ষে হাঁটাচলা কষ্টকর, তাই আমার খাবার-দাবার ও যা কিছু প্রয়োজন গেষ্ট হাউস-এ পৌঁছে যাচ্ছে সর্বক্ষণ।

আবার আমাদের আসার খবর পেয়ে বহু লোকজন ফোন করছেন, আমাদের নিয়ে যেতে চান এদিক-ওদিক, কেউ বা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চান। সিদ্ধাত্মানন্দজী ফোন তুলেই বলে দেন—না, না, ও যেতে পারবে না, ওর শরীর ভাল নেই, তোমরাই বরং চলে এসো এখানে, কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ ডিনার উইথ আস। কতজনকে যে 'কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ ডিনার' বলে চলেছেন, আমি একটু চিন্তিত বোধ করতাম, কোন অসুবিধা হবে না তো আশ্রমের। আমারই বোঝার ভুল। অসুবিধা আবার কি! ঠাকুরের নামে সবকিছু অতি সুষ্ঠুভাবে হয়ে যেত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমাগত অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব। তারপর আশ্রমের দীর্ঘ ডাইনিং হল-এ সকলে মিলে আনন্দ ও পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার। সাধারণ কয়েকটি নিরামিষ পদ, তার সঙ্গে হয়ত আছে পায়েস। সিদ্ধাত্মানন্দজী বলতেন, নারকেল দেওয়া তরকারিটা নিয়েছ তো? আজকের পায়েসটা স্পেশাল, আর একটু নাও। রান্নাবান্নায় লক্ষ করতাম বেশ একটু দক্ষিণ ভারতীয় ছাপ। তখনি শুনেছিলাম, আশ্রমের অনেকে এবং ঐ এলাকার অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতীয়। সিদ্ধাত্মানন্দজী নিজে অবশ্য বাংলার। একদিন খাবার

টেবিলে আমাকে পিতৃকুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নিজেই বললেন, ওঁর পূর্বগৃহ একেবারে আমার পিতৃগৃহে অর্থাৎ ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে এবং আমাকে কিঞ্চিৎ অবাক করে দিয়ে আমার সাহিত্যিক ও চিকিৎসক দুই কাকার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। শুনেছি সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম জিজ্ঞাসা করতে নেই, তাই আমি আর ফিরে ওঁকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমরা সিঙ্গাপুর ছেড়ে আসার অল্পদিন পরেই গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম, সিদ্ধাত্মানন্দজী দেহরক্ষা করেছেন।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ছিল নেতাজীর গভীর আত্মিক যোগ। আয়ার সাহেব, আবিদ হাসান সকলের কাছে শুনেছি যুদ্ধের নানা বিপর্যয়, নানা জটিলতার মধ্যেও হঠাৎ নেতাজী গভীর রাত্রে চলে যেতেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে, সেখানে পূজার ঘরে নীরবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার ফিরে যেতেন কর্মক্ষেত্রে। এঁরা সকলেই বলেন, নেতাজী ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ একেবারে ছিল না। আবিদ হাসান গল্প করেছেন, 'আমরা শুধু জানতাম, ওঁর কাছে সর্বক্ষণ থাকে একটি ছোট গীতা আর একটি রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু উনি কখন কি করেন, আদৌ কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ করেন কিনা কেউ জানতে পারত না। ওঁর নিজস্ব পরিচারক কুন্দন সিং ভোরবেলা ওঁর ঘরে ঢুকে কাজকর্ম শুরু করার অনেক আগেই ওঁর যা কিছু করণীয় হয়ে যেত। এ নিয়ে কোন অযথা কৌতূহলও আমরা প্রকাশ করতাম না।'

সিদ্ধাত্মানন্দজী সিঙ্গাপুরে আমাদের প্রথম দিনেই বললেন, 'নেতাজী রামকৃষ্ণ মিশনের যে বাড়িটিতে সর্বদা যাতায়াত করতেন, যে পূজার ঘরে এসে বসতেন, সে জায়গা তো তোমাদের দেখতেই হবে। আর সিঙ্গাপুরে সেটাই প্রথম দ্রষ্টব্য হওয়া উচিত।'

অতএব সেদিন বিকেলেই আশ্রমের অপর স্বামীজী মহারাজ আমাদের নিয়ে চললেন মিশনের পুরনো বাড়িতে। পথে যেতে আমরা শুনলাম, মিশনের বর্তমান বাড়িটি অপেক্ষাকৃত নূতন। যুদ্ধের সময় মিশনের কাজকর্ম যে বাড়িতে চলত সে বাড়ি এখনো আছে। সেখানে লেকচার রুম,

লাইব্রেরী সবই রয়েছে এবং নিয়মিত কাজকর্ম চলছে। নূতন বাড়িটি প্রশস্ত রাজপথের উপর চারিদিকে বাগান দিয়ে ঘেরা। পুরনো বাড়ি দেখলাম একটু সরু রাস্তার ওপর, অপেক্ষাকৃত চাপা।

পুরনো মিশন বাড়িতে স্বামী স্থিতানন্দজী আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রথমেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে পূজার ঘরে যাওয়া হল। ধূপ দীপ ফুলের গন্ধে সেখানে ভাবগম্ভীর পরিবেশ। এই সেই ঘর যেখানে নেতাজী মাঝে মাঝেই গভীর রাত্রে এসে উপস্থিত হতেন। সামরিক ইউনিফর্ম ছেড়ে পরে নিতেন পট্টবস্ত্র। তারপর এক ঘন্টা বা দু' ঘণ্টা পূজার ঘরে একাকী বসতেন।

নেতাজীর এই দিকটির বিষয় আয়ার সাহেবের কাছেও শুনেছি অনেকবার। আয়ার বলতেন, সব সময়ে যে নেতাজী ওখানে যেতেন তা নয়। মাঝে মাঝে ডিনারের পর এগারোটা নাগাদ নেতাজী বলতেন, গাড়িটা মিশনে পাঠিয়ে দাও। গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসত অধ্যক্ষ মহারাজকে, নয়ত ওঁর সহকর্মী ব্রহ্মচারী কৈলাসমকে। অনেক রাত পর্যন্ত আধ্যাত্মিক আলাপ আলোচনায় সময় কাটিয়ে ওঁরা ফিরে যেতেন। এই ব্রহ্মচারী কৈলাসমের সঙ্গে নেতাজীর কালে এক বিশেষ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

আয়ার সাহেব শেষ যেবার আমাদের সঙ্গে কলকাতায় কয়েকদিন কাটালেন, তখন উনি নিজেই বেশ অসুস্থ, হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। বেশী ঘোরাফেরা, বেশী লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বারণ ছিল। আমার সেই ছিল সুযোগ। দুপুরবেলা ওঁর প্রিয় লাঞ্চ—বেগুন পোড়ার সঙ্গে দই মেখে একটু ভাত দিয়ে খেয়ে উডবার্ন পার্কের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যখন বিশ্রাম করতেন, তখনি বিগত দিনের টুকিটাকি গল্প সব শুনতে পেতাম।

নেতাজীর ধর্মবিশ্বাস, আয়ার বলতেন—'স্পিরিচুয়াল ফেথ' ছিল গভীর। কিন্তু এ নিয়ে কোন আত্মপ্রচার উনি কখনো করতেন না। নানান দুর্যোগের মধ্যে, সুখে-দুঃখে জয়-পরাজয়ে নেতাজী যেরকম অবিচলিত, শান্ত থাকতেন,

গভীর স্পিরিচুয়াল ফেথ না থাকলে মানুষে তা পারে না। আর এই যে সুখে বিগতস্পৃহ আর দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-মন হয়ে থাকা, এর প্রভাব আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনেও পড়ত। আমাদের ওপর দিয়েও তো কম ঝড়-ঝাপটা যায়নি সে-সব দিনে। কিন্তু কোন কোন দিন কাজের শেষে গভীর রাত্রে যখন ওঁর সঙ্গে শান্তভাবে দু-চারটে কথা বলার সুযোগ হত, ওঁর নিজের মনের স্থৈর্য যেন আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতেন।

আয়ার আরো বলতেন, এই যে তোমরা জিজ্ঞেস করো কী করে উনি এত হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন—এর উত্তরও পাওয়া যাবে ওঁর সেই গভীর স্পিরিচুয়াল ফেথের মধ্যে, যে কাজই উনি করতেন মনে হত যেন অন্তরের নির্দেশ পেয়ে করছেন। তাই উনি যখন আহ্বান করতেন, কেউ ওঁকে ফেরাতে পারত না। ওঁর ডাকে সামান্য সৈনিক ও দেশপ্রেমিক বীরে পরিণত হত, নিতান্ত লোভী ব্যবসায়ীও সর্বস্ব দান করে ফকির হয়ে ধন্য বোধ করত।

আয়ার নিজেও ছিলেন একান্তভাবে ধর্মপ্রাণ। নেতাজীর সংস্পর্শে এসে এটা ঘটেছিল কিনা বলতে পারি না। মৃত্যুর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে আয়ার ছিলেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সভাপতি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, উনি ব্যস্ত হতেন, উনি কোন কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারছেন না। হয়ত তখন নেতাজীর জন্মদিনের আয়োজন চলছে, হয়ত কোন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স বসবে। আয়ার সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি দিতেন, আমি কোন কাজে লাগছি না তোমাদের, আমি শুধু প্রার্থনা করছি সবকিছু সুন্দর হোক, সফল হোক, এ ছাড়া আমার আর কোন ক্ষমতা নেই। এখান থেকে তাড়াতাড়ি লেখা হত, ব্যস্ত হবেন না—They also serve who only pray—আপনার প্রার্থনার মূল্য আমাদের কাছে অনেক।

পূজার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কথা হচ্ছিল। নেতাজীর অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন উনি। কিছুকাল আগে উনি দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু ওঁর জীবিতকালে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে উনি ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ রেখে চলতেন। ওঁর কাছ থেকে নেতাজী মিউজিয়ামের জন্য কিছু দুর্লভ জিনিস পাওয়া গেছে।

সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে নেতাজী রামকৃষ্ণ মিশনে ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কাছে নিজের হাতের দুটি ছাপ রেখে যান। কেন যে উনি এই হাতের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন তা ঠিক জানা নেই। আজ এই হাতের ছাপ আছে নেতাজী মিউজিয়ামে। অনেকে দেখতে আসেন। বিশেষত যাঁরা জ্যোতিষচর্চা করেন, অনেকে বিভিন্ন সময়ে দেখে গেছেন হস্তরেখা। এ ছাড়াও বেশ কিছু মূল্যবান কাগজপত্র, নেতাজীর নিজের হাতের লেখা, নোট ইত্যাদি ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কাছে উনি গচ্ছিত রেখেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর পর ব্রহ্মচারীজী ভারতে আসেন। সে সময়ে শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন কার্সিয়াং-এ। ব্রহ্মচারী কৈলাসম সেখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং সেইসব গচ্ছিত কাগজপত্র দিয়ে যান।

ব্রহ্মচারী কৈলাসমকে আমি দেখি ষাটের দশকের গোড়ায়। তখন ওঁর নাম হয়েছে স্বামী সত্যানন্দ। উনি ওঁর কাছে লেখা নেতাজীর সব চিঠিপত্র সেবার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে দিয়ে যান। তখনি দেখেছিলাম সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবার পর যুদ্ধের নানা কাজের মধ্যেও নেতাজী ওঁকে নিয়মিত চিঠি লিখে চলেছেন। ব্রহ্মচারী কৈলাসম নেতাজী মিউজিয়ামের জন্য আরো পাঠিয়েছিলেন নেতাজীর টেবিল। সিঙ্গাপুরে নেতাজী লিখবার যে টেবিল ও চেয়ার ব্যবহার করতেন, সে দুটি ছিল ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কাছে। ১৯৫৯ সালে টেবিলটি উনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। সুপ্রিম কম্যানডারের টেবিল খুব একটা সাংঘাতিক কিছু হবে কেউ যদি ভেবে থাকেন, তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। খুব সাদাসিধে চেহারার একটি কাঠের টেবিল। নেতাজী আড়ম্বর অপছন্দ করতেন। ব্রহ্মচারী কৈলাসম টেবিলটি পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, উনি যতদিন থাকবেন চেয়ারটি উনি নিজের কাছে রাখতে চান। ওঁর মৃত্যুর পর চেয়ারটি যেন টেবিলের সঙ্গে মিউজিয়ামে যুক্ত হয়। একবারকার সফরে চেয়ারটির দেখা পেলাম আমরা। হাতলহীন খুবই সাধারণ চেহারার একটি চেয়ার। ব্রহ্মচারীজীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে চেয়ারটি

ওঁর অনুগামীরা নেতাজী মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগের অপর একটি দিকও আছে। আজাদ হিন্দ সরকার যে-সব সমাজকল্যাণমূলক কাজে হাত দিতেন, তার সব কিছুতে আশ্রমের উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্য পেতেন। যুদ্ধের সময় সরকারের মিলিটারি দিক ছাড়াও সিভিলিয়ান দিকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এ-সব কাজে আশ্রম অগ্রণী ভূমিকা নিত। নেতাজীর কাজে ব্রহ্মচারী কৈলাসম একবার থাইল্যাণ্ড ঘুরে এলেন।

ভারতের মুক্তিযুদ্ধ যখন সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, নেতাজী যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির খবর দিয়ে চিঠি লিখছেন ব্রহ্মচারীজীকে। উনিও জানতে চাইছেন সব খবর। ওঁর চিঠি সিঙ্গাপুর থেকে কখনো নিয়ে যাচ্ছেন লেঃ-কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি, কখনো বা আলাগাপ্পান। এমনি এক চিঠিতে ১৯৪৪-এর অক্টোবরে নেতাজী লিখছেন, 'জয়হিন্দ—আমি ভাল আছি জানাতে আজ এই এক লাইন লিখছি। ফ্রণ্টে সেনাবাহিনীর ইনস্‌পেকশন সেরে এই সবে ফিরে এসেছি। আমাদের সেনাবাহিনীর মনোবল অনেক দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অটুট আছে। অসামরিক লোকজনের মনোবলও বেশ ভাল। মালয়ে মনোবল কমে যাচ্ছে জেনে দুঃখিত হলাম। কিছুদিন পর হয়ত সিঙ্গাপুরে যাব। স্বামিজী ও আপনি প্রণাম গ্রহণ করবেন। জয়হিন্দ। সুভাষচন্দ্র বসু।'

মনে রাখতে হবে এই চিঠি যখন লিখছেন, ইমফল যুদ্ধে পরাজয় ঘটে গিয়েছে। সাধারণভাবে যুদ্ধের অবস্থা তখন জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিকূল।

সিঙ্গাপুর পুরনো আশ্রমের সব ঘর স্থিতানন্দজী আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। লেকচার রুম বেশ বড়। একদিকে স্টেজ, অন্যদিকে চেয়ার পাতা। এই ঘরে নেতাজী বক্তৃতা করে গিয়েছেন—স্থিতানন্দজী জানালেন। সিদ্ধানন্দজী ঠিকই বলেছিলেন, এই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দিয়ে আমাদের সিঙ্গাপুরের ভ্রমণসূচী শুরু করা ভাল হবে। কারণ সিঙ্গাপুরে আমরা পর পর অনেকগুলো বাড়ি দেখলাম, যে-সব বাড়ির সঙ্গে আজাদ হিন্দ

আন্দোলনের যোগ ছিল। কিন্তু ইঁট-কাঠের তৈরী বাড়িতে তো প্রাণ থাকে না। তবুও বিশেষ কোন জায়গায় গেলে মনে হয়, এখানে যেন ইতিহাস বাঁধা পড়ে গেছে। এমন কি ইঁট-কাঠও নীরবে কিছু বলতে চায়। এই অনুভূতি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আর নেতাজীর মায়ারস রোডের বাসভবনে।

নীচে খাবার ঘরে নেমে এসে দেখি স্থিতানন্দজী চায়ের ব্যবস্থা পরিপাটি করে রেখেছেন, সঙ্গে আছে দোসা। এইসব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আতিথ্যে আমরা বারবার অভিভূত বোধ করছিলাম।

॥ ২৩ ॥

আমেরিকার বস্টন শহরে আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ল্যান্ড মার্ক ছড়িয়ে আছে। কোন বিদেশী যদি সে সব দেখতে চান ওরা বলে—ফলো দ্য ফ্রিডাম ট্রেল। শহরের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে ফুটপাথ ধরে ধরে, কখনো বা রাজপথের ওপর দিয়ে চলে গেছে লাল রঙের সুদীর্ঘ পথরেখা। লালরঙের পথরেখা ধরে যদি কেউ হেঁটে চলে যান, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ল্যান্ড মার্ক সব দেখা হয়ে যাবে, কোথাও আছে টাউন হল, কোথাও স্টাচু, কোথাও বা সমাধিক্ষেত্র।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই রকম একটি ফ্রিডাম ট্রেল থাকতে পারত, কারণ শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত অনেক ল্যান্ড মার্ক। অবশ্য তা হবার নয়। সিঙ্গাপুর পররাষ্ট্র। ছোট এই শহর হল এক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বলা চলে একটি সিটি স্টেট—যেন এথেনস্ বা স্পার্টার মত। আর বর্তমানে সিঙ্গাপুরে রাজ্য শাসন করছেন এক জবরদস্ত, ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর রাজত্বে সিঙ্গাপুর নিয়ম-শৃঙ্খলার এক দৃষ্টান্ত হয়ে পড়েছে। সিঙ্গাপুরের পথঘাট

ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করে। একটি শুকনো পাতাও কোথাও পড়তে পায় না। শুনলাম সিগারেটের ছাই দৈবাৎ হাত থেকে পথে পড়লে অমনি পেয়াদা এসে পাকড়ে ধরবে আর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ফাইন। যে কথা বলছিলাম, আমাদের সরকারের ইচ্ছা থাকলে সিঙ্গাপুর সরকারের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের একটি বা দুটি স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করা যেত না এমন নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে রকম কোন চেষ্টা হয় নি। যে কোন কর্তৃপক্ষ কোন কাজ করেন জনসাধারণের অনুরোধে বা তাগাদায়। সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের দুটো ভাগ করা যায়। একদল যাঁরা সে যুগেও এখানে ছিলেন, তাঁরা কেমন যেন হতাশা ও ফ্রাস্‌ট্রেশনে ভুগছেন। অপর যারা অনেক পরে জীবিকার জন্য এসেছেন তাঁরা নিজেদের স্বচ্ছলতায় সুখী, বিগত দিন নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর কম। তাই তেমন কোন সংরক্ষণের তাগিদ কোথাও থেকে আসেনি।

যা হোক, আমরা মনে মনে নিজেদের মত এক ফ্রিডাম ট্রেল তৈরী করে নিলাম আর সেই মত নেতাজী ও আজাদ হিন্দ আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলির সন্ধানে বার হলাম।

দূর থেকেই চোখে পড়ল ক্যাথে সিনেমা হল। বড় বড় করে বাড়ীর মাথায় লেখা রয়েছে CATHAY—লেখা না থাকলেও চিনতে অসুবিধা হতো না। সামনের দিকের আকৃতি খুবই পরিচিত। ছবিতে ফুল দিয়ে সাজানো অবস্থায় দেখেছি। এখন কী যেন সিনেমা চলছে, তারই অনেক ছবি ও পোস্টার। সিনেমা চলা সত্ত্বেও মুথুকৃষ্ণন কর্তৃপক্ষস্থানীয় কার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর পর্দা তুলে হলের ভিতরও ওঁরা দেখতে দিলেন।

এই ক্যাথে সিনেমা হল-এ দুটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। প্রথম ৪ঠা জুলাই, '৪৪ সালে এখানে এক বিরাট জনসভায় রাসবিহারী বসু নেতাজীর হাতে পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব তুলে দেন। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নেতাজী হিন্দুস্থানী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন তাতে জনসাধারণ অভিভূত হয়েছিলেন। এইখানে প্রথম নেতাজী ঘোষণা করলেন শীঘ্রই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হবে। এই সরকারের কাজ হবে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা। যেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে, সেদিন এই অস্থায়ী সরকারের কাজ ফুরিয়ে যাবে। তখন ভারতবর্ষের জনসাধারণ স্থির করবেন তাঁরা কী ধরনের সরকার নিজেদের জন্য চান।

এই যে ঘোষণা—ভারতের জনসাধারণ স্থির করবেন তাঁরা কী চান—একথা কিন্তু নেতাজী একাধিকবার বলেছেন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে দেওয়া ওঁর যে বিখ্যাত বেতার বক্তৃতা তাতেও উনি বলেছিলেন, মহাত্মাজী, যেদিন দেশ থেকে শত্রু অপসারিত হবে সেদিনই এই সরকারের কাজ শেষ হবে। তারপর ভারতবর্ষের জনসাধারণ নিজেরাই স্থির করবেন তাঁরা কী ধাঁচের সরকার চান, তাঁরা এও ঠিক করবেন কে তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন। উনি আরো বললেন, আমি ও আমার সহকর্মীরা নিজেদের জনসাধারণের সেবক বলে মনে করি। আমাদের একমাত্র পুরস্কার হবে দেশের স্বাধীনতা।

৪ঠা জুলাই-এর বক্তৃতায় নেতাজী অত্যন্ত বিনীতভাবে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। উনি বলেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন স্বদেশে ও প্রবাসে আমার সকল দেশবাসীকে সুখী করে আমার কর্তব্য সমাধা করতে পারি।

নেতাজী সাধারণত মুখে যা বলতেন, তা কাজে পরিণত করে দেখিয়ে দিতেন। ৪ঠা জুলাই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সম্পর্কে যে ঘোষণা করলেন, তা কার্যকর হল ২১শে অক্টোবর। আবার এই ক্যাথে সিনেমা হলেই জনসমাবেশ। ২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবের দিন। দেশের বাইরে সেদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার গঠিত হল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র নেতাজী নিজে পাঠ করলেন। তিনি সকলকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করলেন আর আহ্বান করে বললেন—In the name of God, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation and in the name of the dead heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-

sacrifice we call upon the Indian people to rally round our banner and to strike for India's freedom.

ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁর দপ্তর হল যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র, লক্ষ্মী স্বামীনাথন পেলেন মহিলা সংগঠন, আয়ার সাহেব প্রচার দপ্তর আর লেঃ কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জি অর্থ দপ্তর। এঁরা ছাড়াও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে আরো আট জন স্বাক্ষর করেছেন। প্রধান পরামর্শদাতা রাসবিহারী বসু ও অন্যান্যদের নিয়ে একুশ জনের স্বাক্ষর রয়েছে।

সেদিন ক্যাথে সিনেমা হলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভাগ্যবান। নেতাজী সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান ও সর্বাধিনায়ক রূপে শপথ গ্রহণ করলেন—"আমি সুভাষচন্দ্র বসু ঈশ্বরের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য স্বাধীনতার এই পুণ্য সংগ্রাম পরিচালনা করে যাব…"

অবশ্য এ হল আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ। উনি তো কোন্ শৈশবেই নিজেকে জন্মভূমির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিতান্ত বালক বয়সে দেশের দুঃখে বিচলিত হয়ে মাকে লিখেছিলেন—'আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মায়ের জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না ?'

সেদিন নেতাজীর শপথ গ্রহণের পর অন্যান্য মন্ত্রীরা একে একে শপথ গ্রহণ করলেন। নেতাজী নিজে শপথ গ্রহণের সময় আবেগে বাক্যরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না।

ক্যাথে হল-এর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ছিল সিনেমা দর্শনার্থীর ভিড়, মোটরগাড়ির দীর্ঘ লাইন। সবাই কত যে তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত হয়ে আনাগোনা করছে। মনে হল এরা তো জানে না আমাদের ভারতবাসীর কাছে এই বাড়ীর মর্যাদা কত।

মুথুকৃষ্ণন আর রামানুজম আমাদের আরও কয়েকটি ল্যাণ্ডমার্ক ঘুরিয়ে দেখালেন। পথে যেতে চোখে পড়ল ফারার পার্ক। এই পার্কে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। ফুজিয়ারার কথা মনে পড়ে গেল। এই সারেনডার গ্রহণ করেছিলেন ফুজিয়ারা। আজকের শান্ত পার্কের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না, যুদ্ধের উত্থান-পতনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল।

আরও একটি বাড়ী দেখলাম, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সেই বাড়ী দেখিয়ে মুথুকৃষ্ণন বললেন, এখানে ছিল রাণী ঝাঁসি বাহিনীর শিবির। মনে পড়ে গেল শ্রীলক্ষ্মী সায়গলের কাছে গল্প শুনেছি কেমন করে ইয়েলাপ্পা সাহেব প্রায় রাতারাতি বাড়ীটি যোগাড় করে দিয়েছিলেন। যদিও চব্বিশ জন মেয়ে নিয়ে রাণী ঝাঁসি রেজিমেণ্ট শুরু হয়েছিল, কয়েকদিনের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিনশো। ইয়েলাপ্পা এই বাড়িটি খুঁজে ঠিক করেন যাতে তিনশো মেয়ের এখানে থাকা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর শিবিরে ত্বশ মেয়ে ট্রেনিং নিয়েছিল। একুশে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয় আর তার পরদিনই বাইশে তারিখে নেতাজী এই শিবির উদ্বোধন করেন।

যেদিন আমরা পাদাং বা বলা যেতে পারে সিঙ্গাপুরের ময়দান দেখতে গেলাম, সেদিন আমাদের অবশ্য জায়গাটা চিনিয়ে দিতে হল না, দূর থেকে দেখেই আমরা—আরে, আরে এই তো—বলে উঠলাম। আশ্চর্য, প্রায় চার দশক আগের ছবিতে দেখা দৃশ্য একই রকম আছে। সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, ওপারে সার সার স্তম্ভওয়ালা বিরাট এক বাড়ী। সিঙ্গাপুর টাউন হলের সামনে এই ময়দানে '৪৩ সালের ৫ই জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করেছিলেন। ৫ই জুলাই তারিখটি আই. এন. এ. ডে বা আজাদ হিন্দ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমরা গাড়ী থেকে নেমে মাঠ পার হয়ে সিঙ্গাপুর টাউন হলের সিঁড়ির ওপর উঠে এলাম। এখান থেকে নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন।

'Soldiers of India's Army of Liberation, Today is the proudest day of my life. Today it has pleased Providence to give me the unique privilege and honour of announcing to the whole world that India's Army of Liberation has come into being.'

নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক উদ্দীপিত হয়েছিল। নেতাজী বলেছিলেন, "আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অন্ধকারে অথবা সূর্যালোকে, দুঃখে অথবা সুখে, লাঞ্ছনায় অথবা বিজয়োৎসবে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। আজ আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব ক্লেশদায়ক পদযাত্রা ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না।" কিন্তু জয় যে সুনিশ্চিত এ বিষয়ে ওঁর কোন সন্দেহ ছিল না। 'But if you follow me in life and in death, as I am confident you will, I shall lead you to victory and freedom'.

যদিও সবুজ মাঠ আর পটভূমিতে সার সার থামওয়ালা বিরাট বাড়ী ঠিক বিগত দিনের মতই রয়ে গিয়েছে, তবুও দৃশ্যপট কিছু পরিবর্তিত হয়েছে বৈ কি! যাদের চরণভারে এই বিস্তৃত ভূমি টলমল করত, সেই সৈন্যদল আর নেই। পড়ে রয়েছে শূন্য মাঠ।

২রা জুলাই নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবার পরই অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পর পর ঘটে যায়। ৪ঠা জুলাই ক্যাথে হলে মিটিং, ৫ই জুলাই আই. এন. এ-র আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ। ৬ই জুলাই তোজো এসে পড়লেন, এই পাদাং-এ ওঁর সম্মানে বিশেষ মিলিটারি প্যারেড হল। ৯ই জুলাই এক বিরাট জনসভা হয়ে গেল সিঙ্গাপুরে। এই সভাতেই প্রথম নেতাজী "টোটাল মোবিলাইজেশন" বা সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বান জানালেন—'I want total mobilization and nothing less'—পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য শ্লোগান হল "টোটাল মোবিলাই-জেশন ফর এ টোটাল ওয়ার।"

নেতাজী ৫ই জুলাই-এর বক্তৃতার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের আনুগত্য অধিকার করে নিয়েছিলেন। আর ৯ই জুলাই-এর সভার

বক্তৃতার পর সমগ্র প্রবাসী ভারতবাসীর হৃদয় যেন নিমেষে জয় করে নিলেন। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, পড়ি গেল কাড়াকাড়ি।' শুধু প্রাণ নয়—ধন-প্রাণ নিয়ে টোটাল মোবিলাইজেশনের ডাকে সাড়া দিলেন সকল ভারতবাসী। এক একটি পরিবারে বাবা, মা, ছেলে, ভাইবোন সকলে কোন না কোন প্রকারে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ছেলেরা যোগ দিল আজাদ হিন্দ ফৌজে, মেয়েরা রাণী ঝাঁসি রেজিমেণ্টে, ছোটরা হয়ত বালসেনাতে, আর যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কোন কারণে যোগ দিতে পারবে না তারাও সিভিলিয়ান বা অসামরিক বিভাগে বিভিন্ন কাজে লেগে পড়ল। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, এঁদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা স্বদেশ কোনদিন দেখেন নি, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না, অনেকে পরে আমাদের বলেছেন, হয়ত গান্ধীজীর ছবি একটা ছিল বাড়িতে, হয়ত ভাসাভাসাভাবে জওহরলাল নেহরুর বা সুভাষ বোসের নাম শুনেছিলেন ওঁরা। কিন্তু নেতাজী এসে ডাক দেবার পর ওঁদের জীবনধারা আমূল পাল্টে গেল।

এই ধরনের শত শত পরিবার ছিল তখন, এখনো নিশ্চয় তাঁরা ছড়িয়ে আছেন বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের সিঙ্গাপুরের বন্ধুদের মধ্যে মুথুকৃষ্ণন, রাজানুজম, জন জেকব বা মিসেস চিদাম্বরম্ সকলেই তো এই রকম পরিবার থেকেই এসেছেন। তবুও শ্রীমতী বীণা চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হল, এই তো একটি টাইপ পরিবারের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

শ্রীমতী চ্যাটার্জির বাড়ীতে আমরা যেদিন গেলাম উনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, নানা রকম ছবি কাগজপত্র ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে প্রোজেক্টর দাঁড় করানো। যুদ্ধের দিনগুলিতে সিঙ্গাপুরের কর্মব্যস্ত জীবনের অনেক দলিলপত্র উনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। আমাদের সে সব দেখালেন। স্লাইডে ছবিও দেখলাম। সে সময়ের খবরের কাগজের চমৎকার কালেকশন্, আরো নানা রকম ইস্তাহার ও ম্যাগাজিনও জমিয়ে রেখেছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর অ্যাংলো-আমেরিকান অকুপেশনের সময় কী করে এইসব অমূল্য জিনিস বাঁচাতে পারলেন, ওঁকে জিজ্ঞেস

করলাম। উনি বললেন, সে যে কত কষ্ট করে, কত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে করেছি কী বলব। এইসব জিনিসপত্র বুঝতেই পারছেন, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব উদ্দীপনাময় দিনগুলিতে শ্রীমতী বীণার দেওর বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে। বীরেন্দ্রনাথ যুদ্ধের সময় বর্মা ফ্রন্টে চিনডুইন নদীতে প্রাণ হারান। ওঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য চ্যাটার্জি ছিলেন রাণী ঝাঁসি বাহিনীর সৈনিক। আর এক আত্মীয়া শোভা চ্যাটার্জি ছিলেন নারী বাহিনীতে। শ্রীমতী বীণার তখন তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে, বিশেষত কোলের ছেলে সুধীর নিতান্ত শিশু। নেতাজী বললেন, তোমার প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যাবার দরকার নেই, করতে চাইলে অনেক কাজ করার আছে। স্বামী অবনীনাথ চ্যাটার্জি ও বীণা দু'জনেই অসামরিক দিকের নানা কাজের ভার নিলেন। ঘরে বৃদ্ধা শাশুড়ি ও ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করেও পরম উৎসাহে বাইরের কাজ করতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহীদের দেখাশুনো করা, যুদ্ধ ফাণ্ডে টাকা তোলার জন্য নানান সংগঠন, কাজের অভাব কী। সে সব কাজকর্মের ছবি আমরা দেখলাম।

আমরা কলকাতা ফিরে আসার কিছুকাল পরে শ্রীমতী বীণা ছেলে সুধীর ও মেয়ে মীরাকে নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন। সেই সময় ওঁর এতদিন ধরে জমিয়ে রাখা প্রাণাধিক প্রিয় সব দলিলপত্র উনি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে দান করে গেলেন। এক সময় ওঁরা সপরিবারে দেশের কাজে নেমেছিলেন, আজ অন্য এক ধরনের দেশসেবা করে গেলেন। ছোট একটি অনুষ্ঠানে এইসব জিনিস নেতাজী ভবনে দিয়ে উনি বললেন, "একদিন আমাদের উত্তর পুরুষ এইসব দেখে জানতে পারবে সেদিনের কথা, জানবে নেতাজী আমাদের জীবনে কতখানি ছিলেন, তাই তো নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছি এইসব জিনিস এতকাল। আজ আমি ভারমুক্ত হলাম।" প্রসঙ্গত সুধীর ও মীরা এই প্রথম তাদের স্বদেশ দেখল।

॥ ২৪ ॥

সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর ছিল চ্যান্সারি (Chancery) লেনে। চ্যান্সারি লেনের বাড়িটি এখনো রয়েছে। একদিন বিকেলে আমরা রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করে বেড়ালাম। একটু উঁচু অঞ্চলে সুন্দর পরিবেশে এই বাড়ি। কিন্তু নেতাজীর বাসভবন ছিল মায়ারস রোডে। যেদিন মায়ারস রোডের বাড়িটি দেখতে গেলাম, সেদিন কী জানি কেন খুব অভিভূত হয়েছিলাম। বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হল এই যেন এখানে সব লোকজন ছিল, একটু ক্ষণের জন্য সবাই হয়ত কোথায় গেছে। এখনি হয়ত দেখা যাবে আবিদ হাসান বা আয়ার কেউ দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন।

গাড়ি এসে থামল এক জমকালো লোহার কারুকাজ করা ফটকের সামনে। ফটক থেকে দীর্ঘ রাস্তা লনের পাশ দিয়ে চলে গেছে বাড়ির গাড়ি-বারান্দা অবধি। চমৎকার দোতলা বাড়ি, বেশ বড়, প্রাসাদোপম বললে ভুল হয় না। নির্জন রাস্তার ওপর নিস্তব্ধ বাড়ি। চট করে মনে পড়ে যায় ইংরেজ কবির সুপরিচিত কবিতা। বাড়ির দরজায় নক করে পথিক হাঁক দিচ্ছে—Is there anybody there? ওপারে নিরুত্তর। তবুও পথিকের মনে সংশয়, এ বাড়ি একেবারে জনমানব শূন্য নয়, কেমন যেন অপার্থিব এই নীরবতা।

আমাদের সঙ্গীরা নেমে গেটের কাছে হাঁকডাক করতে লাগলেন। কিন্তু দরোয়ান বা মালী কেউ তো বেরিয়ে এল না। শুনেছিলাম, এক চীনা পরিবার কিনে নিয়েছে এই বাড়ি। দেখেশুনে মনে হয়, বাড়িটি রেখেছে সযত্নে। কিন্তু লোকজন সব গেল কোথায়! গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সঙ্গীরা ইতস্তত করতে লাগলেন। মুথুকৃষ্ণন বললে, বিনা অনুমতিতে ঢুকব, শেষে

যদি ট্রেস্‌পাসের দায়ে ধরে। অত চিন্তা করলে কি চলে? আমার মেড ইন রেড চায়না লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলাম। পিছন পিছন—আরে, আরে কী করো, কুকুর থাকতে পারে—বলতে বলতে সঙ্গীরাও ঢুকে পড়লেন।

বাগান বা লন খুব একটা যত্নে নেই। মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে শাড়িতে চোরকাঁটা বিঁধে গেল প্রচুর। অনেকখানি জমি নিয়ে বাড়ি। বাগানের একপাশে পাথরের তৈরী চায়ের টেবিল, চারপাশে পাথরের চেয়ার। যখন ব্যাডমিন্টন খেলা হতো বিকেলে, তখন কে জানে হয়ত এখানে বসে চা খাওয়া হতো। বাগান দিয়ে হেঁটে যেতে চোখের সামনে বাড়িটা যেন ধীরে ধীরে বিরাট হয়ে উঠল। এত বড় বাড়ি। মনে পড়ে গেল, বার্লিনে সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িও ছিল খুব বড়। নাম্বিয়ার বলেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে নেতাজী ছিলেন খুবই সাদাসিধে, উনি ঐ অত বড় বাড়ির মাত্র দু'খানা ঘর ব্যবহার করতেন। কিন্তু জার্মান গভর্নমেণ্ট বাড়ি দিচ্ছে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রধানকে, সে বাড়ি অবশ্যই যথাযোগ্য হতে হবে। এখানে ভারতবর্ষের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। এ বিষয়ে উনি সচেতন ছিলেন। সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়ি আমাদের দেখা হয়নি। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে সেই বাড়ি। সিঙ্গাপুরের বাড়ি যা হোক দেখতে পেলাম।

এই বাড়িতেও নেতাজীর নিজের শোবার ঘর আর স্টাডি ছিল খুবই সাধারণ। আয়ার বলতেন, স্টাডিতে ছিল একটা টেবিল আর চেয়ার আর একপাশে একটা আলমারি। ঘরটিও ছিল ছোট, টেবিলটাও ছোট। আয়ার বা আর কেউ যখন কাজ করতেন, খান দুই বাড়তি অফিস-চেয়ার থাকত। এই স্টাডিতে বসেই নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন।

সে-সময় সিঙ্গাপুরের বাড়ি লোকজনের আনাগোনায় সদা ব্যস্ত। স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার গঠিত হতে চলেছে। মন্ত্রীসভায় কারা স্থান পাবেন, সেইসব নাম নিয়েও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আয়ার বলেছিলেন নেতাজীকে, আপনি কি সত্যিই মন্ত্রীসভা গঠন করবেন? আপনার সমকক্ষ

দূরে থাক, আপনার সঙ্গে এক মন্ত্রীসভায় কাজ করতে পারেন এমন লোক এখানে কোথায় পাবেন! কথাটা নেতাজীর পছন্দ হয়নি। মন্ত্রিসভা তো করতেই হবে। নেতাজী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে সকলের কাছ থেকেই উঁচু মানের কাজ আদায় করে নেওয়া শক্ত নয়।

সে সময়ে প্রায়দিনই রাত এগারোটা নাগাদ নেতাজী আয়ার সাহেবের সঙ্গে কাজে বসতেন। ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের Proclamation বা ঘোষণা হয়েছিল। তার দিন তিনেক আগে অর্থাৎ ১৮ই তারিখে রাত্রে দোতলার বারান্দায় বসে নেতাজী আয়ারের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। পরদিন উনি Proclamation লিখবেন এবং সেজন্য আয়ারকে উপস্থিত থাকতেও বললেন। 'এক মিনিটও শান্তভাবে চিন্তা করার সময় পাচ্ছি না অথচ Proclamation লিখতে হবে, একটা স্টেটমেণ্টও করতে হবে, কাল যা হোক করে বসতেই হবে'—আয়ারকে বললেন।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর সন্ধ্যা ছ'টায় বারান্দায় বসে খানিক কথাবার্তা বললেন। কিন্তু কাজ শুরু করা গেল না। বহুলোকের সঙ্গে সেদিন ইণ্টারভিউ রয়েছে, দু' মিনিট থেকে দশ মিনিট এক একজনের সময়। তবুও সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে আয়ারের সঙ্গে কথা বললেন। নেতাজীর ইংরেজ জীবনীকার বলেছেন, ওঁর নাকি সেন্স অব হিউমার ছিল না। অথচ দিলীপকুমার রায় থেকে শুরু করে আয়ার পর্যন্ত সকলে ঠিক উলটো কথা বলেন। ওঁর কৌতুকবোধ ছিল অসাধারণ। সেই রাত্রে ওরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে আলোচনার মধ্যেও ওঁর কৌতুক করার স্বভাব যায় না। আইরিশ Proclamation নিয়ে কথা হচ্ছিল। বললেন, জানো তো আইরিশ ঘোষণাপত্রে যারা স্বাক্ষর করেছিল তারা শট ডেড্ হয়েছিল। আজাদ হিন্দের ঘোষণাপত্রে যারা সই দেবে, তাদের কপালেও তাই আছে —বলেই হা-হা করে হাসি।

একতলায় ছিল খাবার ঘর। এক ফাঁকে রাত ন'টা নাগাদ ডিনার খেয়ে নিলেন। সেদিন বাইরের অতিথি কেউ নেই। সাধারণত নেতাজী ডিনারটা

আনন্দ করে খেতেন। গল্প করতে করতে খাওয়া-দাওয়া চলত। যে পদটা ভাল লাগত হয়ত দু'বার চেয়ে নিতেন। সে রাত্রে আয়ার লক্ষ্য করলেন, অন্যমনস্কভাবে খাওয়া শেষ করলেন।

আয়ার তো সেই কখন থেকে টাইপ রাইটার খুলে বসে আছেন, ডাক আর আসে না। রাত বারোটা, আয়ার প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডাক এল। নেতাজী স্টাডিতে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, দিনের শেষ ভিজিটর তার দু' মিনিটের ইণ্টারভিউ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর কেউ নন, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, জয় হিন্দ বলে বেরিয়ে গেলেন।

নেতাজী একটা পেন্সিল আর এক তাড়া কাগজ নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চলল একটানা লেখা। এক পাতা লেখা হয় আর আবিদ আর স্বামী পালা করে লেখা কাগজ পাশের ঘরে আয়ারের কাছে পৌঁছান। নেতাজী আর মুখ তুললেন না, এমন কি আগের পাতায় কী লেখেছেন একবারও জানতে চাইলেন না। মাঝে মাঝে ব্ল্যাক-কফিতে চুমুক দেন শুধু। কাজ যখন শেষ হল, ভোর হয়ে এসেছে। আয়ার পুরো টাইপকরা কপিটা দেখালেন একবার। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে শুতে চললেন নেতাজী। স্বাক্ষরকারীদের নাম ছাড়া আর সব তৈরী। নেতাজী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি, নামগুলো জানতে চাও? আয়ার বললেন, নো স্যর।

পরদিন ২০শে অক্টোবর, বাড়িতে আরো ভিড়। সেদিন ডাইনিং রুমেও অতিথি ছিলেন। তবু সব কিছু তাড়াতাড়ি সেরে নেতাজী স্টাডিতে এলেন। আয়ার দেখলেন কাল যে টাইপ করা কপি রেখে গেছেন তার একটি কমা, ফুলস্টপও পালটান নি নেতাজী। ঐরকম একটা ঐতিহাসিক দলিল একবারে বসে লিখে গেলেন, একটু রিভাইস করারও প্রয়োজন হল না! আয়ারের হাতে এবার স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকা তুলে দিলেন শুধু।

গাড়ি-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ক্যামেরা ফোকাস করলাম, বাড়ির ছবি তুলব একটা। হঠাৎ-ই কী এক মন্ত্রবলে বাড়িটা যেন জেগে উঠল। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল হাসি, মানুষের কথাবার্তা। সিঁড়ি

দিয়ে ধুপধাপ করে কারা নেমে আসছে। সামনের দরজাটা খুলে গেল দড়াম করে। আর এক চীনা ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, ছেলেমেয়ে সোজা যেন আমার ক্যামেরার লেন্সে এসে পড়লেন। ক্যামেরা বন্ধ করে এগিয়ে এলাম। ওরা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, বহুদিন আগে আমাদের পরিচিত একজন এই বাড়িতে বসবাস করতেন, তাই আমরা দেখতে এসেছি। আমরা কি একটু ঘুরে দেখতে পারি? ওঁরা থতমত ভাবটা একটু সামলে নিলেন, চীনা ভদ্রলোকটি বললেন—ওঃ ইয়েস, প্লীজ গো এহেড! গাড়ি-বারান্দার অন্যপাশে একটা গাড়ি পার্ক করা ছিল। এঁরা সেই গাড়িতে উঠে হুস করে চলে গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ আগের মতই নিঃঝুম হয়ে গেল সারা বাড়ি।

আজাদ হিন্দ আন্দোলনের শুরু ও শেষ এই দুই পর্বের সঙ্গেই নেতাজীর সিঙ্গাপুরের বাড়ি জড়িয়ে আছে। আমরা বাগানটা ঘুরে পিছনে যেতে দোতলার সেই টানা বারান্দার দেখা পেলাম। এই বারান্দায় যুদ্ধের শেষ ক'দিন একটানা ক্যাবিনেট বৈঠক করেছিলেন নেতাজী। বারান্দায় দাঁড়ালে পিছনের লন ও তারপর সমুদ্র চোখে পড়ে। রামানুজম, মুথুকৃষ্ণন প্রভৃতি সিঙ্গাপুরের সকলেই বললেন, সমুদ্র এখন একটু দূরে সরে গেছে। আগে বাড়ির আরো কাছে ছিল।

জাপান আত্মসমর্পণ করবে একথা নেতাজী শুনলেন সেরানবানে বসে। পরদিন অর্থাৎ ১২ই আগস্ট নেতাজী গাড়িতে সিঙ্গাপুর রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন আয়ার। আর একটি গাড়িতে মেজর আলাগাপ্পান, এনায়েত কিয়ানি, কর্নেল নাগর এঁরা সব এলেন। সন্ধ্যা সাতটার পর সকলে এসে পৌঁছলেন। একটু মুখ-হাত ধুয়ে সেই যে দোতলার বারান্দায় বসা হল সেই কনফারেন্স চলল ১৬ তারিখ ভোর অবধি। জমান কিয়ানি আর হবিবুর রহমান যোগ দিলেন, তাদের ডেকে পাঠানো হল।

সারারাত কফি খেতে খেতে এই বারান্দায় বসে সারেণ্ডার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নেতাজী সব চাইতে ব্যস্ত হয়েছিলেন রানী ঝাঁসি রেজিমেণ্টের মেয়েদের জন্য। সিঙ্গাপুরে তখনো প্রায় পাঁচ শো মেয়ে রয়েছে;

তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার বা অন্য নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর নেতাজী চিন্তা করছিলেন টোকিও ক্যাডেটদের জন্য। পঁয়তাল্লিশ জন নেহাতই অল্পবয়সী ছেলে আটকে পড়বে টোকিওতে। নেতাজী তো রানী ঝাঁসি বাহিনী আর টোকিও ক্যাডেটদের কথা ভাবছেন আর বাকি সকলে ভাবছে নেতাজীর কথা। উনি কি করবেন? উনি কি সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশদের হাতে ধরা দেবেন, না উনি অন্য কোথাও আত্ম-গোপন করবেন। পরদিন ১৩ তারিখও সারা দিন সারা রাত আলোচনা চলল। নেতাজী বলছিলেন, উনি ওঁর মন্ত্রীসভার সদস্য ও অন্যান্য মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে সিঙ্গাপুরেই থাকবেন। ওঁর সহকর্মীরা চান না নেতাজী ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন। তবুও প্রথমে মনে হল নেতাজীর ইচ্ছাই বোধহয় মেনে নিতে হবে।

১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যায় খানিকক্ষণ মন্ত্রীসভার অধিবেশন মুলতুবী রেখে নেতাজী রানী ঝাঁসি মেয়েদের অভিনয় দেখতে গেলেন। অভিনয় চলার সময়ে ব্যাংকক থেকে এ. এন. সরকার এসে উপস্থিত হলেন। থিয়েটর দেখতে দেখতেও নেতাজী সরকারের সঙ্গে কীসব পরামর্শ করছিলেন। সেদিন রাত্রে সরকারও যোগ দিলেন ওঁদের বারান্দার কনফারেন্স-এ। সরকার সাহেব আজাদ হিন্দ মন্ত্রীসভার বর্ষীয়ান সদস্য। ওঁর সম্পর্কে গল্প আছে, কখনো-সখনো ক্যাবিনেট মিটিং চলার সময় ওঁর তন্দ্রা এসে যেত। নেতাজী তখন হেসে বলতেন—আর কত ঘুমোবেন, দু'শ বছর তো ঘুমোলেন, এবার একটু জেগে উঠুন। তবে ১৪ই আগষ্ট সারা রাত ও তার পরদিন নন-স্টপ মিটিং চলার সময়ে কারুর আর চোখের পাতা এক করার উপায় ছিল না। মিঃ সরকার এসে পৌঁছবার পর নেতাজী সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। ঠিক হল নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাবেন। ওঁর অনুপস্থিতিতে এখানে ভার নেবেন মহম্মদ জমান কিয়ানি। মেজর আলাগাপ্পানও থাকবেন সিঙ্গাপুরে। ১৫ই আগষ্ট জাপানের আত্মসমর্পণের খবর সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল। সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত তিনটে সিঙ্গাপুরের বাড়ির দোতলার বারান্দায় বৈঠক চলল।

১৫ই সকালে নেতাজী বারান্দাতে বসেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছিলেন, তখন কর্নেল স্ট্রেসি এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। স্ট্রেসি ছিলেন একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার, খুব স্মার্ট ও চটপটে। স্ট্রেসির হাতে কিছু ডিজাইন আঁকা কাগজপত্র আর কয়েকটি মডেল। ব্যাপারটা হল এই। নেতাজী ঠিক করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর মৃত শহীদদের উদ্দেশে এক স্মৃতিস্তম্ভ করবেন। সেই মত সমুদ্রতীরে জায়গা পছন্দ করলেন নেতাজী। সিটি স্কোয়ার থেকে খুব দূরে নয়। নেতাজী স্বয়ং জুলাই মাসে সেখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। নানারকম মডেল ও ডিজাইন তৈরির নির্দেশ দেওয়া হল। কর্নেল স্ট্রেসি সেইসব হাতে করে এসেছেন আজ। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন ট্রাজিক মনে হচ্ছে। কারণ সেদিনই যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘোষণা করা হয়েছে। দেরী হয়ে যায়নি কি খুব ? যেকোন মুহূর্তে ল্যাণ্ড করবে অ্যাংলো-আমেরিকান ফোর্স।

নেতাজী জিজ্ঞাসা করলেন স্ট্রেসিকে—অ্যাংলো-আমেরিকানরা এসে পৌছবার আগে এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা সম্ভব হবে তো ? স্ট্রেসি জবাবে বললেন—সার্টেনলি, স্যার। নেতাজী কাগজপত্র দেখে দিলেন। 'জয় হিন্দ' বলে স্ট্রেসি যখন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, অন্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। এটা কী করে সম্ভব হবে ? এত তাড়াতাড়ি সাধারণ অবস্থাতেই একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা সহজ নয়। আর এ তো অস্বাভাবিক অবস্থা ! মাল-মশলা যোগাড় হবে কোথা থেকে ? মিস্ত্রিই বা পাবে কোথায় ! কিন্তু কর্নেল স্ট্রেসি যে কথা দিয়েছেন নেতাজীকে !

অমানুষিক পরিশ্রম করে স্ট্রেসি সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে সৃষ্টি করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ—তার গায়ে লেখা ইত্তেফাক, ইতমাদ, কুরবানী—একতা, বিশ্বাস, বলিদান। এই স্মৃতিস্তম্ভের ভাগ্যে পরে যা ঘটল তা সামরিক ইতিহাসে অভাবনীয়। সাধারণত যুদ্ধে মৃত বা ওয়ার ডেড-এর প্রতি কখনো অসম্মান করে না শত্রুপক্ষ। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর বাহিনী সিঙ্গাপুরে পা দিয়েই প্রথম কর্তব্য হিসেবে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এই স্মৃতিস্তম্ভ। তাই সিঙ্গাপুরের বাড়ির বারান্দায় স্ট্রেসি

ও নেতাজীর সেই শেষ কথোপকথন খুব বেদনার সঙ্গে মনে করে রেখেছেন অন্যান্যরা।

এরপরই আমাদের সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা দেখাতে নিয়ে গেলেন সমুদ্রতীরের সেই জায়গা। নেতাজীর সিঙ্গাপুরের বাসভবনে দাঁড়িয়ে আমাদের কেবলই মনে হল, স্মৃতিস্তম্ভ তো ধ্বংস করা হয়ে গেছে কিন্তু কোন মতে এই বাড়িটি কি আমরা সংরক্ষণ করতে পারতাম না। শুনলাম কর্নেল থিভি একবার প্রস্তাব করেছিলেন, এই বাড়িটি কিনে নিয়ে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় দূতাবাস করা হোক। তা হলে বাড়িটি ভারতবর্ষেরই থাকে। দূতাবাসের প্রস্তাব মুখে মুখে ঘুরেছিল কিছুকাল। এই প্রস্তাবে সিঙ্গাপুরের আপত্তি হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের তরফেই বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আজ তাই সিঙ্গাপুরে থেকেও অনেক ভারতবাসী জানেন না এই বাড়ির অস্তিত্বের কথা। আমাদের মত বাতিকগ্রস্ত যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁদেরও অনেক খুঁজেপেতে বার করতে হয় এই বাড়ি।

এই বাড়ি থেকেই ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৫-এর ভোরবেলা নেতাজী সদলবলে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলেন। সেখান থেকে ব্যাংককের প্লেন ধরবেন। যাত্রা খুব শুভ হয়নি। প্লেন বার কতক ট্যাক্সি করে থেমে গেল। ব্রেকের গোলমাল। আধঘন্টা লাগল সব সারিয়ে আবার রওনা হতে। বোমারু বিমান আকাশে উড়বার সময় এক-একটা ঝাঁকুনি লাগছে আর আয়ার সাহেবের জামাকাপড় ট্যাংক থেকে পেট্রল ছিটকে ছিটকে ভিজে যাচ্ছে। ইণ্টারপ্রিটার নিগেশি পাইলটের সঙ্গে কথা বললেন, তারপর নিজেই পেট্রল ট্যাংক থেকে বার হওয়া একটা পাইপের আলগা স্ক্রু টাইট করলেন। সিঙ্গাপুরের বাসভবন থেকে এই যাত্রাকে নেতাজী নিজেই বলেছিলেন—'adventure into the unknown'।

॥ ২৫ ॥

'এই সেই জায়গা'—ওঁরা দেখিয়ে দিলেন। আমরা সকলে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এক পাশে একটা নাম-না-জানা গাছ। জায়গাটি সিটি স্কোয়ার বা পাদাং থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু সঙ্গে সিঙ্গাপুরের পুরনো অধিবাসীরা না থাকলে দীর্ঘ তটভূমিতে একটি নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না। কোন-ভাবে চিহ্নিত করে না রাখলে অদূর ভবিষ্যতে সঠিক জায়গাটি আর কেউ নির্দেশ করতে পারবেন না।

সমুদ্রতীরের এই জায়গাটিতে, এই বিশেষ গাছটির একপাশে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা স্মৃতিস্তম্ভ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-ছিল একদিন। কর্নেল স্ট্রেসি এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন, জুলাই মাসে নেতাজী এর ভিত্তি স্থাপন করলেন। জাপানের সারেনডারের দিনে ১৫ই আগষ্ট নেতাজী মডেল বাছাই করে দিয়ে স্ট্রেসিকে বললেন, শত্রুসৈন্য ল্যান্ড করার আগে কাজ শেষ হবে তো? স্ট্রেসি বলেছিলেন, সার্টেনলি স্যার। স্ট্রেসি তার কথা রেখেছিলেন।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ও তার বাহিনী সিঙ্গাপুরে পা দেবার পর প্রথমেই সিদ্ধান্ত করলে, দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে ব্রিটিশ সৈন্যরা ডিনামাইট দিয়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ উড়িয়ে দিল। এই রকম একটা 'গৌরবজনক' কাজ পাছে পৃথিবী ভুলে যায়, তাই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ডকুমেণ্টারি ছবিতে দৃশ্যটি তুলে রাখলেন। আজও এই ডকুমেণ্টারি ছবি সরকারী আর্কাইভস্-এ রয়েছে। পরবর্তীকালে নেতাজীর ওপর ডকুমেণ্টারি ছবি তৈরীর সময় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কোন কোন সদস্যের এই দৃশ্য দেখবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল।

ফিলমে দেখা যায়, স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারের পোশাক-পরা একজন ডিনামাইটে অগ্নিসংযোগ করছে, একদল ব্রিটিশ টমি এবং জনকতক ভারতীয় হাততালি দিচ্ছে। সেই ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া শহীদস্তম্ভের টুকরো গোপনে কোন কোন সিঙ্গাপুরবাসী সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তারই একটি টুকরো কলকাতার নেতাজী মিউজিয়ামে ঠাঁই পেয়েছে। এই টুকরোটি ছিল সিঙ্গাপুরের শ্রীমতী বীণা চ্যাটার্জির সংগ্রহে।

এই ডিনামাইট করার ঘটনাটি সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক কাহিনী সিঙ্গাপুরে শুনলাম। কথাটা বেশ কয়েকজনের কাছেই শোনা গেল। তবে কুয়ালালামপুরে আমেরিখ সিং-এর কাছে যেমন শুনেছি সেটাই বলি। আমেরিখ বললেন—'এই শহীদ স্তম্ভ ধ্বংস করার ঘটনাটি আই. এন. এ-র প্রতিটি সৈনিকের মনে কী রকম ঘা দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পারো। আজও তারা ক্ষমা করতে পারেনি ব্রিটিশদের। ওরা ভাবতেই পারেনি যে, মৃতের প্রতি এই অসম্মান কারো পক্ষে করা সম্ভব। যখন ডিনামাইটে আগুন দেওয়া হচ্ছে আর ওরা উপহাস করছে ও হাততালি দিচ্ছে, তখন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে একদল আই. এন. এ'র সৈনিক দুঃখে ও অপমানে চোখের জল ফেলছিল। যখন একটা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে গেল, সেইসব সৈনিকের একজন কাঁদতে কাঁদতে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল—'অল রাইট্ মাউন্টব্যাটেন, আজ তুমি আমাদের মেমোরিয়াল উড়িয়ে দিলে, একদিন তুমিও এই রকম উড়ে যাবে।' আজ লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর নেই, আমরা মৃতের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাই না। তবুও বলছি যেদিন খবর কাগজ খুলে মাউন্টব্যাটেনের মৃত্যুর খবর পড়লাম এবং যেভাবে ওঁর মৃত্যু হয়েছে—নৌকোয় বিস্ফোরণের ফলে উনি প্রাণ হারিয়েছেন দেখলাম—অমনি আমার সেই সৈনিকের চোখের জলের মধ্যে বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল। শুধু আমারই নয়, আই. এন. এ'র যাঁরাই এই ঘটনার কথা জানতেন তাঁরা সকলেই বলেছেন সেদিন খবর কাগজ খুলেই মাউন্টব্যাটেনের খবর দেখে ওঁদের বিদ্যুৎ চমকের মত বহুদিন আগের সেই কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

সমুদ্রতীরে আজ আর দেখবার কিছু নেই। এই স্মৃতিস্তম্ভের জায়গাটির যত কাছে সমুদ্র তখন ছিল এখন আর তত কাছে নেই। সমুদ্র দূরে সরে গিয়েছে একটু। সিঙ্গাপুরবাসী ভারতীয়রা অনেক বলছিলেন ওঁদের একান্ত ইচ্ছা, ঠিক ঐ জায়গায় আবার একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে দেওয়া। কিন্তু এখন সিঙ্গাপুর ও ভারতবর্ষের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে কথাবার্তা না হলে এ রকম কোন কাজ হওয়ার আশা নেই। এই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিরূপ আছে কলকাতায় নেতাজী ভবনের প্রবেশ পথে আর রেড রোডের ধারে ময়দানে; আপাতত আমাদের তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সিঙ্গাপুর ছেড়ে আসার আগে দু-একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ হল। একদিন সিঙ্গাপুরবাসী অনেক বাঙালীর সঙ্গে মস্ত বড় ডিনার। সিঙ্গাপুরে এত বাঙালী আছেন ধারণা ছিল না। অনেকে দেখলাম অল্পবয়সী দম্পতি, একটি বা দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসবাস করছেন। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চ পদে কাজ করছেন এঁরা। নিজেদের মধ্যে সুন্দর মেলামেশার পরিবেশ আছে। তবে এঁরা বেশির ভাগ এসেছেন সাম্প্রতিককালে, সিঙ্গাপুরের অতীত গৌরবকাহিনী এঁদের কাছে শুধুই কাহিনী। আর একদিন জন জেকবের বাড়ি লাঞ্চ। অনেকের ফুল সাজানো 'হবি' থাকে। মিসেস জেকবের 'হবি' হল সব্জি কেটে কেটে নানান ডেকোরেশন করা। টমাটোর গোলাপফুল, গাজরের ক্রিসেন-থিমাম, পেঁয়াজের পদ্ম ফুল, আনারসের ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া হল। মিসেস জেকব একখানা বই লিখে ফেলেছেন এ বিষয় নিয়ে, তার নাম—দি আর্ট অব ভেজিটেবল কার্ভিং। খেতে খেতে কথা হল যে, সিঙ্গাপুর দেখা আমার ভাগ্যে নেই মনে হয়েছিল, মিসেস জেকবের প্রার্থনার গুণে সেই সিঙ্গাপুর আমার খুব ভাল ভাবে দেখা হয়ে গেল। কাল আমরা চলে যাব কুয়ালালামপুর।

সিঙ্গাপুর থেকে কুয়ালালামপুর কেন যে আমরা এরোপ্লেনে এলাম নিজেরাই ঠিক বুঝলাম না। কারণ মোটর গাড়িতেও সহজেই যাওয়া যেত। রামকৃষ্ণ মিশনে দেখতাম, স্বামিজীরা কেউ হয়ত লাঞ্চের পর কুয়ালালামপুর

গেলেন আবার ডিনারের আগেই ফিরে এসে পড়লেন। আমার হুইল-চেয়ার জীবন শুরু হবার পর সাধারণভাবে এরোপ্লেন ও এয়ারপোর্ট সম্পর্কে একটা ভীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের করিডর কেন যে এত অতিরিক্ত দীর্ঘ, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনস-এর বিমান আকাশে উড়তে না উড়তেই কুয়ালালামপুরে নেমে পড়ল। হুইল-চেয়ারে চেপে কুয়ালালামপুর নেমে সত্যিই বড় লজ্জিত বোধ করছিলাম। এখানে যাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নেতাজীর ফাইটিং উইমেন, রানী ঝাঁসি বাহিনীর বীরাঙ্গনা। এঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন জানকী থেভার্স, রানী ঝাঁসি রেজিমেণ্টের একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে ওঁর সুনাম আছে। জানকী দু' পা এগিয়ে এসে 'দিদি' বলে জড়িয়ে ধরা মাত্র সব আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল। মনে হল, এঁরা পরকে আপন করার মন্ত্র নেতাজীর কাছে শিখে নিয়েছেন। কুয়ালালামপুরে বেশ অসুস্থ অবস্থায় কাটল কয়েকদিন। কিন্তু জানকী, মিসেস গুরুপথম্, মিসেস আমেরিথ সিং, মিসেস নাইডু, মিসেস ঘোষ—সকলে এমন সেবা, শুশ্রূষা আর আদর-যত্নে ঘিরে রাখলেন যে, প্রবাসে নির্বান্ধব বা অসহায় বলে মনে হল না এক মুহূর্তের জন্যও।

জানকীর ময়লা রঙে ভারী সুন্দর মুখশ্রী। বয়স হয়েছে কিন্তু এখনো খুব স্মার্ট আর কর্মপটু। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল দেখিয়ে বলল—'এই চুল কবে কেটে ফেলেছিলাম জানো? সেই যখন নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লেখালাম তখন। তারপর থেকে আর চুল রাখিনি।'

জানকীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার কাহিনীও বেশ নাটকীয়।—'একদিন শুনলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জনসভায় বক্তৃতা করবেন। অমনি একটা সাইকেলে চেপে মিটিং দেখতে চলে গেলাম। বাড়িতে বাবা-মাকে এসব কথা আর জানালাম না। সেদিনের মিটিং-এ নেতাজীর বক্তৃতা শুনে একেবারে সম্মোহিতের মত হয়ে গেলাম। সভাশেষে যার যা আছে,

আজাদ হিন্দ ফাণ্ডে দেবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমিও এগিয়ে গেলাম, কানের দুল আর হাতের চুড়ি খুলে দিয়ে দিলাম। মা'র কাছে বকুনি খাব কি না সেকথা মনেই এল না। সেদিনই মেয়েদের রেজিমেণ্টে নাম লেখালাম। তারপরই শুরু হল সিঙ্গাপুরের রানী ঝাঁসি শিবিরে আমাদের কঠোর ট্রেনিং।'

কুয়ালালামপুরে এসে দুটি বিষয়ে আমরা অবহিত হলাম। এক, এখানে আজও নেতাজীর স্পিরিট খুব জীবন্ত। সিঙ্গাপুরে যাঁরা পুরনো ভারতীয় অধিবাসী, তাঁরা কেমন যেন মনমরা হয়ে আছেন। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের অবশ্যই কম নেই। এমন কি অনেক কিছু করার ইচ্ছাও আছে। যেমন যদি সমুদ্রতীরে আই. এন. এ. মেমোরিয়াল আবার তৈরি করা যায়, যদি নেতাজীর বাসভবনটি কোনমতে ভারতীয় গভর্নমেণ্টের অধিকারে আনা সম্ভব হয়— ইত্যাদি। কিন্তু সংগঠিত ভাবে কিছু করতে পারবেন মনে হয় না। সিঙ্গাপুর সরকার কী মনে করবেন—বর্তমান চীনা অধিবাসীরা এটা কী চোখে দেখবে, এইসব ভেবে দ্বিধা ও সংশয়ে রয়েছেন। অপরদিকে কুয়ালালামপুরে মালয়ী ভারতীয়রা দাপটের সঙ্গে বর্তমান জন-জীবনে এবং সরকারে অংশ গ্রহণ করছেন, আর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে খুবই সচেতন ও গর্বিত। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের মনে এল তা হল, কুয়ালালামপুরের সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক যে কত গভীর ছিল তা আমাদের যেন ঠিক জানা ছিল না। সিঙ্গাপুরে কবে কী হল না হল সে সব কথা যত শুনেছি, কুয়ালালামপুরের কথা তত শুনিনি। অথচ নেতাজী বারবার এখানে এসেছেন, বক্তৃতা করেছেন, মেন এবং মানি রিক্রুট করেছেন। সৈন্যবল এবং অর্থবল দুই-ই কুয়ালালামপুর দু'হাত ভরে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে দিয়েছে।

আমাদের একটা রাবার প্ল্যাণ্টেশন্ দেখবার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। এই রাবার উৎপাদন শিল্পে বহু নারী শ্রমিক কাজ করছেন দেখা গেল। এঁরা এসেছেন খুবই সাধারণ ঘর থেকে। এঁদের দেখিয়ে ওখানকার লোকেরা বললেন, এইসব মেয়েদের মা-মাসিরা একদিন দলে দলে নাম লিখিয়েছিলেন

রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টে। নেতাজীর আহ্বান যে শুধু শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল তা নয়। আজকাল আমরা যাকে গ্রাসরুট বলি, সেখানেও পৌঁছেছিল। এত গভীরে শিকড় গেড়েছিল বলে আজও ওঁদের নেতাজীর প্রতি বিশ্বাসের ভিত এত শক্ত।

কুয়ালালামপুরে যে অঞ্চলে আমরা রইলাম, তার নাম পেতালিং জয়া আর যে হোটেলে ছিলাম তার নাম জয়াপুরী। বেশ রোমান্টিক নাম মনে হল। সদলবলে পৌঁছে আমরা দেখলাম, প্রেস কনফারেন্স-এর আয়োজন করা রয়েছে। 'মালয়েশিয়া নিউ স্ট্রেটস্ টাইমস', 'দ্য মালয় মেল' প্রভৃতি পত্রিকার সংবাদদাতারা ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। মালয় মেলের সংবাদদাতা চেন তিউ য়েং জানতে চাইছিলেন, এশিয়ার ইতিহাস যথাযথভাবে লেখা হচ্ছে কি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাস লিখছেন পাশ্চাত্যের স্কলাররা। প্রথমত, তাঁরা এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতিশীল হবেন কিনা; দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ অন্য কালচারের ব্যক্তির পক্ষে সহানুভূতি থাকলেও সঠিক ইন্টারপ্রিটেশন সম্ভব কিনা।

কুয়ালালামপুরে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কর্মীরা মিলে 'নেতাজী সেন্টার' স্থাপন করেছেন। মিঃ গুরুপথম্ বর্তমানে এই সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত। নেতাজীর ভাবধারা বাঁচিয়ে রাখার জন্য এঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁরা জনসাধারণের কাছে সাড়াও পান যথেষ্ট। নেতাজী সম্পর্কিত কাজে মালয়ী ভারতীয়দের আগ্রহ তো রয়েছেই, এমন কি চীনা অধিবাসীরাও এবিষয়ে খবরাখবর রাখেন মনে হল।

একটি চাইনিজ পরিবার আমাদের একদিন ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। এঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য সূত্রে আমাদের ক্ষীণ পরিচয়। নেতাজী বিষয়ে আমাদের আগ্রহের খবরও ওঁদের জানার কথা নয়। কিন্তু গৃহস্বামী গল্প করতে করতে বললেন, তোমাদের সারনেম তো বোস, তা ঠিক ঐ নামে একজন গ্রেট ইণ্ডিয়ান লীডার ছিলেন। জানো, যুদ্ধের সময় তাঁকে আমরা দেখেছি অনেকবার। এই শহরে বক্তৃতা করেছেন, আমরা শুনতে গিয়েছি।

আমার বয়স অল্প ছিল তবুও আমার মনে বেশ ছাপ রয়ে গেছে, খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন।

মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার্স-এ একদিন জনসভা হল। মালয়ের বর্তমান সরকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা রয়েছেন। মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেটে রয়েছেন ডাটুন সামিভেল্লু। এই মন্ত্রীর দফতর হল ওয়ার্কস্ অ্যাণ্ড পাবলিক ইউটিলিটিজ। ডাটুন কথাটা মনে হল যেন আমাদের 'স্যার'। জানকী বিয়ে করেছিলেন ডাটুন অথিনা-হাপ্পানকে, তাই জানকী থেভার্স হয়েছেন ডাটিন বা বলা যেতে পারে লেডি অথিনাহাপ্পান। আমাদের কুয়ালালামপুরের প্রোগ্রামে চোখ বুলিয়ে আগেই দেখেছিলাম, সামিভেল্লু আমাদের একদিন পার্লামেন্টে আনুষ্ঠানিক-ভাবে অভ্যর্থনা করবেন আর মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সভায় উনিই সভাপতি। পার্লামেন্টকে ওঁরা বলেন 'পালিমেন', ইংরেজি হরফে ঐভাবে বানানটাও লেখেন। যেমন কলেজকে লেখেন koleg, অনেক কিছু বেশ সরল করে নিয়েছেন ওঁরা।

মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সেই জনসভায় সামিভেল্লু ঘোষণা করলেন, মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের বাড়িতে যে অডিটোরিয়াম তৈরী হতে চলেছে, তার নাম ওঁরা দেবেন নেতাজীর নামে। এর পিছনে সামান্য ইতিহাস আছে। এককালে 'নেতাজী ফাণ্ড' নামে এক ফাণ্ডের টাকায় বর্তমান কংগ্রেস ভবনের জমিটি কেনা হয়েছিল, পরে তার উপর কংগ্রেস ভবন তৈরী হয়েছে। এখন তার এক্সটেনশনের কাজ চলছে। শীগগিরই একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম যুক্ত হবে। নেতাজীর নামে ওঁরা এটি চিহ্নিত করবেন। মন্ত্রীমশায়ের এই ঘোষণায় সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সৈনিক, আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কর্মী, তাঁদের পরিবার-পরিজন কত যে ছড়িয়ে আছেন কুয়ালালামপুরে, তার ইয়ত্তা নেই। ওঁদের নেতাজী সেণ্টার থেকে আমাদের আসার খবর আগাম প্রচার হয়ে যাওয়াতে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল। প্রতিটি জনসভায় বা ছোট ছোট লাঞ্চ বা ডিনার বৈঠকে এত লোকের সঙ্গে পরিচয় হল যে, এক

সময় তাল রাখতে পারছিলাম না। জানকী থেভার্স, আমেরিখ সিং, মিসেস (মেজর) সত্যবতী নাইডু—এসব নাম আগে শোনা ছিল। কিন্তু অসংখ্য নাম-না-জানা কর্মীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হল কুয়ালালামপুরে।

॥ ২৬ ॥

কুয়ালালামপুরে আমাদের প্রথম বড় বৈঠক বসেছিল The Bengles নামে এক রেস্তোরাঁয়। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চারিদিকে সুপার সাইজের চুড়ির গোছা ঝুলিয়ে ডেকরেশন করা হয়েছে। এটি ছিল লাঞ্চ বৈঠক। এখানেই প্রথম বহু প্রাক্তন আই. এন. এ. কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হল। এই বৈঠকের ভারপ্রাপ্ত মিঃ সোমসুন্দরম জানকী, আমেরিখ সিং সকলেই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন।

আমেরিখ সিংয়ের কাহিনী খুবই রোমাঞ্চকর। উনি ছিলেন 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' কাজে শিক্ষিত। পেনাঙ শহরে স্বরাজ ইনস্টিটিউটে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মীদের শিক্ষণ শিবিরে ওঁর শিক্ষা। এই ইনস্টিটিউট অবশ্য নেতাজী আসার আগেই কাজ শুরু করেছিল। নেতাজী যখন সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন, তখন নূতন করে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মীদের শিক্ষার ব্যাপারটা সংগঠন করেন। তখন পুরোপুরি আজাদ হিন্দ সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং মেজর স্বামীর নেতৃত্বে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মীরা কাজ শুরু করেন। মেজর স্বামীর এ ব্যাপারে ট্রেনিং হয়েছিল জার্মানীতে। নেতাজী সাবমেরিনে ইউরোপ ছেড়ে আসার পর পর মেজর স্বামী একটি ব্লকেড রানার-এ চেপে রওনা হন ও জার্মানীতে ট্রেনিং পাওয়া একদল আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী নিয়ে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছন। যাই হোক, আমেরিখ সিং হলেন এসব ঘটনার আগের ব্যাচ। নেতাজী আসার পর আমেরিখ একটি দলের সঙ্গে সাবমেরিনে এসে উড়িষ্যার উপকূলে পুরীর কাছেই নামেন। দুর্ভাগ্যবশত এই দলের প্রায়

সকলেই ধরা পড়ে যান। গোপন বিচারে আমেরিখের ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়। এইসময়ে একদিন এক জেল থেকে আর এক জেলে গাড়িতে ট্রান্সফার করার সময় আমেরিখ রাস্তা থেকে উধাও হলেন।

ওঁর গল্প শুনে আমরা তো অবাক। কী করে পালালেন! আমেরিখ বললেন, 'এসব শুনতে খুব রোমাঞ্চকর। কিন্তু আসল ঘটনাগুলো যখন ঘটে, তখন যেন বেশ সাদামাটা ভাবে ঘটে যায়। শেয়ালদার কাছে ভ্যানটা থেমেছিল, আমি লাফিয়ে পড়ে ছুট দিলাম। ভিড়ের মধ্যে আঁকাবাঁকাভাবে এ-গলি সে গলি দিয়ে দৌড়ে কলকাতার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। প্রথমে 'ধর ধর' রব উঠেছিল, কিন্তু সেটা পিছনে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আর কিছু শুনতে পাইনি। পথের পাশে নাপিত বসেছিল। ফুটপাথে তার সামনে বসে পড়লাম। বললাম, দাড়ি গোঁফটা কেটে দাও তো। অল্পক্ষণের মধ্যে চেহারা পাল্টে গেল। পলাতক আসামীর জীবন কষ্টকর। যুদ্ধ থেমে গেল, তবু কোথাও আশ্রয় পাই না। শেষে একদিন আই. এন. এ. রিলিফ কমিটির অফিসে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখা হল মণিমোহন চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

মণিবাবু আমাদের সকলের পরিচিত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তিনি ছিলেন স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর একান্ত অনুগামী। আই. এন. এ. রিলিফ কমিটি ও 'নেশন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে আমৃত্যু নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সক্রিয় ও বিশ্বস্ত সদস্য হন।

এই মণিবাবুকে আমেরিখ সেদিন থেকে 'দাদা' বলে ডাকলেন। ওঁর নিজের বাড়িতে মণিবাবু অনেকদিন ফাঁসির আসামী আমেরিখ সিংকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

জানকী থেভার্স বলছিলেন, তাঁর যুদ্ধের দিনগুলির স্মৃতি। সেই যে সাইকেলে চেপে নেতাজীর মিটিং শুনতে এসেছিলেন আর তো পিছন ফিরে তাকানো হল না। কানের দুল আর হাতের চুড়ি খুলে আজাদ হিন্দ ফাণ্ডে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন দেশের জন্য। শুরু হল সিঙ্গাপুর শিবিরে কঠোর মিলিটারি ট্রেনিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্চ করা, রাইফেল,

ছোঁড়া, হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছোঁড়া, কেউ কেউ নন-কম্ব্যাটাণ্ট অর্থাৎ নার্সিংয়ের দিকেও গেল। জানকীর অবশ্য ফাইটিং স্পিরিট। ভারত-বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধে যাবার বাসনা।

প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর ওঁরা এলেন রেঙ্গুনের রানী ঝাঁসি শিবিরে। আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তরও তখন রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানে এসে ওঁদের আরো অ্যাডভান্স ট্রেনিং হল। ওঁদের Jungle Warfare-এ বিশেষভাবে শিক্ষা নিতে হয়েছিল। ওঁদের ভার ছিল দু'জন অফিসারের ওপর— মেহবুব আহমেদ আর মেজর রাতুরি।

কী সাংঘাতিক বোমাবর্ষণ-ই না দেখেছেন সে সব দিনে ওঁরা। রেঙ্গুনের আই. এন. এ. হাসপাতাল বোমা ফেলে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল শত্রুপক্ষ। সেইসব দুঃস্বপ্নের মত দিনের কথা যেমন মনে আছে জানকীর, তেমনি যে আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদ দেখেছেন সেই সময়ে তাও জীবনে ভুলবেন না। 'জয় হিন্দ' বলে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের আহত সৈনিকদের। তাদের একমাত্র দুঃখ, তারা দেশের জন্য আর কোন কাজে লাগবে না।

জানকীর জীবনের সব চাইতে বড় অভিজ্ঞতা হল, রেঙ্গুন থেকে মৌলমেন হাঁটাপথে নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গে রিট্রিট। পথের মধ্যে সব লরি, গাড়ি খারাপ হয়ে পড়ল। তখন দিনের বেলা লুকিয়ে থাকা আর রাত্রের অন্ধকারে পথ চলা। পথ চলার দুঃখ-কষ্ট জানকীর তত কিছু মনে হত না। কিন্তু সাময়িক হলেও পরাজয় ঘটেছে, রিট্রিট করতে হচ্ছে, এ কথা ভাবতে কষ্ট হত। কিন্তু নেতাজীর মুখ চেয়ে নিজেদের হতাশা বা কষ্টের কথা জানকী কেন, সব মেয়েরাই গোপন করতেন। বিশ্রামের সময়টুকুতে হাসি-গল্প, রান্না-বান্না নিয়ে ভুলে থাকতেন। আর মাথার ওপর চলত অবিরাম বোমা বর্ষণ। লেফট্যানাণ্ট নাজির নামে এক ব্রিলিয়াণ্ট অফিসারের উল্লেখ করলেন জানকী। এই রিট্রিটের সময় আহত হয়ে ওঁর মৃত্যু হয়। শেষ সময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কোনমতে একটুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, স্বদেশ ও নেতাজীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার কথা। অস্পষ্টভাবে

'জয় হিন্দ' উচ্চারণ করেছিলেন অন্তিম মুহূর্তে। রানী ঝাঁসি বাহিনীর আর একজন প্রাক্তন অফিসারের সঙ্গে জানকী আলাপ করিয়ে দিলেন বুকিট বিনটাং নামে এক জায়গায় ডিনার বৈঠকে। লক্ষ্মী স্বামিনাথন যখন সিঙ্গাপুর ছেড়ে প্রথমে রেঙ্গুন ও পরে মেমিও অগ্রসর হলেন, তখন ডেপুটি চীফ হিসেবে সিঙ্গাপুরের শিবিরের ভার নিলেন মেজর মনোরঞ্জিতাম্ সত্যবতী নাইডু। মিসেস নাইডু এখন খুবই বৃদ্ধা, চোখে কিছুই দেখতে পান না। অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে আমাকে স্পর্শ করে দেখলেন। ওঁর দুই দৃষ্টিহীন চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছিল। তবে উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। পরদিন আবার বিবেকানন্দ আশ্রমের বড় মিটিং-এ উনি ঠিক হাজির হয়েছেন।

বুকিট বিনটাং-এর ডিনার বৈঠক খুব জমেছিল। নেতাজী প্রথম যেবার কুয়ালালামপুর এলেন, তার গল্প শুনছিলাম। তখনো আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপিত হয়নি। নেতাজী ট্রেনে এসেছিলেন। প্রচণ্ড ভিড় ও উৎসাহী জনতার চাপে অনেকক্ষণ নেতাজী নামতেই পারছিলেন না। একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হিরো ওয়ারশিপ কোন কাজের কথা নয়। আসল হল আন্দোলন। জনসাধারণের আবেগ, উৎসাহ সব কিছু ঠিক পথে চালিত করতে হবে, তাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। এই ধরনের হিরো ওয়ারশিপ করে সব আবেগ উজাড় করে দেওয়া অর্থহীন।

সেবারই তো কুয়ালালামপুরের জনসভায় নেতাজী ভাষণ দিলেন। তেমন জনসভা এই শহরে আগে কেউ দেখে নি। এই সভাতে নেতাজী বললেন— এ যুদ্ধ আমাদের ভগবানের দেওয়া সুযোগ। আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। অথচ আমাদের চাই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী। এখন আমরা পূর্ণ স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করতে পারব।

আমাদের সেদিনের ডিনার বৈঠকে যেন বহু যুগ আগের ভাবাবেগের একটু ছোঁয়া লেগেছিল। জানকী বললে, গান শোনাবে। নেতাজী নিজে

শিখিয়েছিলেন যে গান। একটি হল 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'। লক্ষ্মীর গলায় এ গান শুনেছি আমি। সেও বলেছিল, নেতাজী নিজে গান গেয়ে শিখিয়েছিলেন ওঁদের। আবার জানকীর কাছে শুনলাম। আর একটা গান জানকী গাইল, হিন্দী ভজন। সঠিক কথা মন থেকে হারিয়ে গেছে। গানের ভাবটি হল, এ সংসারে কিছুই চিরদিনের নয়—জানকী বললে এটি নেতাজীর খুব প্রিয় গান ছিল। ডিনারের শেষে সকলে মিলে 'সুভাষজী সুভাষজী' গান হল। এরা এত মন-প্রাণ দিয়ে গাইছিল—ওহ জানে—হিন্দ আ গয়ে, বহ শাম্—হিন্দ আ গয়ে, এশিয়াকে আফতাব এশিয়ামে আ গয়া— মনে হচ্ছিল কুয়ালালামপুরের সেই পুরানো উদ্দীপনাময় দিনগুলি ফিরে এল বুঝি!

কুয়ালালামপুরে ক'দিনের প্রোগ্রাম একেবারে ঠাসা ছিল। কখনো রাবার প্ল্যানটেশন্ ভিজিট, কখনো বিবেকানন্দ আশ্রম, তারই ফাঁকে মিনিস্টার সামুভেল্লুর সঙ্গে পার্লামেন্টে সাক্ষাৎ। একদিন ছিল পিওর লাইফ সোসাইটিতে যাওয়া। এই পিওর লাইফ সোসাইটি ব্রহ্মচারী কৈলাসম্ স্থাপন করেছিলেন। এখন দেখাশুনো করেন সিস্টার মঙ্গলম্। এইসব ঘোরাঘুরির ফলে কুয়ালালামপুর শহরটিও দেখা হয়ে যাচ্ছিল— পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বড় বড় ঝক্‌ঝকে রাস্তাঘাট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মনে মনে ভাবলাম, পৃথিবীর সব শহরই এগিয়ে চলেছে, আমাদের নিজের শহর ছাড়া।

মিঃ গুরুপথম্ একদিন নিয়ে গেলেন ওঁদের 'নেতাজী সেন্টার'-এ। ছোট আপিস, কামরায় ঢুকেই একটি সুন্দর অয়েল পেন্টিং দেখতে পেলাম। নেতাজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। গুরুপথম্ জানালেন, এই পোট্রেটের জন্য নেতাজীকে ওঁর সিঙ্গাপুরের বাসভবনে বেশ কয়েকদিন সিটিং দিতে হয়েছিল। ছবি এঁকেছিলেন নাম্বিয়ার নামে এক চিত্রকর। না, ইউরোপের নাম্বিয়ারের সঙ্গে এঁর কোন যোগ নেই, ইংরেজিতে নাম্বিয়ার বানানটাও অন্যরকম। নেতাজীকে সামনে দাঁড় করিয়ে এই ছবি আঁকা হয়েছিল জেনে খুব খুশি হলাম। সাধারণত আমাদের দেশের নেতাদের এই সৌভাগ্য হয় না। বহুকাল পরে ফটোগ্রাফ দেখে দেখে ছবি বা স্ট্যাচু করতে হয় শিল্পীকে।

নেতাজীর এই পোর্ট্রেট মোটের উপর বিশ্বস্ত এবং বেশ সজীব।

আমার হুইল-চেয়ার জীবনের সঙ্গে সিঙ্গাপুর-কুয়ালালামপুরে ঝটিকা সফর ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। অতএব অঘটন যা ঘটার তা ঘটল। শেষের দিকে পেনাঙ ও ইপো যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করতে হল। অথচ পেনাঙ আর ইপোতে বড় জনসমাবেশ ডাকা হয়ে গিয়েছিল। উদ্যোক্তারা বিপন্ন বোধ করেছিলেন কিন্তু আমি নিরুপায়। ইপো আর পেনাঙ যাবার ইচ্ছা আমারই কী কম ছিল! আয়ার সাহেবের কাছে যুদ্ধের শেষ ক'দিনের গল্প যখন শুনতাম, তখন ইপো, পেনাঙ, কুয়ালালামপুর এই নামগুলো বার বার ফিরে আসত। তখন এ সব নাম আমার কাছে শুধুই শব্দধ্বনি ছাড়া কিছু ছিল না। এখন সিঙ্গাপুর কুয়ালালামপুর এসে নামগুলো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

জাপান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে এখবর নেতাজী পেয়েছিলেন সেরেমবানে। সে সময় একটি জরুরী কাজে উনি সেরেমবান এসেছিলেন। আই. এন. এ'র জনৈক অফিসার ও একটি চীনা মেয়েকে জড়িয়ে একটি ঘটনা ঘটে যায়। পরে সন্দেহ করা হয়, চীনা মেয়েটি গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত। বিচার শুরু হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হলে আই. এন. এ'র লোকটিকে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট শাস্তি দেবে। কিন্তু জাপানী কর্তৃপক্ষ বলছিল, 'চীনা মেয়েটিকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা দণ্ড দেব।' কথাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। মেয়েটি তো ভারতীয় নয়, সে আজাদ হিন্দ সরকারের আশ্রয় পেতে পারে না। কিন্তু প্রথমত নেতাজী নিজের সরকারের কর্তৃত্ব কোন ব্যাপারে খর্ব হতে দেবেন না। তারপর ওঁর মিলিটারি ইউনিফর্মের আড়ালে আছে মানবদরদী কোমল হৃদয়। মেয়েটিকে জাপানী মিলিটারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলে তার ফল কী হতে পারে তা ওঁর অজানা নয়। উনি তাই একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন সেরামবানে। আয়ার তখন ওঁর সঙ্গে রয়েছেন। নেতাজী আগে চলে এসেছিলেন, আয়ার এসে যোগ দিলেন পরে। সেটা ছিল ৩১শে জুলাই ১৯৪৫। আয়ার এসে পৌঁছনো মাত্র নেতাজীর সঙ্গে দু'দিনের সফর

কুয়ালালামপুর গেলেন। নেতাজীর সেই শেষবার কুয়ালালামপুর যাওয়া। সেখানে তখন ছিলেন কর্নেল এনায়েৎ কিয়ানি। পেনাঙে ছিলেন মেজর স্বামী আর রাঘবন। ইপোতে ছিলেন কর্নেল থিভি।

আগস্টের দশ তারিখে এনায়েৎ কিয়ানি ট্রাংক কল করলেন কুয়ালালামপুর থেকে। মেজর আলাগাপ্পান ফোন ধরেছিলেন। কিয়ানি কি বলতে চান উনি ভাল শুনতে পাচ্ছিলেন না। নেতাজী উঠে নিজেই ফোন ধরলেন। এনায়েৎ কিয়ানি খবর দিলেন, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সিঙ্গাপুর থেকে মেজর-জেনারেল জমান কিয়ানি বার বার চেষ্টা করেও সেরামবানে নেতাজীর লাইন পাচ্ছেন না। তাই কুয়ালালামপুরে এনায়েৎ কিয়ানিকে খবর দিয়েছেন নেতাজীর কাছে এই মেসেজ যেন পৌঁছানো হয়।

পরদিন সকালে নেতাজী আয়ারকে পাঠিয়ে দিলেন কুয়ালালামপুর। আয়ার সেখান থেকে খবর নিয়ে ফিরলেন, প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে পড়েছে। সেদিন বিকালে আবার সিঙ্গাপুর থেকে ট্রাংক কল। মেজর-জেনারেল জমান কিয়ানি বলছেন, নেতাজী যেন একটুও দেরী না করে এখনি সিঙ্গাপুর ফিরে আসেন।

এত তাড়া কিসের—নেতাজী, আয়ার, হবিবুর, আলাগাপ্পান কেউ ঠিক বুঝতে পারেন নি। সেরেমবানে থাকার ফলে ওঁরা একটু খবরাখবর থেকে দূরে হয়ে পড়ছিলেন। অবশ্য সেদিনই রাত দুটো নাগাদ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের ডাঃ লক্ষ্মণায়া ও গণপতি এসে পৌঁছলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নেতাজীর ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারটা নেতাজীর কাছে টেনে নিয়ে গলা নামিয়ে ওঁরা বললেন— জাপান সারেণ্ডার করছে!

এরপর নেতাজী যা দু'চারটি মন্তব্য করেছিলেন তা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। অল্পক্ষণ নীরবতার পর বলেছিলেন— So what next? অমনি পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন। সে রাত্রের মধ্যে নেতাজী অনেক জরুরী কাজ সেরে ফেললেন। এনায়েৎ এসে পড়েছিল

কুয়ালালামপুর থেকে, তাকে ইপোতে পাঠানো হল গাড়িতে তেল ভরে আনতে। নেতাজী বলেছিলেন, বেশী করে পেট্রোল নিয়ে নিতে বলো, কাল থেকে আর তো লাগবে না।

মেজর স্বামী ও রাঘবনকে পেনাঙে আর থিভিকে ইপোতে খবর দেওয়া হল, এখনি সিঙ্গাপুরে চলে এসো।

ভোর হয়ে যাচ্ছে, নেতাজী সারারাত কাজ করেছেন। আয়ার বলেছিলেন, একটু বিশ্রাম করে নিন। সকাল হলেই তো সিঙ্গাপুর রওনা হতে হবে। বেশ ক্লান্তিকর, দীর্ঘ মোটর জার্নি, সারাদিন লেগে যাবে। তা ছাড়া পথও বিপদসঙ্কুল। নেতাজী আয়ারের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর বললেন—ঠিক আছে, কাল থেকে তো ঢের বিশ্রাম পাওয়া যাবে।

॥ ২৭ ॥

এক দিক থেকে দেখলে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের শুরু ও শেষ দুই পর্বের সঙ্গেই ব্যাংককের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। ব্যাংকক শহরের শিল্পকর্ণ বা সিলভারকর্ণ থিয়েটরে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন প্রবাসী ভারতীয়দের এক বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ব্যাংকক কনফারেন্স নামে পরিচিত এই সমাবেশে সমাগত প্রতিনিধিরা প্রস্তাব নিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আসতে আমন্ত্রণ করা হোক এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর জন্য জাপান ও জার্মান সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভার সভাপতি রাসবিহারী বসুকে দেওয়া হল।

যুদ্ধের শেষ পর্বে রেঙ্গুনের পতনের পর ১৯৪৫ সালের মে মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টার্স ব্যাংককে স্থানান্তরিত হল। সে সময়ে ব্যাংককের গুরুত্ব বেড়ে গেল। অবশ্য সিঙ্গাপুর বরাবর ছিল বেস্ হেড

কোয়ার্টার্স। এই ব্যাংকক শহর থেকে যেমন প্রথম আহ্বান গিয়েছিল নেতাজীর কাছে, তেমনি যুদ্ধের শেষে এই ব্যাংকক শহর বিদায় জানাল নেতাজীকে। ১৭ আগস্ট ১৯৪৫ সালে ভোরবেলা নেতাজী সদলবলে যখন বিমানে ব্যাংকক শহর ত্যাগ করলেন, তখন উনি আজাদ হিন্দ সরকারের শেষ ঘাটি ত্যাগ করলেন বলা চলে। সেদিনটা উনি সায়গনে কাটিয়েছিলেন বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে, আর সেদিন বিকেলেই সায়গন থেকে কর্নেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গী করে বিমানে পাড়ি দিলেন।

কুয়ালালামপুরে আমাদের ভ্রমণসূচীর বড়রকম কাটছাঁট করতে হল বলে খুবই মনোকষ্টে ছিলাম। তবু ব্যাংকক যে বাদ পড়ে গেল না সেটাই মস্ত ভাগ্য মনে হল। সিঙ্গাপুরে সিদ্ধাত্মানন্দজী প্রায়ই বলছিলেন, পায়ের ব্যথাটা একটু ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া উচিত। সেই সূত্রে শোনা গেল, সিঙ্গাপুরে এখন যে তিনজন নামজাদা অর্থোপেডিক সার্জেন রয়েছেন ঘটনাচক্রে তাঁরা তিনজনই বাঙালী। কাজের চাপে সিঙ্গাপুরে সময় পাওয়া যায়নি। কুয়ালালামপুর এসে আবার ডাক্তার পাওয়া গেল, এবারও বিখ্যাত বাঙালী সার্জেন এবং পরিচিত বন্ধুজন। ডাঃ মুখার্জি পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মোটের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেও শেষরক্ষা হল না। রোগনির্ণয় যা হল তা খুবই হাস্যকর, যদিও সেই মুহূর্তে একটুও হাসি পাচ্ছিল না। রোগের নাম 'আন্অ্যাকাষ্টমড্ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য নী' অর্থাৎ কিনা জানুর অনভ্যস্ত, অভারতীয় কার্যকলাপ, সহজ কথায় বারবার জাপানী প্রথামত হাঁটু মুড়ে বসার ফল।

কুয়ালালামপুর থেকে ব্যাংকক পৌঁছে মনে হল, এবার যেন কলকাতার কাছাকাছি এসে পড়েছি। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর ছিল ঝক্মকে শহর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে সাচ্ছল্যের ছাপ। ব্যাংকক তুলনায় মলিন, বিবর্ণ। কোন কোন এলাকায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ট্যুরিস্টদের কাছে ভিক্ষা চাইছে চোখে পড়ল। এয়ারপোর্ট থেকে শহরের রাস্তায় বেশ কিছু খানাখন্দ, গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে বেশ পরিচিত আমেজ পাওয়া গেল।

ব্যাংককে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন নেতাজীর প্রাক্তন সহযোগীরা

এবং থাই-ভারত কালচারাল লজের সদস্যরা। আমাদের হোটেলের ছোট ঘর মানুষজনের ভিড়ে উপচে পড়ছিল। থাই-ভারত কালচারাল লজের সেক্রেটারি মিঃ মাত্তা আমাদের সকলকে নিয়ে শ্যাম স্কোয়ারে এক রেস্তোরাঁতে মিলিত হলেন। শ্যাম স্কোয়ার নামটি আমার খুব ভাল লেগে গেল।

ব্যাংককে পা দেবার পর থেকে যাঁর কথা আমার সবচাইতে বেশী মনে পড়ছিল, তিনি দেবনাথ দাস। দেবনাথবাবু আজাদ হিন্দ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ওঁর কর্মস্থল ছিল ব্যাংকক। তাই ব্যাংককের অনেক কাহিনী শুনতে পাওয়া যেত ওঁর কাছে। মৃত্যুর ক'দিন আগেও দেবনাথবাবু এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ধরে ওঁর যুদ্ধের সময়ের নানান অভিজ্ঞতার গল্প করেছিলেন।

ব্যাংকক কনফারেন্স-এর রিসেপ্‌শন কমিটির উনি ছিলেন চেয়ারম্যান। সম্মেলনের সাফল্যে ওঁর খুব গর্ব ছিল। ১৯৪২ সালের ১৫ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন চলেছিল। থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। উনি নিজে না এলেও ওঁর বার্তা পাঠ করেছিলেন তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচিত্র ব্যথাকর্ণ। পিবুল সংগ্রাম বলেছিলেন, থাইল্যাণ্ডের মানুষ স্বাধীনতার মর্যাদা বোঝে। তাই ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে থাইল্যাণ্ডের রয়েছে পূর্ণ সহানুভূতি। উনি থাইল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে যে সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে তারও উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে আমরা শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শিখেছি আর পেয়েছি আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম। এমন কি, আমাদের ভাষাতে রয়েছে ভারতবর্ষের প্রভাব। আমাদের ধর্ম, ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান—সবকিছুর মাতৃভূমি—'মাদার কান্ট্রি' হল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী শক্তির চাপে নিষ্পেষিত তখন থাইল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছি আমরা।[2]

'ব্যাংকক সম্মেলন' প্রবাসী ভারতীয়দের সমাবেশ হলেও আন্তর্জাতিক চেহারায় দেখা দিয়েছিল। পিবুল সংগ্রাম ছাড়াও বার্তা পাঠিয়েছিলেন

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো। উনি বললেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপান সবরকম সাহায্য করবে। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বললেন, কেউ যেন মনে না করেন যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানের অন্য রকমের কোন আগ্রহ আছে।

কনফারেন্স-এ উপস্থিত ছিলেন থাইল্যাণ্ডে জাপানের রাষ্ট্রদূত স্থবোকামি আর জার্মান রাষ্ট্রদূত ডাঃ ওয়েগুলার। দু'জনেই বক্তৃতা করেছিলেন। ডাঃ ওয়েগুলার আবার জার্মানী ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উল্লেখ করলেন। ইতিহাসে দেখা যাবে, হাজার বছর ধরে এই সাংস্কৃতিক চেনাজানা রয়েছে। ইউরোপে জার্মানীই হল প্রথম দেশ যে কিনা ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় কাব্যের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করেছে। এই সম্মেলন চলেছে জুন মাসে, তার ঠিক আগে মে মাসের শেষে নেতাজীর সঙ্গে হিটলারের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি ঘটেছে। ওয়েগুলার তাঁর বক্তৃতায় সেকথা উল্লেখ করলেন। বললেন, অতি সম্প্রতি জার্মান চ্যান্সেলর আপনাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেছেন।

ইতালীয় রাষ্ট্রদূত গুইদো ক্রোলও এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। রাসবিহারী বসুর সভাপতির ভাষণ হল। দেবনাথবাবুও বক্তৃতা করেছিলেন। এ ছাড়া বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন সহায়, ক্যাপ্টেন মোহন সিং। সম্মেলনে স্থির হল, সকলে মিলে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন। সেনাবাহিনী হবে লীগেরই সামরিক শাখা। ছোটখাট অন্যান্য সংগঠন যা ছিল সব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে মিলে গেল।

ব্যাংকক কনফারেন্স-এর উদ্যোক্তারা খুব সঙ্গতভাবেই গর্বিত বোধ করেন; ওঁরা বলেন, আমরা প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে বললাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে এশিয়াতে আনা হোক। নেতাজীকে সম্মেলনের খবর জানিয়ে নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছিলেন ওঁরা। তার জবাবে রিসেপ্‌শন কমিটির চেয়ারম্যান দেবনাথবাবুর কাছে নেতাজীর বার্তা এসে পৌঁছল। বার্লিন থেকে নেতাজী লিখলেন, আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশী হয়েছি।

আমার পক্ষে সশরীরে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হল না। তবে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা সম্মেলনের জন্য রইল।

নানা কথার মধ্যে নেতাজী বললেন—দেশে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমাদের জাতীয় সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হবে। স্বদেশে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে চলেছেন দেখে আমরা আনন্দিত। আমরা যারা প্রবাসে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংগঠন করছি, তাদের ওপর এসে পড়েছে গুরুদায়িত্ব। আমি জানি জার্মানী, জাপান, ইতালী—ট্রাইপার্টাইট পাওয়ারস্ আমাদের সাহায্য করবে, কিন্তু ভারতের মুক্তি আনতে হবে ভারতীয়দের নিজেদের চেষ্টায়—"But the emancipation of India must be the work primarily of Indians themselves".

বিদেশী সাহায্য নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে নেতাজী বললেন, ব্রিটিশ এম্পায়ার তো পৃথিবীর সব দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য, বিদেশী যুদ্ধ-সরঞ্জাম এনে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে, তবে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর কেন অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য নেবার অধিকার থাকবে না? নেতাজী আরো বললেন, দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কেমন হবে সে সম্পর্কে আমার অবশ্যই নিজস্ব পরিষ্কার মতামত আছে; তবে আমি মনে করি—"It is the Indian people in Free India who must determine the future destiny of the country and of the Free Indian state".

উদ্দীপনাময় পরিবেশ সত্ত্বেও ব্যাংকক কনফারেন্স-এ কিন্তু একটা শোকের ছায়া ছিল। কয়েক মাস আগে, ১৯৪২-এর মার্চ মাসে এই ব্যাংকক কনফারেন্স-এর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য রাসবিহারী বসু টোকিওতে এক বৈঠক ডেকেছিলেন। ব্যাংকক থেকে বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন প্রীতম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আক্রম খান এবং এন্ আয়ার। এঁরা চারজনই টোকিওর পথে বিমান-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ব্যাংকক কনফারেন্স-এর সময়ে এঁদের অভাব সকলে বিশেষভাবে বোধ করছিলেন। প্রীতম সিংয়ের মৃত্যুতে গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল। কারণ জাপানের পক্ষ থেকে জেনারেল

ফুজিয়ারা প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে। প্রীতম সিং ও ফুজিয়ারার অনেক গোপন মিটিং হয়েছিল ব্যাংককে। প্রথম যে দিন ফুজিয়ারা প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, খুবই উত্তেজিত বোধ করেছিলেন। ফুজিয়ারা বলেছেন, যেন "Midnight tryst with a lover" হতে চলেছে মনে হল। দেখা হল অবশ্য দিন-দুপুরে। ফুজিয়ারা ভেবেছিলেন, একজন জবরদস্ত চেহারার বিপ্লবী দেখবেন। তা কিন্তু নয়। দেখলেন সুন্দর চেহারা, বয়স খুব বেশী নয়, ক্ষীণদেহী এক শিখ। অল্পক্ষণ কথাবার্তার পরই ফুজিয়ারা প্রীতম সিংয়ের আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হলেন। প্রীতম সিং ওঁকে বলেছিলেন, ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশদের হাত এড়িয়ে উনি ব্যাংককে এসে আশ্রয় নেন। ব্যাংককের ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স্ লীগ হল ওঁদের প্রতিষ্ঠান।

ফুজিয়ারাকে উনিই খবর দেন, ব্যাংককের অপর প্রতিষ্ঠান হল থাই-ভারত কালচারাল লজ। সেখানে আছেন স্বামী সত্যানন্দ আর দেবনাথ দাস। পর পর অনেক গোপন মিটিং নানারকম অদ্ভুত জায়গায় হয়েছে। ফুজিয়ারা গল্প করেছেন, মশার কামড় খেতে খেতে, গরমে সেদ্ধ হতে হতে আলোচনা চলত। একবার ফুজিয়ারা দেখা করতে গিয়ে দেখেন প্রীতম সিং খুব কাশছেন, চেহারাটা রক্তশূন্য। —আপনি কি অসুস্থ? ফুজিয়ারার প্রশ্নের জবাবে প্রীতম সিং বললেন, বুকের কষ্ট আছে একটু। তবে ভাববেন না, কাজ শেষ হবার আগে মরছি না।

প্রীতম সিং অবশ্য কথা রাখতে পারেননি। কাজ শুরু হবার মুহূর্তেই বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হলেন। অবশ্য তার আগেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে প্রোপাগাণ্ডার কাজ উনি শুরু করে গিয়েছিলেন। ফুজিয়ারা আর প্রীতম সিং মালয়ের জঙ্গলে দেখা পান লেঃ কর্নেল ফিৎস্প্যাট্রিক আর ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের। ওঁরা আত্মসমর্পণ করার পর থেকেই একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন হল সেদিন। সেই প্রীতম সিংয়ের অকালমৃত্যু ফুজিয়ারাকে আঘাত করেছিল খুব।

ব্যাংকক কনফারেন্স থেকে নেতাজীর প্রতি আহ্বান গেল জুন ১৯৪২-এ। কিন্তু নেতাজী এশিয়াতে এসে পৌঁছলেন পুরো এক বছর পর। সব

কিছুর মধ্যে থাকে নিয়তির হাত। আরো আগে এসে পৌঁছতে পারলে ইতিহাস হত অন্যরকম। নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন জুলাই ১৯৪৩। তারপরই এক ঝটিকা-সফরে ব্যাংকক, রেঙ্গুনে ঘুরে গেলেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে কয়েকদিন নেতাজী ব্যাংককে কাটালেন।

প্রধানমন্ত্রী পিবুল সংগ্রামের সঙ্গে নেতাজীর দেখা হল, পরস্পর গুণমুগ্ধ হলেন। ব্যাংককের ধনী ব্যবসায়ীরা অনেকে ভারতীয়। তাঁদের মধ্য থেকে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের জন্য প্রভূত অর্থ নেতাজী সংগ্রহ করলেন। আগস্টের আট তারিখে ব্যাংকক ইউনিভার্সিটির লেকচার হল-এ নেতাজী এক তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করেছিলেন। পরদিন ৯ তারিখে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা বসেছিল। জাপানী ডকুমেন্ট বলছে, এই সভাতে নেতাজী "embraced more than one thousand Indians." আলিঙ্গন করেছিলেন কথাটা বোধ করি আলংকারিক অর্থেই বলা হচ্ছে। তবে শহরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

॥ ২৮ ॥

শ্যাম স্কোয়ারের ডিনার বৈঠকে প্রথম আমি বালসেনা দেখলাম। এখন অবশ্য তাঁরা সকলে প্রৌঢ়সেনা হয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধের দিনগুলিতে এঁরা ছিলেন বারো থেকে ষোল বছরের কিশোর। মিঃ মাত্তা, প্রীতম সিং কুকলেচা প্রভৃতি ওঁদের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা বলছিলেন। মিঃ মাত্তা এখন থাই-ভারত কালচারাল লজের সেক্রেটারি। উনি একটু অভিমানের সুরে বললেন, তোমরা তো আমাদের আমলই দিতে চাও না। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের গাথা যখন আলোচনা হয় তখন বিভিন্ন রেজিমেণ্টের নাম করা হয়, রানী অব ঝাঁসি রেজিমেণ্টের কথাও বলা হয় কিন্তু কেউ বালসেনার কথা

বলে না। তোমরা হয়ত মনে করো এটা একটা ছেলে-ভুলনো খেলা ছিল, তা কিন্তু মোটেও নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল যথেষ্ট সিরিয়াস।

আমরা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠি, আমরা তো আপনাদের ভূমিকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। কে বললে আপনাদের কথা আমরা ভাবি না! তবে বালসেনা আগে দেখিনি, একসঙ্গে অনেকজনকে তো নয়ই। রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের কনভেনশন হয়ে গেছে তার আগের বছর নেতাজী ভবনে। সে সময়ে ক্যাডেটদের কনভেনশন-এর তোড়জোড় চলছে। চোখে না দেখলেও বালসেনাদের কীর্তি-কাহিনীর কথা আয়ার সাহেব, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস সকলের মুখেই শুনেছি। যখন বাবা-মা, দাদা-দিদি সকলে যুদ্ধের কাজে ব্যাপৃত, তখন ছোটরা কিঞ্চিৎ অবহেলিত বোধ করছিল। আমরা কী কোনমতেই দেশের কাজে লাগতে পারি না, এই ছিল ছোটদের মনোভাব। এই মনোভাবকে কাজে লাগাতেই নেতাজী বালসেনা গড়তে নির্দেশ দিলেন। শুনেছি, বারো কেন, নয়-এর ওপর বয়স হলেই এই বালসেনাতে যোগ দেওয়া যেত।

দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই যে টোটাল ইনভলভ্‌মেণ্ট বা সর্বাত্মক যোগ, এটা সত্যিই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। সবরকম সেন্টিমেণ্ট বাদ দিয়ে খুব সাদা চোখে বিচার করলেও এঁদের আত্মত্যাগে অভিভূত হতে হয়। বিশেষত ওঁরা সংগ্রাম করছেন এক অদেখা মাতৃভূমির জন্য।

থাইল্যাণ্ড, মালয়, বর্মা সব জায়গায় ছোট ছেলেমেয়েরা দলে দলে নাম লিখিয়েছিল। বেশ ছ'সাতটা বিভিন্ন শিবিরে এদের ট্রেনিং হয়েছিল। রেঙ্গুন, মান্দালয়, মেমিও, মৌল্‌মেন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, ব্যাংকক। তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাস কঠোর ট্রেনিং। শারীরিক ব্যায়াম, ছোটখাট অস্ত্র চালনা শিক্ষা, সকলের উপর সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শেখা, এইসব ছিল ট্রেনিং-এর অঙ্গ। এ ছাড়া বালসেনাদের নিজেদের অঞ্চলের ভালরকম ভৌগোলিক ট্রেনিং জরুরী ছিল। আশপাশের পথঘাট ভাল রকম চেনা থাকা চাই। কারণ মাঝে মাঝেই ওরা সাপ্লাই লাইনের কাজ করত। ছোট-

খাট অস্ত্রশস্ত্রের প্যাকেট বা খাবার-দাবার বিভিন্ন সেনাবাহিনীকে পৌঁছে দেওয়ার ভার অনেক সময় বালসেনাদের ওপর দেওয়া হত। অবিরাম বোমা বর্ষণের ভিতর, বা কখনো শত্রু এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়ে ছোট ছেলেরা এই সাপ্লাই লাইন অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

মেয়েরা রানী ঝাঁসি বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছে। কখনো বা আহতদের দেখাশুনোর কাজে, কখনো বা জওয়ানদের জন্য নাচ-গানের অনুষ্ঠানের আয়োজনে। ইন্দিরা নায়ার নামে একটি ছোট্ট মেয়ে তার সুন্দর নাচ-গানের জন্য নেতাজীর প্রশংসা পেয়েছিল। প্রচার দপ্তরের নানা কাজে এরা সাহায্য করত।

রেঙ্গুনের আই. এন. এ. হাসপাতালে বোমা পড়ার সময়েয় এক ট্র্যাজিক ঘটনার কথা শুনলাম। আহত সৈনিকে ভরতি ছিল হাসপাতাল। আহতদের মনোরঞ্জনের জন্য সেদিন ছোট ছেলেমেয়েরা একটা অনুষ্ঠান করেছিল। তারপরই হঠাৎ এয়ার রেড শুরু হয়ে যায়। হাসপাতালের মাথায় বড় করে রেড ক্রস আঁকা, বাগানের চারপাশে রেডক্রসের ছড়াছড়ি। ডাক্তার-নার্সরা কেউ ভাবতে পারেননি, ওঁদের হাসপাতালই টার্গেট হবে। কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান হাসপাতালের ওপর নেমে আসে, পর পর পাঁচ দফায় আক্রমণ চলে। আগুনে বোমায় সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়ের সেই দলটিও সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল। খবর পেয়ে নেতাজী এসে পৌঁছলেন, আই. এন. এ. সৈনিকদের তলব করা হল ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের কাজে। তিনদিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছিল।

অবশ্য সব ঘটনাই ট্র্যাজিক নয়। নেতাজী একবার বালসেনার একটি দল পরিদর্শনে এলেন। সকলে ফর্মেশনে দাঁড়াবার পর ক্ষুদে কম্যানডার এসে স্যালুট করে জানালো তার কম্প্যানি প্রস্তুত, তখন নেতাজীর চোখে জল এসে গিয়েছিল গর্বে।

শ্যাম স্কোয়ারের বৈঠকে প্রাক্তন বালসেনারা বললেন—আমরা মনে করি, আমরা সবচাইতে বেশী কাজে লেগেছিলাম যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর বড়দের মনে হতাশা, হয়ত বা ভীতি। আই. এন. এ. অফিসাররা তো বন্দী। কিন্তু আমরা ছোটরা তো হতাশাও জানি না, ভীতিও জানি না। আমাদের যে কোন বিপদ হতে পারে সে বিষয়ে আমরা সচেতন নই। আমরা নির্ভয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের গান গেয়ে বেড়াই।

সবসে উঁচা হ্যায় দুনিয়ামে ঝাণ্ডা হামারা
নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ করেঙ্গে,
আজাদ করেঙ্গে।

চলো চলো ভাই দেহ্‌লী চলো,
ঝাণ্ডা লহরাকে চলো
দুশমনোকো ভারতসে মার ভাগা দো
নেতাজী জিন্দাবাদ।

যে দুশমনদের মেরে তাড়াবার কথা হচ্ছে তারা তো তখন ব্যাংককের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক শহরেই "জয় হিন্দ" বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পথে হয়ত কোন ব্রিটিশ অফিসার চলেছেন পিছন থেকে কচি গলায় 'জয়হিন্দ' শোনা গেল, ফিরে তাকাতে-না-তাকাতে সবাই ভ্যানিশ। সত্যি কথা বলতে কি, আজাদ হিন্দ সরকারের আমলে যত না শোনা যেত, অকুপেশনের পর শহরের আকাশ-বাতাস 'জয়হিন্দ' ধ্বনিতে ঢের বেশী মুখরিত হয়ে উঠল।

এই ধরনের জ্বালাতন করা বা উত্যক্ত করা ছাড়া অন্য গুরুতর ভূমিকাতেও বালসেনারা সে সময়ে ছিল। শত্রুশিবিরে সাবোটাজের ঘটনা ঘটেছিল কতকগুলো, তাতেও বালসেনাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল।

মিঃ মাত্তা বুঝিয়ে বললেন, বালসেনাদের দিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদলে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকৃত দেশপ্রেমিক স্বরূপ তুলে ধরা। এটা যে আমরা জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করছিলাম তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি পেলেও অনেক সময় আমরা ছোট বলে পার পেয়ে যেতাম। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের প্রশ্রয়ও পেতাম। ওরা যখন আমাদের কাছে নেতাজী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ

সম্পর্কে কোন কথা বলত, আমরা সুযোগ পেয়ে লেকচার দিয়ে দিতাম। আমরা যা সত্যি বলে জানি, দেখেছি, আন্তরিকতার সঙ্গে সেসব গল্প বলতাম। আমাদের লেকচার দেওয়া, গান গাওয়া, সময়ে অসময়ে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দেওয়া, সবকিছু মিলে ওদের মনে নিশ্চিতভাবে একটা প্রভাব পড়েছিল।

যুদ্ধোত্তরকালে বালসেনাদের ভূমিকা সম্পর্কে মিঃ মাত্তার বক্তব্যে একটা যুক্তি আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। বালসেনারা ইতিহাসে উপেক্ষিত, ওঁর এই অভিমান দূর করার জন্য ওঁকে এবং ওঁর সহযোগীদের আমরা আমন্ত্রণ জানালাম।

ব্যাংককে এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি বেশ উৎসুক ছিলাম। তার নাম ওয়ালটার মায়ার। নেতাজীর সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল শুনেছিলাম। জার্মানীতে নেতাজীর জার্মান সহযোগী দেখেছি কিন্তু এই ব্যাংকক শহরে নেতাজী একজন জার্মান সহযোগী আছেন শুনে কৌতূহল হয়েছিল। মায়ারের সঙ্গে অনেক দিন আগে থেকেই যোগাযোগ হয়েছিল, তবে আমার সঙ্গে চোখের দেখা কখনো হয়নি।

আমাদের আসার খবর পেয়ে মায়ার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ পাঠালেন। সেদিন আমি যেতে পারিনি। সময় কম, মনে হল হয়ত আর দেখা হওয়া হয়ে উঠবে না। কিন্তু মায়ার নিজেই দেখা করতে এলেন। হোটেলের শপিং আর্কেডে একটা হাতির দাঁতের বুদ্ধমূর্তি কেনার চেষ্টা করছিলাম। থাই বুদ্ধ আবার অন্যান্য বুদ্ধের চেয়ে একটু অন্য চেহারার। এমন সময় পিছনে গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে দেখি এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক। আলাপ হল, ওয়াল্টার মায়ার।

অমনি বুদ্ধ-টুদ্ধ ফেলে লাউঞ্জে ফিরে এলাম। এসেই সাংবাদিকদের ভঙ্গীতে কলম আর প্যাড নিয়ে প্রশ্ন করতে বসলাম। আপনার একটা ছবি চাই, বললাম। প্রশ্ন বা ছবি কিছুতেই আপত্তি নেই।

'যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সাংহাইতে পোস্টেড', প্রশ্নের জবাবে মায়ার বললেন। 'হ্যাঁ, ইন্টেলিজেন্স-এর কাজই বলা চলে। আমার ছিল

listening post। সেটা কী জিনিস ? সেটা হল ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন রেডিও ব্রডকাস্ট শুনে তার রিপোর্ট পাঠানো। তা ইতিমধ্যে জার্মানী থেকে খবর এল, ব্যাংককে কিছু কিছু 'ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট' হতে চলেছে, তাই ব্যাংককে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। নেতাজী তখনো এসে পৌঁছননি। উনি বার্লিনে আছেন।

বার্লিনে তখন জার্মান ফরেন অফিসের শাখা স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশন কাজ করতে শুরু করেছে। এই স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের চীফ হলেন অ্যাডাম ফনট্রট্ আর সহকারী আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ। আরো যাঁরা ছিলেন তারা আলস্‌ডর্ফ, আসমান, ফুর্টওয়াংগ্‌লার, লিপোল্‌ড, ট্রাম্প প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন এক এক দিকের এক্সপার্ট। ফুর্টওয়াংগ্‌লার-এর নাম করলেন মায়ার। ফুর্টওয়াংগ্‌লার ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন লীডার।

যা হোক, জার্মানী থেকে নির্দেশ পেয়ে চীন থেকে ব্যাংকক চলে এলেন মায়ার। উনি চুংকিং থেকে ব্যাংকক এসেছিলেন জার্মান মিনিস্টার ব্যারণ ফন প্লাসেন-এর সঙ্গে। সেইসময় ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ওঁর প্রথম যোগাযোগ হল। নেতাজী ১৯৪৩ সালের আগস্টে ব্যাংককে থাকার সময় মায়ারের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের শুরু। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের নানা কাজের সঙ্গে মায়ার জড়িত হলেন। মায়ার মানুষ হিসেবে ভারতীয় এবং থাই সকলের প্রিয় হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। উনি থাই মেয়ে বিয়ে করেছেন। তাই পরবর্তীকালেও দেশে ফেরা আর হয়ে ওঠেনি। ব্যাংককে এসে নেতাজী যখন পিবুল সংগ্রামের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন থেকে নানারকম ডিপ্লোমেটিক কার্যকলাপ শুরু হল। তার অনেক কিছুর সঙ্গে মায়ার জড়িত ছিলেন। তাই যখনি নেতাজী এসেছেন ব্যাংককে, মায়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

শেষবার দেখা হল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে। এই দেখা হওয়ার কথা মায়ার বার বার বললেন। মায়ার বললেন, আমরা জানতাম জাপানের পরাজয়ের পর নেতাজী রাশিয়ার সাহায্য নিতে চলেছেন। হ্যাঁ, উনি

মাঞ্চুরিয়া যাবেন এবং একবার গিয়ে পৌঁছলে যা হোক ব্যবস্থা করতে পারবেন আশা করছিলেন। মায়ার বললেন, আমি এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম।'

'কিন্তু কেন?' আমরা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ওয়েল, আমার মনে হয়েছিল উনি মস্ত বড় রিস্ক নিতে চলেছেন। আমি মনে করতাম আর ওঁকে বলেওছিলাম যে, সোভিয়েট রাশিয়া ওঁর প্রতি ফ্রেণ্ডলি হবে না।"

আমরা ওঁকে বিকল্প পরিকল্পনাও দিয়েছিলাম। নেতাজীর অবশ্য এ বিষয় নিজস্ব একটা মত ছিল। উনি বলতেন, যদিও কার্যগতিকে রাশিয়া ও অ্যাংলো-আমেরিকানরা এক শিবিরে ভিড়েছে, আসলে তো অন্তরে কোন মিল নেই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এরা দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে আর স্বার্থের সংঘাত বাধবে। আমার জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে। আমি তো ইংরেজ-আমেরিকানের সঙ্গে যেতে পারি না। আমি রাশিয়ার সঙ্গে যাব আর রাশিয়ারও আমাকে প্রয়োজন হবে।

মায়ারের সঙ্গে এইসব কথাবার্তা খুব গুরুত্বপুর্ণ মনে হল আমাদের। এমন কি আজকের দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও নেতাজীর কথাগুলো অবান্তর নয়। মায়ার বললেন, "দেখো, নেতাজীর অ্যানালিসিস্ যে ঠিক তা আমরা যুদ্ধোত্তরকালে দেখেছি। সেই দুই শিবির হয়ে গেল, কোল্ড ওয়ার চলল। আজও তার জের চলছে। তবুও তখন আমাদের কাছে নেতাজীর রাশিয়া যাওয়ার প্ল্যান ভাল মনে হয়নি। ওদিক থেকে কোন আশ্বাস তো উনি পাননি, বরং যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একবার গিয়ে পড়লে হয়ত উনি অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষ বেলায় অজানা, অচেনা পরিবেশে এইভাবে যাওয়া খুব অনিশ্চিত ও রিস্‌কি।"

আপনাদের বিকল্প পরিকল্পনা কী ছিল!—জানতে চাইলাম। 'কেন, সব ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল। ব্যাংককের বাইরে এক স্বাস্থ্যনিবাসে ওঁকে লুকিয়ে রাখা হবে কিছুকাল। আমি বলেছিলাম, নেতাজী, আপনার গায়ে হাত দিতে ব্রিটিশরা এমনিতে সাহস পাবে না আর একবার আজাদ হিন্দ

ফৌজের কথা, স্বাধীন ভারত সরকারের কথা আপনার দেশে প্রচার হয়ে গেলে ওদের পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে কিছু করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আপনি কিছুদিন আণ্ডারগ্রাউণ্ড হয়ে থাকুন, তারপর বেরিয়ে আসবেন। আণ্ডারগ্রাউণ্ড হওয়ার পক্ষে থাইল্যাণ্ডের চাইতে উপযুক্ত জায়গা তখন হতে পারত না। এখানে ওঁর নিজের লোকজন রয়েছে চারপাশে। থাই সরকার নেতাজীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন শুধু নয়, শ্রদ্ধাশীলও। এইসব ফেলে কেন উনি অজানা পরিবেশে, যেখানে উনি ওয়েলকাম কিনা জানা নেই, যেতে যাবেন!

দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করে মায়ার বললেন, কিন্তু উনি তো কথা শুনলেন না, নূতন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে চাই বৃহৎ কোন শক্তির সাহায্য—এই ছিল ওঁর মত।

মায়ারকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে বললাম, পিছন ফিরে দেখে আজ মনে হচ্ছে, আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিলেই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল হত।

॥ ২৯ ॥

ব্যাংককের থাই-ভারত কালচারাল লজ-এ একদিন বড় করে বৈঠক বসল। সেখানে এলেন সর্দার ঈশ্বর সিং নিরুলা, দর্শন সিং বাজাজ, নারায়ণ সিং চাওলা, হরবন্‌স্ লাল, প্রীতম সিং কুকলেচা, মিঃ মাত্তা এবং আরো অনেকে। থাই-ভারত কালচারাল লজ-এর বর্তমান নানা ধরনের কাজ-কর্মের মধ্যে ভারতীয় যোগ-ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়াও একটা কাজ! ওদের যোগ-শিক্ষক মিঃ তালুকদারও উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বর সিং নিরুলা প্রবীণতম। মাথায় শুভ্র পাগড়ি, শুভ্র পোশাক, তার সঙ্গে মানানসই ধপ্‌ধপে দাড়ি-গোঁফ, ভারী সম্ভ্রান্ত চেহারা। ঈশ্বর সিংকে বেশ

কিছুকাল আগে কলকাতায় দেখেছিলাম, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর উনি একজন সদস্য।

কথাবার্তা শুরু করে দিলেন ঈশ্বর সিং। তারপর সকলে তাতে যোগ দিলেন। নেতাজী যখন স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গড়লেন, তখন ব্যাংকক থেকে তু'জন ক্যাবিনেটে ছিলেন—একজন দেবনাথ দাস, অপরজন ঈশ্বর সিং। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, ব্যাংকক যুদ্ধের দিনের সব জায়গার অভিজ্ঞতাই ওঁর আছে। রেঙ্গুনের পতনের পর ওঁদের মনে হল, সবকিছু বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নেতাজী বললেন, না, আমরা শুধু প্রথম রাউণ্ডে হেরেছি। রেঙ্গুন থেকে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের দপ্তর সরিয়ে নিয়ে আসা হল ব্যাংককে।

আসবার আগে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের ও আর্মির প্রতিনিধিরা যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তার সব নির্দেশ রেখে এলেন নেতাজী। মেজর জেনারেল লোগোনাথন্ রইলেন গভর্নমেণ্টের ভার নিয়ে। আর সামরিক বাহিনী থেকে কর্নেল থিমায়া রইলেন ওঁর সহকারী হিসেবে। তুই থিমায়া ভাইদের নিয়ে এই সময়ের একটা কাহিনী আছে। ব্রিটিশ অকুপেশন ফোর্স যখন রেঙ্গুন এসে পৌঁছল তখন ব্রিটিশ ভারতীয় অফিসার কর্নেল থিমায়া এলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের দপ্তরে সারেণ্ডার সংক্রান্ত কথা-বার্তা বলতে। এসে দেখলেন, এদিকে রয়েছেন তাঁরই নিজের ভাই আই. এন. এ.-র কর্নেল থিমায়া। তুই ভাইয়ে অনেকদিন পর দেখা হল। মেজর লোগোনাথন্ বলেছেন, ওঁরা জাপানীদের সঙ্গে একসঙ্গে সারেণ্ডার করবেন না। ওঁর হলেন অন্য রাষ্ট্র, ওঁদের সারেণ্ডার হবে আলাদা। এইসব নিয়েছিল আলোচনা। আই. এন. এ.-র কর্নেল থিমায়া বললেন, যদি মেজর লোগোনাথনের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালাতে হয় তাহলে মিলিটারি নিয়মমত মেজর জেনারেল র‍্যাংকের কোন অফিসারকে আসতে হবে। তাঁর ভাই তো তাঁরই মত কর্নেল মাত্র, অতএব ওঁকে তো উনি লোগোনাথনের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। অতএব পরদিন একজন ব্রিটিশ মেজর জেনারেল এলেন।

চলে যাবার আগে নেতাজী আজাদ হিন্দ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার ভাদুড়ীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বর্মার নাগরিক যাঁরা এই ব্যাংকে টাকাকড়ি জমা রেখেছেন, তাঁদের যেন হিসেব মত সব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ভাদুড়ী সেইমত কাজ করেছিলেন। এ-ছাড়াও নেতাজীর নির্দেশে বর্মা সরকারকেও বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়। কারণ বর্মা সরকার তীব্র সংকটে পড়েছিলেন, কর্মচারীদের মাইনে-পত্র দিতে পারছিলেন না।

মোটের উপর সারেঙার খুব সুশৃঙ্খল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে হলেও বিজয়ী সেনাবাহিনী বিজিতের উপর কিছু নির্যাতন করেই থাকে। ১লা মে, ১৯৪৫-এ ব্রিটিশ অকুপেশন আর্মি যখন মার্চ করে রেঙ্গুনে ঢুকল তখন বাধা দেবার কেউ ছিল না, বাধা কেউ দেয়ওনি। তবে শহরের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী জিন্দাবাদ এই ধরনের কিছু ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। এতে বিরক্ত ব্রিটিশ অফিসাররা আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের জন্য 'ফেটিগ ডিউটি' শাস্তি দেন—যেমন জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ ইত্যাদি। লোগোনাথনের দপ্তর থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

নেতাজী ব্যাংককে এসে আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তর গুছিয়ে বসলেন। ওঁর কানে যখন যুদ্ধবন্দীদের ওপর অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছল, উনি ব্যাংকক থেকে ১৭ মে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। উনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সিপাইরা যারা বর্মাতে যুদ্ধবন্দী হয়েছে, তাদের প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনিতে ব্রিটেন তো সব সময় জার্মানী ও জাপান যুদ্ধবন্দীদের প্রতি কী রকম খারাপ ব্যবহার করছে বলে হই-হই সৃষ্টি করে অথচ এখন তারা নিজেদের কাজের ব্যাখ্যা কী ভাবে দেবে! প্রয়োজন হলে আমরাও এর পাল্টা ব্যবস্থা নেব বলে উনি প্রতিপক্ষকে সতর্ক করলেন।

রেঙ্গুন থেকে নেতাজীর সদলবলে বিখ্যাত রিট্রিট শুরু হয়েছিল ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে। অসহনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সেই রিট্রিট বলা যায় শেষ হল ৩ই মে, ১৯৪৫ সালে। সকলে সেদিন ব্যাংককে পৌঁছেছেন।

একদিনও সময় নষ্ট হতে দেওয়া হল না। মেজর জেনারেল ভোঁসলে ও জামান কিয়ানি সেদিনই পুনর্গঠনের কাজ শুরু করলেন। বর্মা-থাই বর্ডারে নূতন করে সেনা সমাবেশ করা হল। সেখানে ভার নিলেন কর্নেল ঠাকুর সিং।

ব্যাংককের স্বল্পস্থায়ী গৌরবময় অধ্যায় সম্পর্কে ঈশ্বর সিং, দর্শন সিং বা নারায়ণ সিং সকলেই সমান সচেতন। মে থেকে আগষ্ট এই ক'মাস অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সীট ছিল এই শহরে। অবশ্য নেতাজী যে সর্বক্ষণ সেখানে থাকতেন তা নয়। শেষবার এলেন ১৬ আগস্ট আর ব্যাংকক ছেড়ে গেলেন ১৭ আগস্ট ভোরবেলা। সেই শেষ দিনটিতেও বিমানবন্দরে নেতাজীকে অল্প যে ক'জন গুডবাই বলতে এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বর সিং আর রঘুনাথ শাস্ত্রী।

থাই-ভারত কালচারেল লজ-এর মিটিং-এ দর্শন সিং বাজাজ প্রথমদিকে চুপ করে ছিলেন। তারপর কথা বলতে শুরু করলে দেখা গেল, উনি ছিলেন সেসময়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের একজন আন্তরিক কর্মী। কী করে ব্যাংককের ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, কী করলে সংগঠন আরো শক্তিশালী হয় এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ওরই মধ্যে নেতাজীর ঘুমের একটা গল্প বললেন দর্শন সিং বাজাজ। বলছিলেন, নেতাজী ঘুমোতেন খুব কম, সময়ই বা পাবেন কোথায়! কিন্তু দৈবাৎ যখন ঘুমোতেন তখন সে ঘুম হত গভীর, কেউ জাগাতে পারত না। একবার তো খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছেন নেতাজী। দর্শন সিংকে ডেকে বললেন, একটা বুটের খুব দরকার। মুচিকে খবর দাও, পায়ের মাপ নেবে। আর কাল সকালের মধ্যে বুট চাই। দর্শন সিং বললেন, আমি তো এক জুতো তৈরির কারখানার কর্মীকে নিয়ে এলাম। এসে শুনি নানারকম মিটিং, নানাধরনের কাজ শেষ করে নেতাজী একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আগের রাতেও সারারাত কাজ করেছেন। আমরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বেশী দেরী হলে কাল সকালের মধ্যে বুট তৈরি হবে না। এদিকে ওঁর স্টাফের লোকেরা বললে যে, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, এত ক্লান্ত হয়ে শুয়েছেন, আমরা এখন ডাকতে পারব না।

দর্শন সিং পড়লেন মুশকিলে। ডেকে তুললে কী নেতাজী রেগে যাবেন?

না-ডেকে দিলেও তো রাগ করবেন ! শেষে অনুমতি নিয়ে উনি নিজেই ঘরের ভিতর ঢুকলেন। দর্শন সিং আবার বললেন, ঘরে ঢুকে গলা খাঁকারি দিলাম, চেয়ারটা, এটা-ওটা টেনে নিয়ে নানারকম আওয়াজ করতেও কোন ফল হল না। তখন আস্তে করে পায়ে হাত দিলাম। অমনি নেতাজী উঠে বসলেন। 'এ-কী, এত দেরি হয়ে গেছে ডেকে দাওনি কেন', বলে রাগ করলেন। যাহোক, পায়ের মাপ পাওয়া গেল, পরদিন সকালে বুট জোড়াও রেডি হয়ে গেল।

নারায়ণ সিং চাওলা, হরবন্‌স লাল, মাত্তা সকলেই একে একে তাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বললেন। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, ব্যাংককে যেসব আজাদ হিন্দ কর্মী রয়েছেন, তাঁদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ আর অভিমান রয়েছে। আমাদের কথা দেশবাসী মনে রাখেনি—ভাবটা হল এইরকম। এঁরা যে কোন প্রতিদান চান তা নয়। তবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এঁদের জন্য একটু ঠাঁই হবে এইটুকু ওঁরা চান।

ওঁরা বললেন, যুদ্ধের ঠিক পর-পরই, বিশেষত লালকেল্লার বিচারের পর কিছুদিন যেন একটা হুজুগ ও মাতামাতি চলল। সে সময়ে দেশ থেকে অনেকে ব্যাংককে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাংবাদিকও ছিলেন কেউ-কেউ। বেশির ভাগ বম্বে অঞ্চলের। তখন আমরা তাঁদের হাতে অনেক ছবি, ডকুমেণ্ট ইত্যাদি তুলে দিয়েছিলাম। ফলে সে সব কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল জানতে পারলাম না।

ওঁরা দাবি করলেন, আজও প্রবাসে আমরা নেতাজীর স্পিরিট বাঁচিয়ে রেখেছি। পরস্পর দেখা হলে আমরা 'জয় হিন্দ' বলে সম্বোধন করি, টেলিফোনটা তুলে 'জয় হিন্দ' বলি। আজকের দিনে যে সব ভারতীয় আসেন আমরা দেখেছি তাঁদের 'জয় হিন্দ' বললে তাঁরা থতমত খেয়ে যান। তোমাদের কাছে 'জয় হিন্দ' শুধু মিটিং-কা বুলি, আমাদের কাছে সেটা আমাদের জীবনেরই একটা দিক।

আমার মনে হল, আমাদের কাছে নানান কথা বলে ওঁরা একটু হালকা হলেন। একটি থাই মেয়ে চা আর মিষ্টি পরিবেশন করতে শুরু

করল। কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরল। থাই-ভারত কালচারেল লজ একটি বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। এর গোড়ার দিকের কর্মী হলেন সত্যানন্দ পুরী ও দেবনাথ দাস। থাই গভর্নমেণ্টের কাছ থেকেও ওঁরা সেই পিবুল সংগ্রামের দিনগুলির থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঐকান্তিক সহযোগিত পেয়ে এসেছেন।

এদিকে ব্যাংকক শহর কি মোটেও দেখা হবে না? বন্ধুরা ভেবে ঠিক করলেন আমরা যদি ফ্লোটিং মার্কেট বা বলা যায় ভাসমান বাজার দেখতে যাই, তবে একই সঙ্গে ব্যাংকক শহরের চেহারা কিছু দেখা হয়ে যাবে। সব চাইতে সুবিধা হল হাঁটাহাঁটি নেই, গাড়িতে ওঠা-নামা নেই। নৌকোতে চুপচাপ বসে থাকলেই চলবে।

অতএব একদিন চৌপাহিয়া নদীর তীরে এসে মোটর লঞ্চে উঠলাম। নদীর দু'পাশে শহর। এ-যেন অনেকটা শিকারা চড়ে ডাল হ্রদে ঘুরে বেড়ানোর মত। নৌকো যখন একটু ভিতর দিকে প্রবেশ করল, তখন কিন্তু বড় দারিদ্র্য চোখে পড়ল! দু'দিকের ঘর-বাড়ি হতশ্রী। ছোট-ছোট ছেলেরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এসে ভিক্ষে চাইছে। অনেক মোটর লঞ্চে বিদেশী ট্যুরিস্ট ছবি তুলছে। ছোট ছেলেরা দু'চারটে ইংরেজি কথা বলছে, ভেরি পুওর, ভেরি পুওর বলছে। দেখে আমার মনটা খারাপ হল, নিজের দেশের কথাও মনে পড়ল।

আমাদের দেশের মতই প্রাচীন ঐতিহ্য আর বর্তমান দারিদ্র্য পাশাপাশি রয়েছে। মাঝে মাঝে নৌকো তীরে ভিড়ছিল। অতি সুন্দর মন্দির, ভিতরে বুদ্ধমূর্তি, ট্যুরিস্টরা নেমে নেমে দেখে আসছেন। ফ্লোটিং মার্কেট অবশ্য সত্যি ফ্লোটিং নয়। যদিও ঐ এলাকাতে যেতে ছোট-ছোট নৌকোতে ফুল, ফল, সব্জি ফেরি করছে বৃদ্ধা মহিলা বা ছোট ছেলেরা —এমনি দৃশ্য চোখে পড়ল। কিন্তু আসল ফ্লোটিং মার্কেট হল তীরে। নৌকো থেকে নেমে নদীর ধারে ছোট বাজার, যেন আমাদের রথের মেলা। কেনাকাটার জিনিসও তেমন চোখে পড়ল না।

ফ্লোটিং মার্কেট এলাকার পর সংকীর্ণ নদী আবার প্রশস্ত ও বিশাল

হয়ে পড়ল। এরপর নৌকো থামল অরুণদেবের মন্দিরে, ইংরেজিতে বলে টেম্পল অব্ ডন্। সুবিশাল মন্দির, মন্দিরের চত্বরে আরো ছোট-ছোট মন্দির ও মূর্তি। অরুণদেবকে দর্শন করিয়ে নৌকো আমাদের ব্যাংকক শহরে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

॥ ৩০ ॥

ভারতের বাইরে দেশের স্বাধীনতার যে সশস্ত্র সংগ্রাম নেতাজী গড়ে তুলেছিলেন '৪৫ সালের আগস্ট মাসে, জাপানের আত্মসমর্পণের পর সে সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেল। নেতাজী অবশ্য পরাজয় স্বীকার করলেন না। অপর এক খ্যাতনামা যোদ্ধার উক্তি পুনরুল্লেখ করে বললেন, "That army is beaten which considers itself beaten"—অর্থাৎ যে সেনাবাহিনী নিজেকে অপরাজেয় মনে করে, তার কখনোই পরাজয় হতে পারে না। নেতাজী বললেন, শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখতে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজরা তো মনে হয়েছিল একেবারে পরাজিত হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ইউরোপের রণাঙ্গনেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, আবার এশিয়াতে জাপান ও আই. এন. এ. তো ভারতের পূর্ব প্রান্তে। তাই বলে তারা তো হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি। ফিরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাই নেতাজী বললেন, পরাজয় কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা আমরা আমাদের শত্রুপক্ষের কাছে শিখব।

অবশ্য পরাজয়ে মনোবল অটুট রাখা এক কথা আর বাস্তবক্ষেত্রে সামরিক বিপর্যয় অন্য ব্যাপার। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা প্রতিকূল অবস্থায় যথেষ্ট সাহস ও সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, সামরিক বিপর্যয় আরো আগেই শুরু হয়েছিল। সেই '৪৪ সালের ১০ই জুলাই যখন ইম্ফল যুদ্ধে রিট্রিটের অর্ডার হল, তখন থেকেই

প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজকে।

'৪৩ সালের অক্টোবরে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা। মাস দুই গেল সবকিছু গুছিয়ে নিতে। ডিসেম্বরের শেষ ক'দিন.নেতাজী গেলেন আন্দামানে। আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে নিজস্ব ভূখণ্ডও পাওয়া গেল। দ্বীপ দুটির নবজন্ম হল শহীদ ও স্বরাজ নামে। '৪৪ সালের প্রথম ছ'মাস আজাদ হিন্দ বাহিনীর গৌরবময় অধ্যায়। জানুয়ারীতে সিঙ্গাপুর থেকে সরকারের দপ্তর সরে এল রেঙ্গুনে। প্রতিদিন দলে দলে সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়ে যাচ্ছে। নেতাজী তাদের বিদায় জানাচ্ছেন, বিদায় ভোজ হচ্ছে। সাধারণ সৈনিকের হাতেও তুলে দিচ্ছেন বিদায় উপহার—এক টুকরো সাবান, একখানা রুমাল। চারিদিকে উদ্দীপনা। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তারাও ফ্রন্টে যেতে চায়।—নেতাজীকে আবেদনপত্র দিয়েছে রক্ত দিয়ে সই করে।

ফেব্রুয়ারী মাসেই আরাকান ফ্রন্ট থেকে জয়ের খবর এসে পৌঁছল। কর্নেল মিশ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সেভেনথ্ ডিভিশনকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কর্নেল মিশ্র সর্দার-ই-জঙ্গ উপাধি পেলেন। ডকুমেণ্টারি ছবিতে দেখেছি, কর্নেল মিশ্রকে নেতাজী মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন। মিশ্র এর পরের যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান।

এই সময় একটার পর একটা সাফল্যের খবর আসতে লাগল। নেতাজীর পাঠানো, মেজর স্বামীর নিজের হাতে ট্রেনিং দেওয়া একটি ইনটেলিজেন্স দল সাবমেরিনে ভারতবর্ষে নির্বিঘ্নে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে। তাদের সঙ্গে সরাসরি রেডিও কনট্যাক্ট হল।

এরপর খবর এল, ১৯শে মার্চ বর্ডার পার হয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের মাটিতে পা রেখেছে। এই খবরে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল। যেসব সৈনিকেরা দেশের মাটিতে প্রথম পা রাখল, তারা নিজেরাও অভিভূত। কেউ দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে, কেউ বা মাটি তুলে পরস্পরকে হোলির আবিরের মত মাখিয়ে দিচ্ছে।

বাহাদুর গ্রুপের সৌকত মালিক ঢুকে গেলেন মণিপুরের বিষেণপুর এলাকায়। ইম্ফলের অল্প দূরে ময়রাং-এ সৌকত মালিক ভারতবর্ষের

তেরঙা পতাকা তুললেন। সব জয়ের জন্য মূল্য দিতে হল অনেক। জাপানীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, বিশেষত ইমফল্ অপারেশন যখন প্ল্যান করা হচ্ছে, তখন মেমিওতে জেনারেল মুতাগুচির সঙ্গে বৈঠকে নেতাজী বললেন, the first drop of blood to be shed on Indian soil must be that of an Indian। শুধু first drop of blood কেন, রক্তের নদী বয়ে গেল।

ব্রিটিশ মিলিটারি বইতে দেখেছি, বিষেণপুর এলাকায় যে যুদ্ধ হয়েছিল, ওরা বলছে সেখানে সবচেয়ে বেশী গোলাগুলি চলেছিল আর প্রাণহানি হয়েছিল অসংখ্য। পরবর্তীকালে যখন ময়রাং বিষেণপুর-চূড়াচাঁদপুর যাই, গ্রামবাসীরা জানায় যুদ্ধের পর ভূতের উপদ্রব হয়েছিল তাদের ওখানে। তারপর তারা পুজো দিল, সব অকালমৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করল। তারপর নাকি ভূতের উপদ্রব কমে গেল।

ইম্ফল এলাকার আশেপাশে প্যালেল, টামু মোরে সব জায়গায় তুমুল যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল। এপ্রিল থেকে জুন তিন মাস সমগ্র এলাকা আজাদ হিন্দ বাহিনীর অধিকারে ছিল। জাপানীদের সঙ্গে চুক্তি ছিল যে সব ভারতীয় এলাকা অধিকৃত হবে, তার শাসন-ব্যবস্থা থাকবে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জিকে অধিকৃত এলাকার শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করা হল। প্রকৃতপক্ষে ইম্ফল এলাকায় সৌকত মালিকই কাজ চালিয়ে নিলেন।

ওদিকে কোহিমার দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন শাহনওয়াজ খান। হাকা-ফালাম অঞ্চলে তাঁর বাহিনী খুব ভাল কাজ দেখিয়েছিল। সেই সময় একটা বিশেষ যুদ্ধে মেজর মেহবুব আমেদের উল্লেখযোগ্য জয় হয়েছিল। শত্রুপক্ষকে হটিয়ে দেবার পর খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্রসহ একটা বিরাট ঘাঁটি ওদের দখলে আসে।

এরপর ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঘনঘোর মেঘে বর্ষা এসে পড়ল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ও জাপানীদের সাপ্লাই লাইন ভেঙে পড়ল। ঘাসসেদ্ধ আর বিছানার মশারি নদীর জলে ফেলে মাছ ধরে তাই

একটু মিশিয়ে নিয়ে দিনের পর দিন খাওয়া। এই খাওয়া খেয়ে যুদ্ধ করা কতদিন চলে! ওদিকে এরোপ্লেনে করে সাপ্লাই আসছে শত্রুপক্ষের। আকাশ থেকে পড়ছে খাবার-দাবার। তাও নিজেদের কঠিন অবস্থার কথা শত্রুপক্ষের কাছে গোপন রেখে অনেকদিন চালানো গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। কয়েকজন দলত্যাগী অফিসার অপরপক্ষে যোগ দেন আর শত্রুপক্ষ এদিককার আসল অবস্থা, এমনকি সেনাবাহিনীর অবস্থান সবই জেনে ফেলে।

এরপরও কিন্তু একটি যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ জয়লাভ করল। দলত্যাগী অফিসারের জায়গাতেই কম্যাণ্ডার হয়ে এলেন আবিদ হাসান। আবিদ হাসান-এর নেতৃত্বে প্রথম যে 'এনকাউন্টার' হল তাতে ব্রিটিশরা পিছু হটে যায়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সৈনিকদের মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এরকম তারা সাধারণত করত না।

তবুও ১০ই জুলাই ইম্ফল রণক্ষেত্র থেকে রিট্রিটের আদেশ যখন এল সেটাই হল প্রথম পরাজয়। এই পরাজয়ের ধাক্কা ভবিষ্যতে আর সামলাতে পারা গেল না। ভারতবর্ষের মাটি থেকে সরে এসে বর্মার অভ্যন্তরে আবার বার বার শত্রুকে ঠেকানোর চেষ্টা হল। ধীলনের নেহরু ব্রিগেড ইরাবতী নদীর তীরে একবার প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নেতাজী নিজে শাহনওয়াজের সঙ্গে যুদ্ধ এলাকায় ঘুরেছিলেন। তবুও সামরিক বিপর্যয় ঠেকানো গেল না।

অবশেষে রেঙ্গুন থেকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে রিট্রিট। নানা কারণে স্মরণীয় সেই রিট্রিটের শেষে ব্যাংকক হল আজাদ হিন্দ সরকারের ঘাঁটি।

ব্যাংককে ঈশ্বর সিং নিরুলা, দর্শন সিং বাজাজ প্রভৃতি সকলেই আমাদের বললেন, থাইল্যাণ্ডের সরকার এবং জনসাধারণ সর্বদা নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। এর মূলেও ছিল নেতাজীর গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক। সেই যে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবার পরই নেতাজী ব্যাংকক সফরে এলেন, তখনি উনি পিবুল সংগ্রাম থেকে শুরু করে থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ অফিসার ও অন্যান্য ডিপ্লোমেটদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব কাজ

গুছিয়ে রেখে গেলেন। তখন তো আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও তখনি নেতাজীকে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান দেখিয়েছিল থাইল্যাণ্ড।

জাপানী ডকুমেণ্টও বলছে দুই দেশের মধ্যে বিশেষত প্রধানমন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম ও নেতাজীর মধ্যে "plenty of goodwill and understanding" গড়ে উঠেছিল। আবার নেতাজীর ইংরেজ জীবনীকার হিউ টয়ও দুই দেশের সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দামানের দখল নেবার পর কয়েক-দিনের জন্য নেতাজী ব্যাংককে এসেছিলেন। ব্যাংককেই উনি লোগোনাথনকে ডেকে বললেন, তাঁকে আন্দামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাংকক সফরের কথা বলতে গিয়ে ইংরেজ জীবনীকার বলছেন— The Siamese were at their best, charming, hospitable, generous, eager to do honour to one who none dared doubt, would soon march invincibly into India.

ঘুরে-ফিরে ব্যাংককে নেতাজীর শেষদিনটির কথা এসে পড়েছিল। ১৬ই আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ ব্যাংকক বিমান-বন্দরে নেতাজী নামলেন। কিন্তু কেউ নিতে আসেননি। কেউ তো জানত না উনি আসছেন। ওঁরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশ দেরী করে মেজর জেনারেল ভোঁসলে গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছলেন।

কিন্তু একবার যেই নেতাজীর আসার খবর রটে গেল, দলে দলে মানুষ এসে বাড়িতে ভিড় করল। তিল ধারণের জায়গা রইল না। আই. এন. এ'র লোকজন ও কর্মীরা তো আছেই, আর ব্যাংককের ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যাঁরা ছিলেন আন্দোলনের সমর্থক—তাঁরাও ভিড় করলেন। সকলেই জানতে চান, এবার কী হবে! আর একটা জটিল প্রশ্ন, নেতাজী কী করবেন!

নেতাজী ব্যাংককে থাকলেই অনেকে সুখী হতেন। এ বিষয়ে ওয়াল্টার মায়ার যা বলেছিলেন তার সমর্থন অন্যান্যদের কথায়ও পাওয়া গেল। আত্মগোপন করার পক্ষে ব্যাংকক আদর্শ স্থান ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন আগে থেকেই তো ভারতীয় বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে আসছে ব্যাংকক। দেবনাথ দাস-এর কাছেও শুনেছি, ব্যাংককে নেতাজীকে লুকিয়ে

রাখার বিভিন্ন পরিকল্পনা ওঁদের ছিল।

জুনের গোড়াতে প্রিন্স ওয়াইথিয়াকর্ণ একবার নেতাজীকে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকেন। সেখানে থাই সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন থাই-ভারত কালচারেল লজের প্রেসিডেন্ট অনুমান রচোধন, ইনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। সেই চায়ের আসরে এঁরা নেতাজীকে বলেন, যদি জাপান যুদ্ধে হেরে যায়, থাইল্যাণ্ড নেতাজীকে বিপদের সময়ে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। নেতাজী ওঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সত্যি যদি প্রয়োজন দেখা দেয় আজাদ হিন্দ সরকারের তরফে দেবনাথ দাস ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। অনুমান রচোধনকে থাইল্যাণ্ডের লোকেরা বলত ঋষি, তাঁর কথার মূল্য অনেক। অপর দু'জনের তো কথাই নেই।

দেবনাথ দাস কোন বৌদ্ধ মন্দিরে নেতাজীর আত্মগোপনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাংককের বিখ্যাত মন্দির ওয়াট মহাথাটের পুরোহিত ছিলেন নেতাজীর একজন ভক্ত। তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে একবার বলেছিলেন—বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন তা তো আমরা জানি না, তবে তোমরা সুভাষকে দেখো। থাই রাজ-পরিবারের যিনি কুল-পুরোহিত মহায়োং—তিনিও দেবনাথ দাসকে সাহায্য করতে চাইলেন। নেতাজী রাজী থাকলে বৌদ্ধমন্দিরে গোপনে তাঁর থাকার সব ব্যবস্থা হবে। দরকার মত চারদিকে দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের পাওয়া যাবে, আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য পাওয়া যাবে।

দেবনাথবাবু বলতেন, নেতাজীকে বলেই ইনি এইসব ব্যবস্থার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্ল্যান তো হল অন্যরকম। ১৬ই আগস্ট রাত্রে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশজন অফিসার নেতাজীর বাড়িতে রয়ে গেলেন। মাঝরাত্রে সকলে সামান্য কিছু খেলেন। তারপরও ভোর অবধি কথাবার্তা, কাজকর্ম চলছিল। নেতাজীর চিন্তা আবার মাত্র কয়েকজন রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়ে ব্যাংককে রয়ে গেছে তাদের নিয়ে। ভোর পাঁচটায় নেতাজী এক ঘণ্টার জন্য শুতে গেলেন। ঘুমিয়েছিলেন কিনা তা কেউ জানে না।

যদিও আয়ার শুয়ে ছিলেন কাছেই আর একটা খাটে। আয়ার উঠবার আগেই নেতাজী উঠে তৈরি হয়ে গেছেন।

১৭ই আগষ্ট ১৯৪৫ সাল। ব্যাংকক বিমান বন্দরে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বর সিং, রঘুনাথ শাস্ত্রী, ভাস্করণ, আরো অনেকে। এরোপ্লেনে উঠলেন হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস আর আয়ার। বিমান বন্দরে সকলকে নেতাজী একবার করে জড়িয়ে ধরলেন। নেতাজীর এবং অন্য সকলের চোখে জল। তারপর নেতাজী নিজেও প্লেনে উঠে পড়লেন।

॥ ৩১ ॥

ব্যাংকক থেকে সায়গনে নেতাজী ও তাঁর সহকর্মীরা দুটি প্লেন বোঝাই হয়ে এসে পৌঁছলেন। একটি প্লেন থেকে নামলেন নেতাজী স্বয়ং, হবিবুর রহমান, আয়ার, প্রীতম সিং আর নেগেশি। অপর প্লেনে এলেন মিঃ হাচিয়া, জেনারেল ইসোডা, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান ও দেবনাথ দাস। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেনস্ লীগের একজন মাত্র কর্মী বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কেমন করে যেন শুনেছিলেন নেতাজী আসছেন, তাই বিমান বন্দরে এসেছিলেন। নয়ত সায়গনের ভারতীয়রা বিশেষ কেউ খবর পাননি। সঙ্গী জাপানী অফিসাররা ফিল্ড মার্শাল টেরৌচির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চলে গেলেন। নেতাজীর সায়গন ছেড়ে যাবার জন্য প্লেনের ব্যবস্থা করতে হবে! আর নেতাজী ও অন্যান্য আই. এন. এ. অফিসাররা ইণ্ডিপেনডেনস্ লীগেরই অপর কর্মী নারায়ণ দাসের বাড়িতে এসে উঠলেন।

১৭ই আগস্ট ১৯৪৫ সালের সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নেতাজী সায়গনে কাটিয়েছিলেন। এই কয়েক ঘণ্টার কথা বহু আলোচিত। এই কয়েক ঘণ্টার কথা বিভিন্ন সময়ে অন্তত পাঁচজনের কাছ থেকে

মুখোমুখি শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। এঁরা হলেন হাচিয়া, ইসোডা, আয়ার সাহেব, আবিদ হাসান ও দেবনাথবাবু। মোটের উপর কাহিনী একই।

প্রথমে কিয়ানো এসে খবর দিলেন, একটা প্লেন ছাড়ছে আর তাতে নেতাজীর জন্য একটি সীট পাওয়া যাবে। ক্লান্ত নেতাজী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবিদ হাসান ওঁকে ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা দিলেন। প্লেনটা যাচ্ছে কোথায় ?—সঙ্গতভাবেই নেতাজী জানতে চাইলেন। তা কেউ ঠিক জানে না। বিরক্ত হয়ে নেতাজী বললেন, যারা জানে তাদের আসতে বলো। অতএব কিয়ানো ফেরত গেলেন।

এরপরই বেজায় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাজির হলেন হাচিয়া, ইসোডা আর টেরৌচির দপ্তরের একজন সিনিয়র অফিসার। রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা শুরু হল। নেতাজীর সঙ্গে রইলেন রহমান। আয়ার সাহেব, দেবনাথবাবু ও আবিদ হাসান আমাদের বলেছেন এই আলোচনায় ওঁরা উপস্থিত ছিলেন না বলে সঠিক কী কথা হয়েছিল ওঁরা জানেন না। ওঁরা বলেন, ওঁদের সোজাসুজি বলা না-হলেও ওঁরা জানতেন নেতাজী মাঞ্চুরিয়া যাবেন। ওঁরা যে কথাটা জানেন সেকথা নেতাজীরও অজানা ছিল না। অপরদিকে জাপানীরা কিন্তু সকলেই জানতেন, নেতাজী সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য নেবার জন্য মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছেন। ইসোডা বলেছেন, ব্যাংককে থেকে সেইভাবে পরিকল্পনা মতই সায়গনে আসা হয়েছিল।

সায়গনে এসে বিমানে জায়গার ঘাটতি কেন হল, এখানে পরিকল্পনার কোথায় গলদ ঘটল এটি আমাদের কারো কাছে পরিষ্কার নয়। ইসোডা বলেছিলেন, সায়গনে নেমে ওঁরা জানলেন, যে বিমানে নেতাজীর যাবার কথা তাতে একটার বেশী সীট নেই। জেনারেল শিডেই মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছেন, বর্মা থেকে মাঞ্চুরিয়া বদলি হয়েছেন। শিডেইর সঙ্গে নেতাজী মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত যাবেন। তারপর উনি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে নিজেই আলাপ-আলোচনা করে কর্মধারা ঠিক করবেন। এই যে আগাম কোন আশ্বাস রাশিয়ার কাছ থেকে না পেয়েই নেতাজী চলে যাচ্ছিলেন,

এতে ব্যাংককের সহকর্মীদের আপত্তি ও দুর্ভাবনা ছিল। ওয়ালটার মায়ার ব্যাংককে সেকথা বলেছিলেন। যাহোক, সে সময় কেন নেতাজী এই সিদ্ধান্ত নিলেন তা এখন আমাদের পক্ষে বিচার করা কঠিন। সিঙ্গাপুর ছাড়বার সময় নেতাজী নিজেই তো বলেছিলেন এই যাত্রা হল adventure into the unknown.

সায়গনের রুদ্ধদ্বার আলোচনা থেকে বার হয়ে এসে নেতাজী অন্য সহ-কর্মীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একটিমাত্র সীট পেলেও উনি যাবেন কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলা ছাড়া ওঁদের তো গত্যন্তর ছিল না। কারণ আর যাই হোক, নেতাজী সায়গনে ধরা পড়েন এটা তো কেউ চান না। ব্যাংককে থাকলেও না হয় বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারত।

সেদিন নেতাজী খুব অস্থির ছিলেন একথা আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ একবার গুলজারা সিং ও প্রীতম সিং-এর আসতে সামান্য দেরী দেখে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—ওদের পোশাক করার ভাবনা ভাবতে হবে না, যেমন আছে চলে আসতে বলো। আবার বিমানবন্দরে আবিদ হাসান ধনরত্নের বাক্স নিয়ে পৌঁছতে দেরী করে বকুনি খেলেন। দোষটা আবিদের নয়। দুটো গাড়ি একসঙ্গে রওনা হল। নেতাজী, হবিব ও আয়ারকে নিয়ে প্রথম গাড়ি পৌঁছে গেল। দ্বিতীয় গাড়িতে বাক্সসমেত আবিদ, দেবনাথবাবু, গুলজারা সিং, প্রীতম সিং। ওঁদের গাড়িটা ট্র্যাফিকে পিছিয়ে পড়েছিল। এদিকে বিমানবন্দরে এঞ্জিন চালু করে বিমান অপেক্ষা করছে। জেনারেল শিডেই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। নেতাজী ধৈর্যচ্যুত হচ্ছেন।

ইসোডা বলেছিলেন, আমরা নেতাজীকে একটা বা দুটো যা-ই সীট পাওয়া যায় তার সুযোগ নিতে বলি। কারণ জাপানের সারেনডারের পর দু'দিন হয়ে গেছে। যেকোন সময় ওরা হয়ত আমাদের অবাধ বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। আমরা কথা দিয়েছিলাম, পরে নেতাজীর অন্যান্য সঙ্গীদের ওঁর পিছন পিছন পাঠিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা আমরা করব।

সেদিন সায়গন বিমানবন্দরে নেতাজী একে একে সকলকে 'জয়হিন্দ'

বললেন। আয়ার বলেছেন, নেতাজী চোখের জল চাপছিলেন। নেতাজীকে নিয়ে এরোপ্লেন আকাশে উড়ে গেল, ধীরে ধীরে ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে একটা বিন্দু দিগন্তে মিলিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় সেইদিকে চেয়েছিলেন বিমানবন্দরে দাঁড়ানো পাঁচ সঙ্গী। তারপর ওঁরা পরস্পরের দিকে ফিরে তাকালেন। ওঁরা সকলেই বলেছেন, এইরকম একটা অন্ধকার, বিষাদময়, অনিশ্চিত মুহূর্ত ওঁদের জীবনে আর কখনো আসেনি।

বাড়ি ফিরে রাত্রে যখন সকলে খেতে বসলেন, তখন ওঁদের মনে পড়ল সেই কোন সকালে ব্যাংককে নেতাজী ওঁদের সঙ্গে কফি খেয়েছিলেন—তারপর না নেতাজী না ওঁরা নিজেরা, এমন কি এক চুমুক জল খাবার কথাও ভাবতে সময় পাননি।

ভেঙে পড়লে চলবে না। তবে আর নেতাজীর কাছে কী শিক্ষা পেলেন! সব সময় ভবিষ্যতের কথা, পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে হবে। "That army is beaten which considers itself beaten"—একথা ভুললে চলবে না। তাই আবিদ হাসান ও অন্যান্যরা ঠিক করলেন, ওঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে যেমন করে হোক নেতাজীর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা। কাল থেকে ওঁরা জাপানী কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়ে অস্থির করবেন।

এবার আমরা যখন জাপানে গেলাম হাচিয়া আগেই মারা গেছেন, আর ইসাডো আমরা থাকতে থাকতেই মারা গেলেন। শেষের এই দুই একটি দিন সম্বন্ধে তাই এবার ওঁদের সঙ্গে কোন কথা হয়নি। কিন্তু এর আগে যখনি এসব কথা উঠেছে, ওঁরা এবং অন্য সকলেই আমাদের প্রশ্নের যত্ন করে জবাব দিয়েছেন। এমনকি কোন অসঙ্গতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছেন। এবার একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। অনেক জাপানীরা বিশেষত বিমান-দুর্ঘটনায় যাঁরা সারাভাইভর বা জীবিত সাক্ষী তাঁরা একটু বিরক্ত এবং এ সব নিয়ে আর কথাবার্তা বলতে চান না। মেজর কোনো তো কিছুদিন আগে এক বিদেশী গবেষকের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন।

জেনারেল কাটাকুরা ও ফুজিয়ারা আমাদের বললেন, খোসলা কমিশনের সাক্ষ্য নেওয়ার পদ্ধতি এর জন্য দায়ী। অনেক জাপানী অফিসার নাকি অপমানিত বোধ করেছেন। মোটের উপর ওঁদের বক্তব্য হল এইরকম—তোমাদের একজন নেতা ঘটনাচক্রে আমাদের সঙ্গে এক দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েন, তোমরা যা জানতে চাও আমাদের সাধ্যমত আমরা বারবার বলছি। তোমরা যদি মনে করো আমরা সবাই মিথ্যা কথা বলছি তবে আর বারবার এই অগ্নিপরীক্ষা কেন আমরা দিতে যাব! জাপানীদের জাতি হিসেবে সৌজন্যবোধ খুব বেশী। জানি না খোসলা কমিশন কী করেছেন যা ওঁদের কাছে অসৌজন্যমূলক মনে হয়েছে।

আমরা ভারতীয়দের কথায় ফিরে যাই। টোকিও, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, ব্যাংকক, সায়গন যেখানে যত আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন, ১৫ই আগস্টের পর তাঁদের মনের অবস্থা কেমন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। নেতাজীকে প্লেনে তুলে দেবার পর আয়ার বলছেন, My spirits were at the very lowest ebb that moment.

আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কথা, নেতাজীর কর্মকাণ্ডের কথা যখনি আমরা পর্যালোচনা করতে বসি, তখনি এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি আছে তা আমাদের বেদনা দেয়। একটি মহৎ কাজ অনেকদূর অগ্রসর হল, সাফল্যের আশা দেখা দিল, তারপর যেন আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়। সামরিক দিক থেকে বিবেচনা করলে বিপর্যয় যে হল সেকথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সামরিক পরাজয় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের শেষ কথা নয়।

যুদ্ধের শেষ দিকে নেতাজীর একটা প্রিয় উক্তি ছিল—War has many surprises, কথাটা ওঁর নিজের নয়, উনি উদ্ধৃত করতেন বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি ও লেখক ক্লাউসেভিৎস (Clausewitz)-এর কথা।

রেঙ্গুন থেকে রিট্রিট করে ব্যাংককে এসে পৌঁছবার পর এক বক্তৃতায় নেতাজী বললেন,—War has many surprises। কখন কী ঘটবে আগে থেকে বলা যায় না। তুরস্কের ইতিহাস আর আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত তুলে দিয়ে উনি ওঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখালেন। এই

পরাজয়কে উনি বললেন 'সাময়িক' বা temporary defeat। আর বললেন জয় যে সুনিশ্চিত, "ultimate victory" যে আমাদের এই বিশ্বাস যেন কখনোই না হারাই।

আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামেও আমাদের জন্য একটা মস্ত বড় surprise অপেক্ষা করছিল। কী সেই বিস্ময়? আপাতদৃষ্টিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত, ছিন্নভিন্ন। কিন্তু এক পরাজিত বাহিনী কী করে দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করল বিস্ময় সেইখানে।

যুদ্ধের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বন্দী করে নিয়ে আসা হল দিল্লীর লালকেল্লায়। তাছাড়া প্রতিদিন শত শত আজাদী সাধারণ সৈনিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তি-কাহিনী সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে অসাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এরই মধ্যে ইংরেজরা স্থির করল, তিনজন অফিসারের বিচার হবে লালকেল্লায়। এঁরা তিনজন—শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন। ইংরেজের মত সুচতুর জাত কেমন করে যে এতবড় একটা ভুল করে বসল সেও একটা বিস্ময়! এই বিচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত প্রতিবাদে, বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল। এঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কংগ্রেস থেকে ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত হল, তার নেতৃত্ব এল ভুলাভাই দেশাইর হাতে। ভুলাভাই দেশাই খুব মৌলিক প্রশ্ন তুললেন—বিচার তো শুধু তিনজন অফিসারের নয়, কোন পরাধীন জাতির নিজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার—the right to wage war আছে কি না বিচার হবে তারই।

ইংরেজ সরকার বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের তিনভাগে ভাগ করেছিলেন—ব্ল্যাক, গ্রে আর হোয়াইট। ব্ল্যাক হল যারা সবচাইতে খারাপ অর্থাৎ কিনা পুরোপুরি দেশপ্রেমিক। সায়গল গল্প করেছিলেন, ওঁর রেজি-মেণ্টের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে সকলে কালো, সেখানে ধলো কেউ ছিলই না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সবচাইতে মারাত্মক যা হল তা বর্মাতে, মালয়ে এবং পরে ভারতেও, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী ও আজাদ হিন্দ

সৈনিকদের মধ্যে মাখামাখি। 'ওরা সব জাপানের দালাল'।—এই সব প্রচার দূর থেকে চলে। কিন্তু এখানে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর লোকেরা স্বচক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পেল। স্বদেশবাসীরা ওঁদের যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালো তাও ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত এরিক স্টোকস্ গল্প করেছিলেন, যুদ্ধের শেষে উনি ছিলেন কুয়ালালামপুরে তরুণ ব্রিটিশ অফিসার। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের ভার ছিল ওঁর ওপর। ট্রাক বোঝাই আজাদী বন্দীদের নিয়ে যাবার সময় সমস্ত কুয়ালালামপুর শহর পথে এসে দাঁড়ালো ও বন্দীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। প্রফেসর স্টোকস্ বলেছিলেন, এতে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী খুব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত বিজয়ী সেনাবাহিনীর জন্য জয়ধ্বনি ওঠে কিন্তু এখানে তাদের উপেক্ষা করে, তাদের সামনেই পরাজিত বন্দীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে শহরসুদ্ধ মানুষ।

তাই ১৯৪৬ সালের গোড়ায় বোম্বাই ও করাচীতে নৌসেনা বিদ্রোহ করল। আর্মি আর এয়ারফোর্সেও ছোঁয়াচ লাগল তার। অনুপস্থিত সুভাষচন্দ্রও মস্ত সমস্যা হয়ে উঠলেন ইংরেজদের কাছে। এর বেশ কিছুদিন আগেই, বিমান দুর্ঘটনার খবর পাবার কয়েকদিন পর ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তার জার্নালে লিখলেন—খবরটা সত্যি হলে বাঁচা যায়। তা নয়ত সুভাষচন্দ্র বোসের 'disposal' একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। কে কার 'ডিসপোজাল' করে! এখন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই ডিসপোজালের সময় হল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের জন্য যা করল কোথাও কোন পরাজিত বাহিনী তার দেশের জন্য এত করেছে এমন দেখা যায় না। সিঙ্গাপুরে নেতাজী সব ভারতীয়দের আহ্বান করে তাদের কণ্ঠে ধ্বনি তুলে দিয়েছিলেন, চলো দিল্লী। ফুজিয়ারা বলতেন, ইম্ফল যুদ্ধের সময় গভীর রাত্রে উনি মণিপুরের পাহাড়ে-জঙ্গলে প্রতিধ্বনি শুনতেন—চলো, চলো, দিল্লী চলো। বিজয়ীর বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করা আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভাগ্যে ছিল না। যুদ্ধে পরাজয় যখন আসন্ন তখন

নেতাজী বললেন—"But the roads to Delhi are many, like the roads to Rome. And along one of these many roads we shall travel and ultimately reach our destination, the metropolis of India".

নেতাজী যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন, উনি নিজেও নিশ্চয় ভাবতে পারেননি ঠিক কোন পথে দিল্লীতে প্রবেশ করবে তাঁর সেনাদল। বিজয়ীর বেশে নয়, পরাজয়ের পথ বেয়ে বন্দী বীরের বেশে দিল্লীর লাল-কেল্লায় পৌঁছলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা। লালকেল্লার কাঁটা তারে ঘেরা বন্দীশালা থেকে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে।

অনেককাল আগে নেতাজী যখন কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে একটা ইঙ্গিত ছিল যে, নেতাজীর আপাত পরাজয় একদিন চিরদিনের জয়ে পরিণত হবে। এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা সত্যে পরিণত করলেন নেতাজী। দুঃখকে করে তুললেন সুযোগ, বিঘ্নকে করলেন সোপান। জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করলেন নেতাজী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে দিল্লীর লালকেল্লায় এসে পৌঁছল শেষ পর্যন্ত।

—

নির্ঘণ্ট

453